দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস

আর্থার কোনান ডয়েল

BENGALIEBOOK.COM ★2022★

সূচিপত্র

শার্লক হোমস 3

বাস্কারভিল বংশের অভিশাপ 16

প্রহেলিকা 34

স্যার হেনরি বাস্কারভিল 54

তিনটে ছিন্নসূত্র 76

বাস্কারভিল হল 98

মেরিপিট হাউসের স্টেপলটনরা 116

ডক্টর ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট 143

ডক্টর ওয়াটসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট : জলায় আলো 155

ডক্টর ওয়াটসনের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃতি 186

পাহাড়চুড়োর মানব 205

বাদায় মৃত্যু 228

জাল বিস্তার 256

বাস্কারভিলস হাউন্ড 277

স্মৃতিমন্থন 299

শার্লক হোমস

শার্লক হোমস এমনিতে খুব বেলায় ওঠে ঘুম থেকে। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে—সারারাত না-ঘুমিয়ে শিবনেত্র হয়ে বসে থাকার ঘটনাও ঘটে যখন-তখন। সেদিন এই মানুষকেই সাতসকালে বসে থাকতে দেখলাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে পাতা মোটা কম্বলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি লাঠিটি হাতে নিলাম গত রাতে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসে ফেলে গেছেন লাঠিখানা। চমৎকার মোটা কাঠের ছড়ি, মাথাটা কলাকৃতি, এ ধরনের ছড়িকে বলা হয় পেন্যাঙ লইয়ার। হাতলের ঠিক নীচেই একটা চওড়া রুপোর পটি–ইঞ্চিখানেক চওড়া। ওপরে খোদাই করা–জেমস মর্টিমার, এম.আর.সি.এস. কে.সি.সি. এইচ.-এর বন্ধুবর্গ, ১৮৮৪। সেকেলে গৃহচিকিৎসকরা যে ধরনের ছড়ি নিয়ে হাঁটেন, এ-ছড়িও ঠিক সেইরকম–মর্যাদাব্যঞ্জক, নিরেট, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার মতো।

ওয়াটসন, ছড়ি দেখে কী বুঝলে বলো তো?

হোমস কিন্তু বসেছিল আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমি ওকে বলিওনি কী নিয়ে তন্ময় ছিলাম এতক্ষণ।

জানলে কী করে কী দেখছি? মাথার পেছনে একজোড়া চোখ আছে মনে হচ্ছে।

মাথার পেছনে চোখ না-থাক, নিকেল-করা বেজায় চকচকে একটা কফিপট রয়েছে আমার সামনে। সে যাই হোক, ছড়ি দেখে কী মনে হল বলো দিকি ওয়াটসন। ভদ্রলোক কাল রাতে এসেছিলেন দেখা করতে, কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ তাই দেখা হয়নি। তিনি কীরকম, কী করেন, দেখতে কেমন কিছুই জানি না। কাজেই দৈবাৎ ফেলে যাওয়া এই স্মারক নিদর্শনটি এখন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ছড়ি পরীক্ষা করে ভদ্রলোকের বর্ণনা কীরকম দিতে পারো শোনা যাক।

বন্ধুবরের পদ্ধতি আমি জানি। সাধ্যমতো তা অনুসরণ করলাম। বললাম, ডক্টর মর্টিমার দেখছি বেশ পসার জমিয়েছেন। বয়স্ক। শ্রদ্ধার পাত্র। স্বীকৃতি স্বরূপ পরিচিতেরা দিয়েছে এই ছড়ি।

হোমস বললে, গুড! অতি চমৎকার!

খুব সম্ভব উনি গাঁয়ের ডাক্তার। হাঁটেন বেশি।

কেন বলো তো?

ছড়িটা এককালে খুবই দেখতে বাহারি ছিল। কিন্তু এত চোট খেয়েছে যে মনে হয় শহুরে চিকিৎসকের হাতে থাকলে এমন হাল হত না। ডগায় আঁটা পুরু লোহার টুপি বেশ ক্ষয়ে এসেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছড়ি হাতে হাঁটাহাঁটি হয়েছে খুব বেশি।

একেবারে ঠিক! বললে হোমস।

তারপর ধরো এই সি.সি. এইচ.-এর বন্ধুবর্গ কথাটা। স্থানীয় বাসিন্দাদের চমৎকৃত করেছিলেন শল্যচিকিৎসা দিয়ে—বিনিময়ে উপহার পেয়েছেন এই ছড়ি।

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে হোমস বললে, ওয়াটসন, তুমি দেখছি আমাকেও টেক্কা মেরে গেলে! না-বলে আর পারছি না, আমার ছোটোখাটো কৃতিত্ব গুছিয়ে লিখতে গিয়ে তোমার নিজের ক্ষমতাকে ছোটো করে দেখেছ বরাবর। তুমি নিজে হয়তো আলোকময় নও, কিন্তু আলোক-পরিবাহী তো বটে। সংসারে কিছু মানুষ আছে যারা প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না, অন্য প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। ভায়া, তোমার কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি।

এত কথা এর আগে কখনো ওর মুখে শুনিনি। তাই খুব আনন্দ হল শুনে। ওর প্রশংসা আর প্রচার করতে গিয়ে বহুবার আঘাত পেয়েছি ওর নিজেরই ঔদাসীন্য দেখে। গর্বও হল ওর সেই পদ্ধতিকে আয়ত্তে আনতে পেরেছি দেখে। পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ দেখিয়ে ওকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি, প্রশংসা অর্জন করেছি। ছড়িটা এবার আমার হাত থেকে নিয়ে ও খালি চোখে পর্যবেক্ষণ করল মিনিট কয়েক। তারপর যেন আগ্রহ সঞ্চারিত হল চোখে-মুখে। সিগারেট নামিয়ে রেখে ছড়ি হাতে গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে এবং একটা পেটমোটা আতশকাচ নিয়ে ফের খুঁটিয়ে দেখল ছড়ির আগাপাশতলা।

তারপর ফিরে এসে বসল সোফায় ওর প্রিয় কোণটিতে। বললে, কৌতূহলোদ্দীপক এবং অসাধারণ। ছড়ির ওপর সত্যিই দু-একটা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্তের বনেদ হিসেবে যথেষ্ট।

নিজেকে কেউকেটা মনে হল। এইরকম সুরে বললাম, আমার চোখ এড়িয়ে গেছে কি কিছু? দরকারি কিছু এড়িয়েছে বলে মনে হয়?

ভায়া ওয়াটসন, তোমার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ভুল। আমাকে উদ্দীপ্ত করেছ, এই কথা বললাম এই কারণে যে তোমার এইসব ভুল থেকেই মাঝে মাঝে আমি সত্যে উপনীত হয়েছি। ভুলগুলোই আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সঠিক পয়েন্ট কোনদিকে। এক্ষেত্রে অবশ্য তুমি একেবারেই ভুল করেছ, তা বলব না। ভদ্রলোক সত্যিই গাঁইয়া ডাক্তার। হাঁটেনও এন্তার।

তাহলে তো ঠিকই বলেছি।

ওই পর্যন্ত ঠিক বলেছ।

ওর বেশি আর নেইও কিছু।

না, না, ভায়া ওয়াটসন, মোটেই তা নয়–একেবারেই নয়। যেমন ধরো উপহার জিনিসটা ডাক্তাররা হাসপাতাল থেকেই পায়–রুগিদের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

সেই হাসপাতালের নামের আগে সি.সি. লেখা থাকলে বুঝতে হবে তা শেরিং ক্রস হাসপাতাল।

মনে হচ্ছে ঠিকই বলছ।

সম্ভাবনা কিন্তু সেইদিকেই। কাজ শুরু করার অনুমিতি হিসেবে এটুকু মেনে নিলে অজানা সেই ভদ্রলোককে মনে মনে আঁকার সম্পূর্ণ নতুন একটা বনেদ পাওয়া যাবে।

বেশ তো, সি. সি. এইচ. মানে ; দি শেরিং ক্রস হসপিটাল ধরে নেওয়া হয়, তা থেকে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে?

তোমার মাথায় কিছু আসছে না? আমার পদ্ধতি তুমি জানো। প্রয়োগ কর না কেন?

আমার মাথায় কেবল অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তটাই আসছে। গাঁয়ে যাওয়ার আগে ভদ্রলোক শহরে প্র্যাকটিস করেছিলেন।

আমার মনে হয় আরও একটু বুক ঠুকে এগোনো যায়। এইভাবে দেখা যাক। এ-রকম উপহার দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে সম্ভবপর পরিস্থিতি কী হতে পারে? বন্ধুপ্রীতি জানাতে বন্ধুরা কোন সময়ে একত্র হতে পারে? হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করার ঠিক আগে নিশ্চয় উপহার পেয়েছিলেন দেখতেই পাচ্ছি। বুঝতে পারছি

শহুরে হাসপাতাল ছেড়ে গাঁয়ের প্র্যাকটিস আরম্ভ হয় তখনই। এই পরিবর্তনের সময়েই উপহারটা পেয়েছিলেন, এ-সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি খুব বাড়াবাড়ি হবে?

খুবই সম্ভবপর মনে হচ্ছে।

এবার দ্যাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয় হাসপাতালের মাইনে-করা ডাক্তার ছিলেন না। কেননা, এ-পদ পেতে গেলে লন্ডনে জমজমাট পসার থাকা চাই। এ-রকম পসার ছেড়ে কেউ গাঁয়ে প্র্যাকটিস করতেও যায় না, তাহলে কী ছিলেন উনি? হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু কর্মচারী তালিকাভুক্ত ছিলেন না। তাহলে নিশ্চয় সিনিয়র স্টুডেন্টের একটু ওপরের ধাপে ছিলেন, মানে হাউস-সার্জন বা হাউস-ফিজিশিয়ান। হাসপাতাল ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে তারিখটা ছড়িতেই রয়েছে। ভায়া ওয়াটসন, ফলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তোমার মধ্যবয়স্ক, গম্ভীরবদন গৃহচিকিৎসক–সে-জায়গায় আবির্ভূত হচ্ছে একজন ছোকরা ডাক্তার, বয়স তিরিশের নীচে, অমায়িক, উচ্চাশাহীন, অন্যমনস্ক, এবং টেরিয়ারের চেয়ে একটু বড়ো আর ম্যাসটিফের চেয়ে একটু ছোটো একটা কুকুরের মালিক।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে ধোঁয়ার রিং কড়িকাঠ অভিমুখে নিক্ষেপ করে চলল শার্লক হোমস। অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম আমি।

বললাম, শেষদিকে যা বললে, তা যাচাই করার উপায় আমার হাতে নেই। তবে , ভদ্রলোকের বয়স আর পেশাগত কর্মজীবনের খবর যাচাই করাটা খুব কঠিন হবে না।

ডাক্তারি বই রাখার ছোটো তাক থেকে মেডিক্যাল ডিরেক্টরি নামিয়ে নামটা খুঁজে বের করলাম। মর্টিমার বেশ কয়েকজন আছেন, কিন্তু কাল রাতে আমাদের চৌকাঠ মাড়িয়েছেন, এমন মর্টিমার একজনই আছেন। প্রমাণ-লিপি পড়ে শোনালাম।

মর্টিমার জেমস্, এম.আর.সি.এস. ১৮৮২, গ্রিমপেন, ডার্টমুর, ডেভন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত শেরিংক্রন্স হসপিটালের হাউস-সার্জন। তুলনামূলক প্যাথলজির ওপর ব্যাধিমাত্রই কি পুনঃপ্রকোপ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে জ্যাকসন পুরস্কার বিজয়ী। সুইডিশ প্যাথলজিক্যাল সোসাইটির পত্রলেখক সদস্য। রচনাবলি : দূর পূর্বপুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্যে কয়েকটা খেয়ালখুশি (ল্যানসেট, ১৮৮২), আমরা কি অগ্রগতির পথে? (জার্নাল অফ সাইকোলজি, মার্চ, ১৮৮৩)। গ্রিমপেন, থর্সলি এবং হাই বারোতে যাজকের অধীন অঞ্চলের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন।

দুষ্টু হেসে হোমস বললে, ওয়াটসন, স্থানীয় বাসিন্দাদের শল্যচিকিৎসার নৈপুণ্য দেখিয়ে চমকে দেওয়ার কোনো উল্লেখই নেই। তবে একটা কথা দারুণ বলেছ–গাঁয়ের ডাক্তারই বটে। আমার সিদ্ধান্তগুলো মোটামুটি ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। এবার বিশেষণগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। যদূর মনে পড়ে, তিনটে বিশেষণ বলেছিলাম–অমায়িক, উচ্চাশাহীন, অন্যমনস্ক। আমার অভিজ্ঞতা বলে, এ-দুনিয়ার অমায়িক মানুষরাই প্রশংসিকা গ্রহণ করে, উচ্চাশাহীন ব্যক্তিরাই লন্ডনের কর্মজীবন পায়ে ঠেলে গাঁয়ের পথে পাড়ি জমায়, এবং অন্যমনস্ক পুরুষরাই এক ঘণ্টা তোমার ঘরে বসে থাকার পর নাম লেখা ভিজিটিং কার্ডের বদলে নিজের ছড়ি ফেলে যায়।

কুকুরটা?

মনিবের পেছন পেছন ছড়ি মুখে করে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। ভারী ছড়ি, তাই মাঝখানে কামড়ে ধরতে হয়, সেই কারণে কুকুরের দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দাগের মাঝখানের ফাটুকু দেখেই কুকুরটার চোয়াল কতখানি চওড়া বোঝা য়ায়। ফাঁকটুকু যতখানি চওড়া হলে টেরিয়ার বলা যায়, ততখানি নয়–তার চেয়ে একটু বেশি আবার ম্যাসটিফের চোয়ালের মতোও অতখানি চওড়া নয়। আমার মনে হয়–আরে হ্যাঁ, কী কাণ্ড দেখো, এ যে দেখছি স্প্যানিয়েল কুকুর, চুলগুলো কোঁকড়া।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে কথা বলছিল হোমস। এখন থমকে দাঁড়াল জানলার কুলুঙ্গির সামনে। কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রত্যয় ফুটে উঠল যে সবিস্ময়ে চোখ তুললাম আমি।।

বন্ধু, এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?

অতি সহজ কারণে, দরজার সামনেই দেখতে পাচ্ছি কুকুরটাকে, মনিবের চেহারাটাও চোখে পড়ছে। যেয়ো না, ওয়াটসন। পেশার দিক দিয়ে ভদ্রলোক তোমার সতীর্থ। তুমি থাকলে আমার সুবিধেই হবে। ওয়াটসন, নিয়তির নাটকীয় মুহূর্ত সিঁড়ির ওপরকার ওই পদধ্বনির মধ্যে এগিয়ে আসছে তোমার জীবনে, ভালো হবে কি মন্দ হবে তা কিন্তু তুমি জানো না। বিজ্ঞান-সাধক ডক্টর জেমস মর্টিমার অপরাধ-বিশেষজ্ঞ শার্লক হোমসের কাছে কী অভিপ্রায় নিয়ে আসছেন জানি না। ভেতরে আসুন!

আশা করেছিলাম, মার্কামারা গাঁইয়া ডাক্তার দেখব; তাই ঘরে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখে অবাক হলাম। মাথায় বেশ লম্বা, ছিপছিপে পাতলা চেহারা, নাক তো নয় যেন পাখির চঞ্চু, ঘনিষ্ঠ দুই ধূসর চোখের মাঝখান থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনে, সোনার চশমার আড়ালে চিকমিক করছে অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চাহনি। বেশবাস ডাক্তারের মতোই, কিন্তু যত্নহীন; ফ্রককোট মলিন, ট্রাউজার্স ছেড়া–সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বয়সে তরুণ হলেও লম্বা পিঠখানা বেঁকে গিয়েছে ধনুকের মতে, হাঁটছেন মাথা সামনের দিকে বাড়িয়ে, ভাবেসাবে উঁকি দিচ্ছে মানুষের উপকার করার সদিচ্ছা, ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হোমসের হাতের ছড়িটার উপর, সঙ্গেসঙ্গে দৌড়ে গেলেন হর্ষধ্বনি করে।

বললেন, বাঁচলাম! জাহাজ-অফিসে ফেলেছি কি এইখানে রেখে গেছি, ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। প্রাণ থাকতে এ-ছড়ি কাছছাড়া করতে পারব না।

হোমস বললে, উপহার পাওয়া ছড়ি দেখছি।

হ্যাঁ।

শেরিং ক্রস হসপিটাল থেকে?

আমার বিয়ে উপলক্ষে হাসপাতালের বন্ধুরা দিয়েছিল।

কী বিপদ! কী বিপদ! সেটা তো খুব খারাপ হল। মাথা নাড়তে নাড়তে বললে হোমস।

একটু অবাক হয়েই চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকান ডক্টর মর্টিমার।

খারাপ হল কেন?

আমাদের এই সামান্য সিদ্ধান্ত-পর্বটাকে অগোছালো করে দিলেন বলে। আপনার বিয়ে বললেন না?

হ্যাঁ। বিয়ে করার ফলে হাসপাতাল ছাড়তে হল, কনসাল্টিং প্র্যাকটিসের আশাও শিকেয় উঠল। নিজস্ব একটা আস্তানার দরকার হয়ে পড়ল সবার আগে।

তাই বলুন, খুব একটা ভুল তাহলে করিনি, বললে হোমস। এবার বলুন দিকি ডক্টর জেমস মর্টিমার

মিস্টার, মশায়, মিস্টার সামান্য এম. আর. সি. এস. আমি।

মনটাও নিশ্চয় যেরকমটি হওয়া উচিত, সেইরকম।

মি. হোমস বিজ্ঞান জগতের ভাসা ভাসা কিছু খবর রাখি, বিরাট অজানা মহাসমুদ্রের উপকূলে শামুক কুড়িয়ে বেড়াই। কথা বলছি নিশ্চয় মি. শার্লক হোমসের সঙ্গে, আর–

হ্যাঁ, ইনি আমার বন্ধু, ডক্টর ওয়াটসন।

পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। ডক্টর ওয়াটসন, আপনার বন্ধুর সুত্রেই আপনার নাম আমি শুনেছি। মি. হোমস, আপনাকে নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই আমার। করোটির এ-রকম dolichocephalic গড়ন দেখতে পাব ভাবিনি, চোখের গর্তের ওপরকার হাড়ের গঠনও রীতিমতো সুগঠিত। দু-পাশের হাড় দু-খানার জোড়ের ওপর আঙুল বুলোতে চাই, আপত্তি আছে? যেকোনো নৃতত্ত্ব জাদুঘরে সাজিয়ে রাখার মতো আপনার এই করোটি। আসলটা যদ্দিন -পাচ্ছে, তদ্দিন একটা ছাপ পেলেও গৌরব বাড়বে মিউজিয়ামের। খোশামুদ করছি ভাববেন না যেন, কিন্তু দারুণ লাভ হচ্ছে আপনার করোটিখানার ওপর।

হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বিচিত্র দর্শনার্থীকে চেয়ারে বসতে অনুরোধ জানায় শার্লক হোমস।

বলে, আমি যেমন আমার লাইনের চিন্তা নিয়ে উৎসাহী, আপনিও দেখছি সেইরকম। আপনার তর্জনী দেখে মনে হচ্ছে নিজের সিগারেট নিজেই বানান। দ্বিধা করবেন না, ধরিয়ে নিন একটা।

কাগজ আর তামাক বার করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় কাগজ পাকিয়ে তামাক ভরে ফেললেন। ভদ্রলোক। পোকামাকড়ের শুঁড়ের মতন চটপটে আর অস্থির তার দীর্ঘ কম্পমান আঙুল।

নীরবে বসে রইল হোমস। কিন্তু তিরের মতন চাহনি নিক্ষেপ দেখেই বুঝলাম বিচিত্র ভদ্রলোক জাগ্রত করেছেন তার কৌতূহল।

শেষকালে বললে, দেখুন মশায়, কাল রাতে আর আজ সকালে নিশ্চয় খুলিতে আঙুল বোলাবার অভিপ্রায়ে এখানে আসেননি?

না, মশাই, না; যদিও এ-সুযোগ পেয়ে আমি সুখী। মি. হোমস, আমি এসেছি কেননা প্রথমত আমার ব্যবহারিক বুদ্ধি কম, দ্বিতীয়ত হঠাৎ একটা অত্যন্ত গুরুতর আর অসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বলে। যেহেতু ইউরোপে আপনিই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ–

বটে! বটে! জানতে পারি কি প্রথম হওয়ার সম্মানটি কার ভাগ্যে জুটেছে! একটু রুক্ষস্বরেই শুধোয় হোমস।

মসিয়ে বার্টিলন। মনটা বিজ্ঞানসম্মত ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। এ-সম্মান তারই প্রাপ।

তাহলে পরামর্শের জন্যে তার কাছেই যাওয়া উচিত ছিল আপনার?

আগেই বলেছি মনটা তার বিজ্ঞানসম্মত ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধির দিক দিয়ে আপনি অদ্বিতীয়–সবাই তা জানে। অজান্তে আপনার অসম্মান–

একটু করেছেন, বললে হোমস। ডক্টর মর্টিমার, আর ভনিতা না-করে সাদা কথায় দয়া করে বলুন ঠিক কী ধরনের সমস্যায় আমার সহযোগিতা আপনি চাইছেন।

বাস্কারভিল বংশের অভিশাপ

ডক্টর জেমস মর্টিমার বললেন, আমার পকেটে একটা পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

আপনি ঘরে ঢুকতেই লক্ষ করেছি, হোমস জবাব দিলে।

পাণ্ডুলিপিটা পুরোনো।

জাল পাণ্ডুলিপি যদি না হয়, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের।

কী করে বললেন, বলুন তো?

যতক্ষণ কথা বলছেন, ততক্ষণ এক ইঞ্চি কি দু-ইঞ্চির মতো পাণ্ডুলিপি বার করে রেখেছেন আমার চোখের সামনে। দলিল দেখে যদি তা কোনযুগে লেখা আঁচ করা না-যায়, তাহলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খুবই নিম্নশ্রেণির বলতে হবে। এ-বিষয়ে তা মার লেখা প্রবন্ধটা সম্ভবত পড়েছেন। আমার হিসেবে আপনার পাণ্ডুলিপির তারিখ ১৭৩০।

সঠিক তারিখ ১৭৪২, ব্রেস্ট-পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা টেনে বার করতে করতে বললেন ডক্টর মর্টিমার। এটা একটা পারিবারিক পাণ্ডুলিপি। আমার জিম্মায় রেখে গেছেন স্যার চার্লস বাস্কারভিল। মাস তিনেক আগে তাঁর অকস্মাৎ শোচনীয় মৃত্যুতে দারুণ উত্তেজনার

সৃষ্টি হয়েছিল ডেভনশায়ারে। বলে রাখি, আমি ছিলাম একাধারে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু আর গৃহচিকিৎসক। ভদ্রলোক অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষ ছিলেন। ব্যবহারিক বুদ্ধি আর ধূর্ত দুটোই সমান প্রখর ছিল। কিন্তু আমার মতন ছিলেন কল্পনাহীন। তা সত্ত্বেও এ-দলিল তিনি সিরিয়াস চোখে দেখেছিলেন, মনকেও যে পরিণতির জন্যে তৈরি রেখেছিলেন, শেষকালে ঠিক সেইভাবেই তা ঘটেছে।

হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল হোমস।

ওয়াটসন, লম্বা এস আর ছোটো এসকে কীরকম পালাবদল করে লেখা হয়েছে লক্ষ করেছ নিশ্চয়। যে-কটা লক্ষণ দেখে তারিখটা আঁচ করেছি, এটা তার মধ্যে একটা।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হলদেটে কাগজ আর ফিকে হয়ে আসা পাণ্ডুলিপির পানে তাকালাম আমি। মাথায় লেখা : বাস্কারভিল হল, এবং তলায় বড়ো বড়ো টানা ছাঁদে একটা সাল : ১৭৪২।

লিখিত বিবৃতি বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, বাস্কারভিল পরিবারে বংশপরম্পরায় একটা কিংবদন্তি চলে আসছে। এটা সেই কিংবদন্তির লিখিত বিবৃতি।

এর চাইতে আধুনিক আর প্র্যাকটিক্যাল কোনো ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিতে এসেছেন আশা করি?

অত্যন্ত আধুনিক। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল, অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার ফয়সালা করতেই হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। পাণ্ডুলিপিটা অবশ্য ছোটো, বিষয়টার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনি অনুমতি দিলে পড়ে শোনাই।

যেন হাল ছেড়ে দিল হোমস। বসল হেলান দিয়ে। আঙুলের ডগাগুলো একত্র করে বন্ধ করল চোখের পাতা। আলোর সামনে পাণ্ডুলিপি ধরে উচ্চনিনাদী চড়চড়ে গলায় প্রাচীন দুনিয়ার অদ্ভুত কাহিনিটি পড়ে শোনালেন ডক্টর মর্টিমার :

বাস্কারভিল কুকুরের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকরকম বিবৃতি শোনা যায়। কিন্তু যেহেতু আমি সরাসরি হিউগো বাস্কারভিলের বংশধর এবং এ-গল্প আমি শুনেছি আমার বাবার মুখে, তিনি শুনেছেন তার বাবার কাছে, তাই ঠিক যেভাবে লেখা হচ্ছে সেইভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল এ বিশ্বাস আমি রাখি। পুত্রগণ, বিধাতার বিচারের ওপর তোমাদেরও আস্থা রাখতে বলব এই কারণে যে পাপের সাজা যিনি দেন, অত্যন্ত দরাজ হৃদয়ে তিনি তা ক্ষমাও করেন। প্রার্থনা আর অনুশোচনা দ্বারা অপসারণ ঘটে না এমন কোনো অভিশাপ এ-সংসারে নেই। তাই, এ-গল্প পড়ে অতীতের কর্মফলকে ভয় করতে না-শিখে বরং ভবিষ্যতে পরিণামদর্শী থেকো, সতর্ক থেকো; যে জঘন্য নোংরা ইন্দ্রিয়াবেগের জন্যে এত কষ্ট সয়েছে আমাদের বংশ, তা যেন ফের ফিরে না-আসে আমাদের কাজকর্মে।

মহাবিপ্লবের সময়ে (মহাপণ্ডিত লর্ড ক্ল্যারেনডন লিখিত এই বিপ্লবের ইতিহাসের প্রতি একান্তভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি) বাস্কারভিল জমিদারের এই খামারবাড়ি হিউগো বাস্কারভিলের দখলে ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত, দুষ্ট, নাস্তিক এবং দেবনিন্দুক পুরুষ। প্রতিবেশীরা হয়তো তার এইসব বদগুণ ক্ষমার চোখে দেখে থাকতে পারেন, কেননা এসব অঞ্চলে সাধুসন্তরা কোনোকালেই সুবিধে করে উঠতে পারেননি; কিন্তু ক্রুর কৌতুকবোধ, উচ্ছৃঙ্খলতা আর লাম্পট্যর দরুন সারা পশ্চিমাঞ্চলে একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল হিউগো বাস্কারভিলের নাম। ঘটনাক্রমে প্রেমে পড়েছিলেন এই হিউগো (তমসাচ্ছন্ন এহেন ইন্দ্রিয়াবেগকে যদি আলোকোজ্জ্বল এই নামে অভিহিত করা যায়)। বাস্কারভিল এস্টেটের কাছেই এক তালুকদারের জমিজমা ছিল। এরই মেয়েকে ভালোবেসে ফেললেন হিউগো। মেয়েটি কিন্তু বিচক্ষণ, সতর্ক এবং গুণবতী। ভালো মেয়ে হিসেবে বেশ সুনাম ছিল। হিউগোর কুকীর্তি শুনেছিল বলেই এড়িয়ে চলত তাঁকে। ভীষণ ভয় পেত। তাই একদিন মেয়েটিকে খামারবাড়ি থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এলেন হিউগো, সঙ্গে ছিল জনা পাঁচ ছয় কুঁড়ের বাদশা মহা বদমাশ ইয়ারবন্ধু। মেয়েটির বাপ আর ভাইরাও রেহাই পেল না, সবাইকেই টেনে এনে বাস্কারভিল ভবনে তুলল হিউগো। সেদিন ছিল ২৯ সেপ্টেম্বর, সেন্ট মাইকেলের ভোজ উৎসব। মেয়েটিকে ওপরের একটা ঘরে আটকে রেখে রোজ রাতের মতো সেদিনও সপারিষদ হিউগো মদ্যপান আর হই-হল্লায় মত্ত হলেন। ওপরতলায় বন্দিনী ভাগ্যহীনা মেয়েটির অবস্থা সঙিন হয়ে উঠল। ভয়ানক খিস্তিখেউর, গান আর চেঁচামেচি শুনে। সে জানত পেটে মদ পড়লে হিউগো বাস্কারভিল নাকি খোদ শয়তান বনে যান ও নাম তখন মুখে আনলেও নরকে যেতে হয়। ভয়ে আতঙ্কে মরিয়া হয়ে এ অবস্থায় অত্যন্ত সাহসী আর তৎপর পুরুষমানুষ যা করত, মেয়েটিও তাই করে বসল। দক্ষিণ দেওয়ালের আইভিলতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে পাতার

আড়ালে গা ঢেকে নেমে এল নীচতলায় এবং জলাভূমির ওপর দিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। বাস্কারভিল হল থেকে মেয়েটির বাবার খামারবাড়ি কিন্তু ন-মাইল দূরে। হলের দক্ষিণ দেওয়ালে আজও এই আইভিলতা দেখতে পাবে।

ঘটনাক্রমে এর কিছুক্ষণ পর খাদ্য পানীয় নিয়ে হিউগো নিজেই ওপরে এলেন বন্দিনীর ঘরে। আরও জঘন্য বস্তু বোধ হয় ছিল সঙ্গে। বন্ধুদের রেখে এসেছিলেন নীচতলায়। ঘরে ঢুকে দেখলেন খাঁচা খালি, পাখি পালিয়েছে। তৎক্ষণাৎ যেন স্বয়ং শয়তান ভর করল তার কাঁধে। সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো নেমে এলেন একতলার ডাইনিং হলে, এক লাফে উঠে পড়লেন টেবিলের ওপর, মদ্য পরিবেশনের সরু-গলা পাত্র আর খাদ্যসম্ভার বোঝাই বারকোষ ঘুরতে লাগল চোখের সামনে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ইয়ারবন্ধুদের বললেন, অশুভ শক্তির হাতে নিজের দেহমন সঁপে দিতেও তিনি পেছপা নন–কিন্তু সেই রাতেই মেয়েটিকে ধরে আনতে হবে মাঝরাস্তা থেকে। মাতাল বন্ধুরা গোল হয়ে ঘিরে শিহরিত অন্তরে শুনল ক্রোধান্বিত হিউগোর সেই শপথ। কিছু বদমাশ আর মাতাল একযোগে চিৎকার করে বললে, তাহলে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হোক মেয়েটির পিছনে। শুনেই ছুটতে ছুটতে বাড়ির বাইরে এলেন হিউগো, হাঁকড়াক করে সহিসদের বললেন, ঘোড়া সাজাতে, কুকুরশালার দরজা খুলে দিতে। ঘোড়া আসতেই লাফিয়ে উঠলেন পিঠের ওপর, মেয়েটির ফেলে যাওয়া একটা রুমাল ফেলে দিলেন হিংস্র কুকুরগুলোর সামনে এবং ডাকাতে হুংকার ছেড়ে সারবন্দি কুকুর নিয়ে টগবগিয়ে ধেয়ে চললেন চন্দ্রালোকিত জলাভূমির ওপর দিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল মাতাল বন্ধুরা–চক্ষের নিমেষে কী যে ঘটে গেল, তা অনুধাবন করতেই গেল বেশ কিছু সময়। কিন্তু অচিরেই জাগ্রত হল দুষ্ট বুদ্ধি মনের মতো কাজ ঘটতে চলেছে জলাভূমির বুকে–তবে আর দেরি কেন? আচম্বিতে প্রচণ্ড হই-হুল্লায় যেন ফেটে পড়ল সমাগত অতিথিরা, চিৎকার করে কেউ খুঁজল পিস্তল, কেউ ঘোড়া, কেউ ফ্লাস্কভরতি সুরা। কিছুক্ষণ পরে কিছুটা সুবুদ্ধির উদয় হতে তেরো জনের পুরো দলটা ঘোড়ায় চেপে ধাওয়া করল পেছন পেছন। চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে চারদিক। যে-পথে পিতৃগৃহে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে মেয়েটির, সেই পথ ধরেই ওরা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল সামনে।

মাইলখানেক কি দুয়েক যাওয়ার পর দেখল জলাভূমির ওপর দিয়ে আসছে একজন নৈশ মেষপালক। চিৎকার করে ডাকল কাছে। জিজ্ঞেস করলে শিকার অর্থাৎ মেয়েটিকে দেখেছে কিনা। শোনা যায়, ভয়ের চোটে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না বেচারা মেষপালক। শেষ পর্যন্ত কোনোমতে বলেছিল, হ্যাঁ, হতভাগিনী মেয়েটিকে সে দেখেছে–পেছনে তাড়া করে চলেছে কুকুরের পাল। বলেছিল–তার চাইতেও ভয়ংকর দৃশ্য আমি দেখেছি। কালো ঘোড়ায় চেপে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে হিউগো বাস্কারভিলকে—পেছন পেছন ছুটছে একটা প্রকাণ্ড কুকুর। যেন সাক্ষাৎ নরকের কুকুর! ঈশ্বর করুন ও কুকুর যেন আমার পেছনে কখনো তাড়া না-করে।

মাতাল ইয়ারবকশিরা এই শুনে বাপান্ত করল মেষপালকের এবং বেগে ঘোড়া ছোটাল সামনে। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই ঠান্ডা হিম হয়ে এল গায়ের চামড়া। জলাভূমির ওপর দিয়ে ভেসে এল ধাবমান অশ্বখুরধ্বনি, পরমুহূর্তেই উল্কার মতো পাশ দিয়ে উধাও হল

হিউগোর কালো ঘোড়া; মুখ দিয়ে ঝরছে সাদা ফেনা, লাগাম লুটোচ্ছে ধুলোয়, পিঠের জিন শূন্য। একা থাকলে মাতাল বন্ধুরা কেউ আর এগোেত না এই দৃশ্য দেখে, চম্পট দিত ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে। অজানা আতঙ্কে গা হিম হয়ে গেল প্রত্যেকের প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দলবেঁধে এগিয়ে চলল সামনে খাড়া হয়ে রইল গায়ের লোম। এইভাবে ধীর কদমে যেতে যেতে অবশেষে নাগাল ধরে ফেলল কুকুরগুলোর। প্রত্যেকটা কুকুরই ভালো জাতের; সাহস আর বিক্রমের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু দঙ্গল বেঁধে কেঁউ কেঁউ করছে একটা ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে জলাভূমির এই তালকে আমরা বলি গয়াল। কেউ গুটি গুটি কেটে পড়ার তালে ছটফট করছে–স্থির থাকতে পারছে না কিছুতেই, কেউ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সামনে বিস্তৃত সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে।

মাতালদের নেশা তখন কেটে এসেছে, দাঁড়িয়ে গেল সেখানে যে-নেশা নিয়ে রওনা হয়েছিল, এখন আর তা নেই। তিনজন ছাড়া কেউ আর এক পা-ও এগোতে রাজি নয়। ঢাল বেয়ে এগোল যে তিনজন, হয় তাদের বুকের পাটা ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, নয়তো আকণ্ঠ মদ গেলায় সবচেয়ে বেশি মাতাল। ঢালু জায়গাটা শেষ হয়েছে একটা প্রশস্ত চত্বরে। প্রকাণ্ড দুটো পাথর খাড়া করা হয়েছে মাঝখানে। সুদূর অতীতে এ-পাথর কারা খাড়া করে রেখেছিল, এখন তাদের নামও কেউ জানে না। পাথরগুলো কিন্তু এখনও গেলে সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে। চাদের আলো ঝকঝক করছে খোলা চত্বরে, মাঝামাঝি জায়গায় লুটিয়ে রয়েছে মেয়েটির দেহ নিষ্প্রাণ ভয়ে আর অপবাদে দেহপিঞ্জর ছেড়ে পালিয়েছে প্রাণপাখি। কাজেই লুণ্ঠিত হিউগো বাস্কারভিলের দেহ অথবা মেয়েটির প্রাণহীন দেহ দেখেও কিন্তু মাথার চুল খাড়া হয়নি ডানপিটে-শিরোমণি এই তিন বদমাশের হল আরেক দৃশ্য দেখে। হিউগোর পাশে দাঁড়িয়ে টুটি কামড়ে রয়েছে একটা

মহাকায় জীব, দেখতে কুকুরের মতন, কিন্তু আকার পৃথিবীর যেকোনো কুকুরের চাইতে বড়ো–মরজগতের কোনো চক্ষু, এত বড়ো কুকুর কখনো দেখেনি। তিন দুঃসাহসীর চোখের সামনেই হিউগোর টুটি কামড়ে ছিড়ে ফেলে মুখ তুলল অপার্থিব কুকুরটা এবং রক্তঝরা চোয়াল তুলে নরকের আগুন-জ্বলা চোখে তাকাল তিনজনের দিকে। দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ডানপিটেদের। নিঃসীম আতঙ্কে কলজে-ছেড়া চিৎকার করে উঠল তিনজনেই এবং ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ধেয়ে চলল জলাভূমির উপর দিয়ে। শোনা যায়, এই দৃশ্য দেখে সেই রাত্রেই মারা যায় একজন, বাকি জীবনটা পাগল হয়ে থেকেছে অন্য দু-জন।।

পুত্রগণ, এই হল গিয়ে বাস্কারভিল কুকুরের আবির্ভাব কাহিনি। সেই থেকেই এ-বংশে অনেক উপদ্রবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কুকুরটা। সব কথা লিখলাম যাতে ভয়টা কম হয়। আবছা জানলে ভয় আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে, স্পষ্ট জানা থাকলে অত ভয় হয় না। অনুমান করে চমকে চমকে উঠতে হয় না। এ-বংশের অনেকেরই মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যময়! মৃত্যু এসেছে আচমকা রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে। শান্তি পায়নি মরণকালে। তা সত্ত্বেও বলব আমরা যেন পরমপুরুষের শরণ নিই। তিন চার পুরুষ কেটে যাওয়ার পর নিরপরাধ বংশধরদের তিনি নিশ্চয় আর শাস্তি দেবেন না। পুত্রদের, পরম পিতার দয়ার ওপর তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা তাকে ডাকো। আর, সন্ধের পর যখন অশুভ শক্তির নরক গুলজার চলে জলাভূমিতে, তখন ও-তল্লাট মাড়িয়ো না।

(হিউগো বাস্কারভিলের এই কাহিনি তাঁর দুই ছেলে রোজার আর জন-কে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে নির্দেশ আছে, বোন এলিজাবেথকে যেন এ-সম্পর্কে একটা কথাও না-বলা হয়।)

অত্যাশ্চর্য বিবরণ পড়া শেষ করে চশমাটা কপালে ঠেলে তুলে দিয়ে শার্লক হোমসের দিকে তাকালেন ডক্টর মর্টিমার। হাই তুলল হোমস। সিগারেটটা টোকা দিয়ে নিক্ষেপ করল অগ্নিকুণ্ডে।

বলল, হয়েছে।

কৌতূহলোদ্দীপক নয় কি?

রূপকথা সংগ্রহ যাদের বাতিক, তাদের কাছে।

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বার করলেন ডক্টর মর্টিমার।

মি. হোমস, এবার তাহলে আপনাকে কিছু সাম্প্রতিক খবর দেওয়া যাক। কাগজটা ডেভন কাউন্টি ক্রনিকল, এ বছরের চোদ্দোই জুন তারিখের। ওই তারিখের দিনকয়েক আগে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই খবরে।

ঝুঁকে বসল বন্ধুবর, নিবিড় হয়ে এল মুখচ্ছবি। কপাল থেকে চশমাটা চোখের ওপর নামিয়ে পড়া শুরু করলেন ডক্টর মর্টিমার:

স্যার চার্লস বাস্কারভিলের সাম্প্রতিক অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিষাদের কালো ছায়া নেমেছে সারা তল্লাটে। আগামী নির্বাচনে লিবারাল-প্রার্থী হিসাবে মিডডেভন কেন্দ্রে এঁর থাকার সম্ভাবনা ছিল। বাস্কারভিল হলে স্বল্পকাল বসবাস করলে ওঁর সংস্পর্শে যারা যারা এসেছে, তারাই তার অমায়িক চরিত্র, চূড়ান্ত উদারতায় মুগ্ধ হয়েছে। ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে। এই ক্ষয়িষ্ণু বৈভবের যুগে ইনি চমক সৃষ্টি করেছেন, নতুন খবর তৈরি করেছেন। সুপ্রাচীন এক বংশ দুর্দিনের কবলে পড়ে যখন অনুজ্জ্বল, উনি তখন অল্প বয়সে কুবেরের সম্পদ অর্জন করে দেশে ফিরেছেন এবং সেই টাকায় বংশের হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন, স্যার চার্লস দক্ষিণ আফ্রিকায় ফাটকাবাজি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ঝোঁকের মাথায় যারা টাকার লোভে আরও এগিয়ে যায়, তারাই শেষে পস্তায় লোকসানের পালা শুরু হলে। স্যার চার্লস কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষ। লাভের টাকা নিয়ে ফিরে আসেন ইংলন্ডে! বাস্কারভিল হলে উঠেছেন মাত্র দু-বছর আগে। এর মধ্যেই লোকমুখে ছড়িয়ে গেছে কীভাবে তিনি বিরাট সব পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্কার আর শ্রীবর্ধনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। ওঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সব কাজ এখন বন্ধ। যেহেতুে উনি নিঃসন্তান, তাই তার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল জীবদ্দশাতেই ওঁর অগাধ টাকায় সারাতল্লাটের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যেতে। তাই তার অকাল মৃত্যুতে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। স্থানীয় নানা তহবিলে এবং জেলার নানারকমের দাতব্য ব্যাপারে তাঁর মুক্তহস্তে চাঁদা দেওয়ার খবর ইতিপূর্বে বহুবার এই স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে।

স্যার চার্লসের মৃত্যুসংক্রান্ত পরিস্থিতি তদন্তের ফলে সম্পূর্ণ পরিষ্কার না-হলেও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কুসংস্কারজনিত গুজব অপসারণ করতে পেরেছে। মৃত্যুর পেছনে নোংরা কারসাজি আছে, এমন ভাববার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি। অস্বাভাবিক কারণে স্যার চার্লস মারা গেলেন, এমন কল্পনাও আর কেউ করতে পারে না। মৃত্যুর কারণ খুবই স্বাভাবিক। স্যার চার্লস বিপত্নীক ছিলেন এবং হয়তো একটু বাতিকগ্রস্তও ছিলেন। বিপুল বৈভবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও খুবই সাদাসিধে রুচির মানুষ ছিলেন উনি। বাড়ির ভেতরকার চাকরবাকর বলতে ছিল কেবল একটি দম্পতি, নাম ব্যারিমুর। স্বামী ছিল খাসচাকর, স্ত্রী ঘরকন্নার পরিচালিকা, এদের সাক্ষ্য এবং কয়েকজন বন্ধুর জবানবন্দিতে জানা গেছে কিছুদিন ধরেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না স্যার চার্লসের, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। বিশেষ করে হৃদযন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় গায়ের রং পালটে যেত, নিশ্বাস আটকে যেত এবং প্রচণ্ড স্নায়বিক উদ্যমহীনতায় ভুগতেন। মৃত ব্যক্তির বন্ধুস্থানীয় গৃহচিকিৎসক ডক্টর জেমস মর্টিমার একই কথা বলেছিলেন তাঁর সাক্ষ্যে।

এ-কেসের ঘটনাগুলো কিন্তু সাদাসিধে। রাত্রে শয়নের আগে বাস্কারভিল হলের বাগানে সুবিখ্যাত ইউ-বীথিতে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল স্যার চার্লসের। ব্যারিমুর স্বামী-স্ত্রী তাদের জবানবন্দিতে বলেছে, চিরসবুজ ইউ-বীথিতে ভ্রমণ তার বরাবরের অভ্যেস। চৌঠা জুন স্যার চার্লস ব্যারিমুরকে ডেকে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দিতে বলেছিলেন, কেননা পরের দিনই লন্ডনে যাবেন। রাত্রে যথারীতি বেরিয়েছিলেন নৈশভ্রমণে, সঙ্গে ছিল যথারীতি একটা চুরুট। আর ফেরেননি। রাত বারোটার সময়ে হল ঘরের দরজা খোলা রয়েছে দেখে ভয় পেয়ে ব্যারিমুর লণ্ঠন নিয়ে বেরোন মনিবের খোঁজে। দিনে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি ভিজে ছিল। ইউ-বীথির রাস্তায় স্যার চার্লসের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, পায়ের ছাপ

ধরে চলে ব্যারিমুর ইউ-বীথির উদ্যান-পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফটক আছে জলাভূমির দিকে। এই ফটকের সামনে স্যার চার্লসের কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার চিহ্ন পাওয়া গেছে। ইউ-বীথি ধরে আবার এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং পথের শেষপ্রান্তে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ব্যারিমুর তার জবানবন্দিতে একটা ঘটনার উল্লেখ করা সত্ত্বেও তার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। জলার দিকের গেট পেরিয়ে আসার পর থেকেই স্যার চার্লস নাকি আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন পথের শেষ পর্যন্ত। এ-ঘটনা যখন ঘটে, তখন মর্ফি নাকি যাযাবর ঘোড়া-ব্যবসায়ী অকুস্থলের কাছেই জলার মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু তার জবানবন্দিতে জানা গেছে মোটেই সে প্রকৃতিস্থ ছিল না অত্যধিক মদ্যপানের দরুন। আর্ত-চিৎকার কানে এসেছিল স্বীকার করেছে, কিন্তু কোন দিক থেকে, তার ঠাহর করতে পারেনি। ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি স্যার চার্লসের মৃতদেহে। যদিও ডাক্তার বলেছেন, মুখভাব নাকি অস্বাভাবিক বিকৃত হয়েছিল অবিশ্বাস্য সেই মুখ বিকৃতির দরুন নিজের বন্ধুকেও নাকি চিনতে কষ্ট হয়েছিল ডক্টর মর্টিমারের, বিশ্বাসই করতে চাননি ভূলুণ্ঠিত দেহটি তাঁর একদা বন্ধু এবং রুগি স্যার চার্লসের। পরে অবশ্য তার ব্যাখ্যা শোনা গিয়েছে। হৃদ্যন্ত্র বেদম হয়ে মৃত্যু এলে শ্বাসকষ্টের দরুন মুখের চেহারা অমন হতে পারে। ময়নাতদন্তেও এই ব্যাখ্যার সমর্থন মিলেছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন অসুস্থ দেহযন্ত্র নিয়ে বেঁচে ছিলেন স্যার চার্লস। চিকিৎসকের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন করোনারের জুরিগণ। এতে ভালোই হয়েছে। কেননা, স্যার চার্লসের উত্তরাধিকারীকে বাস্কারভিলে এরপর বসবাস করতে হবে এবং স্থগিত সৎ কাজেও নতুন করে হাত দিতে হবে। মৃত্যুকে ঘিরে যেসব রোমান্টিক কল্পকাহিনির গুজব ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ছিল, করোনারের কাঠখোট্টা রায় তার অবসান না-ঘটালে বাস্কারভিল হলের পরবর্তী বাসিন্দা খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়। জানা গেছে, স্যার চার্লস

বাস্কারভিলের ছোটো ভাইয়ের ছেলে মি. হেনরি বাস্কারভিল যদি এখনও জীবিত থাকেন, তাহলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনিই হবেন। তরুণ এই ভদ্রলোক আমেরিকায় ছিলেন জানা গিয়েছিল সেই থেকে আর খবর নেই। বিপুল বৈভবের সংবাদ তার কানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাচরিত্র চলেছে।

কাগজটা ফের ভাঁজ করে পকেটস্থ করলেন ডক্টর মর্টিমার।

বললেন, মি. হোমস, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু-সম্পর্কিত যেসব ঘটনা জনসাধারণ জেনেছে, এই হল গিয়ে তার বিবরণ।

শার্লক হোমস বললে, কেসটায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ধন্যবাদ। সত্যিই এতে কেবল কৌতূহল-জাগানো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সেই সময়ে খবরের কাগজে কিছু কিছু মন্তব্য চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু রোমে পোপের আর প্রাসাদের বহুমূল্য পাথরের ওপর উঁচু করে খোদাই নকশা নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত থাকায়, সেইসঙ্গে পোপের অনুরোধ রক্ষে করতে গিয়ে অত্যন্ত উদবেগের মধ্যে থাকায় বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ইংলিশ কেসের সংস্রবে আসতে পারিনি। আপনি বলেছেন, এই প্রবন্ধে জনসমক্ষে প্রকাশিত সব ঘটনাই আছে?

আছে।

তাহলে প্রাইভেট ঘটনাগুলো এবার বলুন। আঙুলের ডগা একত্র করে হেলান দিয়ে বসল হোমস। বিচারপতিদের মতন মুখখানা যদূর সম্ভব নির্বিকার করে চেয়ে রইল সমাহিত চোখে।

ডক্টর মর্টিমারের হাবভাবে এবার ফুটে উঠল অতীব আবেগের লক্ষণ। বললে, আগেই বলি, এ-কথা আমি আর কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারিনি। না-বলার একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রকাশ্যভাবে জনপ্রিয় কুসংস্কারকে উসকে দিতে কোনো বিজ্ঞানসাধকই চায় না। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। বাস্কারভিল হলকে ঘিরে অনেক গা-ছমছমে কাহিনিই লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কুখ্যাতি বেড়ে যেতে পারে, এমন কিছুই বলা এখন সমীচীন নয়–শেষকালে হয়তো ও-বাড়িতে আর কেউ থাকতেই চাইবে না। এইসব কারণেই ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, যা জানি তার চাইতে কম বলব! সব বললেও ব্যবহারিক লাভ তো কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু আপনার কাছে মন খুলে কথা না-বলার কারণ দেখছি না।

জলাভূমিতে লোকবসতি খুবই বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত। কাছাকাছি যাদের বসবাস মনের দিক দিয়েও তারা অনেকটা কাছের মানুষ। এই কারণেই স্যার চার্লস বাস্কারভিলের সঙ্গে এত দহরম-মহরম হয়েছিল আমার। দেখাসাক্ষাৎ লেগেই থাকত। বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে প্রকৃতিবিদ মি. স্টেপলটন আর ল্যাফটার হিলের মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ড ছাড়া শিক্ষিত পুরুষ আর কেউ নেই। অবসর জীবনযাপন করছিলেন স্যার চার্লস। কিন্তু তার ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল আমাদের দুজনের মধ্যে। এছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে দু-জনেরই আগ্রহ থাকায় মনের মিল ঘটল ভালো করেই। কিন্তু আফ্রিকা থেকে বিজ্ঞানের অনেক খবর

সংগ্রহ করে এনেছিলেন উনি। বহু সন্ধ্যা আনন্দে কেটেছে এইসব আলোচনায়। বুশম্যান আর হটেনটটদের শারীরস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

শেষ কয়েক মাসের মধ্যে একটা জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। স্যার চার্লসের স্নায়ুতন্ত্র অত্যধিক চাপের দরুন ভেঙে পড়তে বসেছে। এইমাত্র যে কিংবদন্তিটা আপনাকে বললাম, উনি তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। এত বেশি করেছিলেন যে নিজের বাড়ির বাগানে পায়চারি করতেন ঠিকই, কিন্তু রাত্রে কখনো জলায় যেতেন না। শত প্রলোভনেও তাঁকে জলায় টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মি. হোমস, শুনলে খুবই অদ্ভুত মনে হবে আপনার, কিন্তু উনি সমস্ত সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করতেন সত্যিই একটা ভয়াবহ অভিশাপ ঝুলছে বংশের মাথায় অনেক দুর্ভোগ লেখা আছে অদৃষ্টে। পূর্বপুরুষদের যেসব কাহিনি শোনাতেন, তা শুনলে সত্যিই বুক দমে যায়। কল্পনা করতেন বিকট দেখতে কী যেন একটা প্রাণী সবসময়ে তাড়া করছে তাকে। প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন আমাকে, রাত্রে রুগি দেখতে বেরিয়ে অদ্ভুত কোনো জানোয়ার কখনো দেখেছি কিনা, অথবা কুকুরের ডাক শুনেছি কিনা। শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলেন বেশ কয়েকবার, প্রতিবারেই উত্তেজনায় কাঁপতে থাকত কণ্ঠস্বর।

শোচনীয় ঘটনাটার হপ্তাতিনেক আগে এক সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে গেলাম ওঁর বাড়ি। হল ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি। আমার দু-চাকার হালকা গাড়ি নিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ি থেকে নামলাম, এমন সময়ে উনি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে আমার পেছনদিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন–চোখের পাতা আর পড়ল না–সাংঘাতিক বিভীষিকা ফুটে উঠল চোখের তারায় তারায়। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াতেই ছায়ার

মতো কী যেন একটা সরে যেতে দেখলাম রাস্তার শেষপ্রান্তে বড়ো, কালো বাছুর নিশ্চয়। উনি কিন্তু এমন উত্তেজিত আর অস্থির হয়ে পড়লেন যে বাধ্য হয়ে জায়গাটায় গিয়ে জানোয়ারটাকে খুঁজলাম। যদিও পেলাম না–পালিয়েছে। কিন্তু ওঁর মনের ওপর মারাত্মক ছাপ ফেলল এই ঘটনা। সমস্ত সন্ধেটা রইলাম সঙ্গে সঙ্গে। কেন এত উত্তেজিত হয়েছেন বোঝানোের জন্যে তখনই যে পাণ্ডুলিপিটা আমার জিম্মায় উনি রেখে দিলেন। এখানে এসে প্রথমেই তা থেকে পড়ে শুনিয়েছি আপনাকে। ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও বললাম এই কারণে যে পরের ট্র্যাজেডির সঙ্গে হয়তো এর কোথাও একটা যোগসূত্র আছে–যদিও সেই মুহূর্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিষয়টা একেবারেই তুচ্ছ, এবং ওঁর এত উত্তেজনারও কোনো কারণ নেই।

আমার পরামর্শ শুনেই লন্ডন যাচ্ছিলেন স্যার চার্লস। আমি জানতাম ওঁর হৃদযন্ত্রের অবস্থা ভালো নয়। কারণটা যত উদ্ভটই হোক না কেন, একনাগাড়ে ভয় আর উদবেগের মধ্যে থাকার ফলে শরীরের ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, হৃদযন্ত্রের ওপর অত্যধিক ধকল পড়ছিল। তাই ভেবেছিলাম মাস কয়েক শহরে পাঁচ রকম ব্যাপারে মন ছেড়ে দিলে এখানকার অযথা উদবেগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন নতুন মানুষ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। মি. স্টেপূলটন আমাদের দু-জনেরই বন্ধু। স্যার চার্লসের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে উনিও উদবিগ্ন ছিলেন। লন্ডনে পাঠানোর ব্যাপারে একই মত তিনিও পোযণই করতেন। শেষ মুহূর্তে ঘটল এই ভয়ংকর বিপর্যয়।

স্যার চার্লস মারা গেলেন যে-রাতে, সেই রাতেই ব্যারিমুর তার মৃতদেহ আবিষ্কার করেই। খবর পাঠায় আমাকে। খবর নিয়ে আসে ঘোড়ার সহিস পাকিন্স। আমি তখনও শুতে

যাইনি। ঝড়ের মতো ঘোড়ায় চেপে ওকে আসতে দেখেই ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাই বাস্কারভিল হলে। তদন্তে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতিটি আমি যাচাই করেছি, তবে সমর্থন করেছি। পায়ের ছাপ ধরে ইউ-বীথি দিয়ে আমি এগিয়েছি, জলার দিকে ফটকে যেখানে উনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে হয়েছে সে-জায়গা আমি দেখেছি, ঠিক সেইখান থেকে পায়ের ছাপের ধরন পালটে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেছি, নরম কঁকর জমির ওপর ব্যারিমুরের পায়ের ছাপ ছাড়া আর পায়ের ছাপ নেই লক্ষ করেছি, সবশেষে খুব সাবধানে মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি আমি না-আসা পর্যন্ত কেউ ছোঁয়নি মৃতদেহ। দু-হাত ছড়িয়ে, দশ আঙুল দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে, মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন স্যার চার্লস একটা প্রচণ্ড আবেগ আর প্রচণ্ড গেঁচুনি প্রকট হয়ে উঠেছিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে–যার ফলে ওঁকে শনাক্ত করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছিলাম। দৈহিক আঘাত একেবারেই নেই। তদন্তের সময়ে কিন্তু একটা মিথ্যে বিবৃতি দিয়েছিল ব্যারিমুর। বলেছিল, মৃতদেহের আশপাশের জমিতে কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি। আসলে ও লক্ষ করেনি। আমি করেছিলাম–একটু তফাতে দেখেছিলাম সেই ছাপ, কিন্তু বেশ স্পষ্ট আর টাটকা।

পায়ের ছাপ?

হ্যাঁ, পায়ের ছাপ!

পুরুষমানুষের না মেয়েমানুষের?

ক্ষণেকের জন্য অদ্ভুতভাবে আমাদের পানে চেয়ে রইলেন ডক্টর মর্টিমার, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন চাপা গলায়:

মি. হোমস, পায়ের ছাপগুলো একটা দানব কুকুরের!

প্রহেলিকা

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কথাগুলো শুনেই গা শিরশির করে উঠল আমার। ডাক্তারের কণ্ঠস্বরও বেশ রোমাঞ্চিত লক্ষ করলাম, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় বলতে গিয়ে উনি নিজেও বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছেন। উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়েছে হোমস, কৌতূহল নিবিড় হলে, আগ্রহ আতীব্র হলে যেভাবে ওর চোখ জ্বলতে দেখেছি বরাবর, এখনও সেই কঠিন, শুষ্ক দীপ্তি ঠিকরে আসছে চোখের তারা থেকে।

আপনারা দেখেছেন?

আপনাকে যেরকম স্পষ্ট দেখছি, সেইভাবে দেখেছি।

কাউকে বলেননি?

বলে লাভ?

আর কেউ দেখল না, এটা কী করে হয়?

দেহ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে ছিল ছাপগুলো। কেউ তাই মাথা ঘামায়নি। এই কিংবদন্তি–পড়া থাকলে আমিও মাথা ঘামাতাম না।

জলাভূমিতে মেষপালকদের অনেক কুকুর আছে, তাই না?

আছে নিশ্চয়, কিন্তু এ-কুকুর ভেড়া সামলানোর কুকুর নয়।

খুব বড়ো বলছেন?

অতিকায়।

কিন্তু দেহের কাছে আসেনি?

না।

রাত কীরকম ছিল?

খারাপ। স্যাঁৎসেঁতে।

কিন্তু বৃষ্টি ঠিক পড়ছিল না?

না।

ইউ-বীথিটা কীরকম?

মাঝখানে আট ফুট চওড়া হাঁটবার রাস্তা। দু-পাশে বারো ফুট উঁচু মান্ধাতার আমলের ইউ গাছের দু-সারি ঝোপ–এত ঘন যে দুর্ভেদ্য বললেই চলে।

পায়ে-চলার-রাস্তা আর ঝোঁপের মাঝখানে কিছু আছে?

আছে, ছ-ফুট চওড়া ঘাসের পটি, দু-পাশেই।

ইউ-বীথির এক জায়গায় একটা ফটক আছে না?

আছে। ছোটো ফটক–জলাভূমির দিকে।

ঝোঁপের মাঝে ফটক ছাড়া আর কোনো ফাঁক আছে?

না।

তার মানে, ইউ-বীথিতে ঢুকতে হলে হয় বাড়ির দিক থেকে, নয় জলার দিক থেকে আসতে হবে?

একদম শেষে গ্রীবাসের ভেতর দিয়ে বেরোনোর পথ একটা আছে।

স্যার চার্লস তদূর পৌঁছোতে পেরেছিলেন?

তা; সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পড়েছিলেন।

এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিন, ডক্টর মর্টিমার। ছাপগুলো আপনি রাস্তায় দেখেছিলেন? ঘাসের ওপর নয় তো?

ঘাসের ওপর কোনো ছাপই পড়েনি।

জলার ফটক যেদিকে, ছাপগুলো কি সেইদিকেই দেখেছিলেন?

হ্যাঁ; জলার ফটক যেদিকে সেইদিকের রাস্তার ধার ঘেঁষে।

আপনার কথা শুনে, দারুণ কৌতূহল জাগছে। আরেকটা বিষয়। ছোটো ফটকটা কি বন্ধ ছিল?

ছিল। প্যাডলক ঝুলছিল।

কত উঁচু ফটক?

ফুট চারেক।

যে কেউ টপকে আসতে পারে?

পারে।

ছোটো ফটকের পাশে কি ছাপ দেখেছেন?

সেরকম কিছু দেখিনি।

কী আশ্চর্য! কেউই কি খুঁটিয়ে দেখেনি?

আমি দেখেছি।

তার পরেও কিছু পাননি?

বড়ো গোলমেলে ব্যাপার, মি. হোমস। স্যার চার্লস সেখানে পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পেরেছি।

কী করে বুঝলেন?

চুরুট থেকে ছাই ঝেড়েছিলেন।

চমৎকার! ওয়াটসন, এই হল গিয়ে আমাদের মনের মতো সহযোগী। কিন্তু পায়ের ছাপ?

কাঁকর বিছোনো সামান্য ওই জায়গায় নিজের পায়ের ছাপ ফেলেছেন অনেকে। আর কারো পায়ের ছাপ আলাদা করে বার করতে পারিনি।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিমায় হাঁটু চাপড়াল শার্লক হোমস।

ইস! আমি যদি থাকতাম তখন! কেসটা সত্যিই অসাধারণ, কৌতূহল তুঙ্গে তুলে ছাড়ে। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ অনেক উপাদান পাবে এ-কেস থেকে, পাবে গবেষণার বিস্তর সুযোগ। কাকর-পৃষ্ঠায় লেখা অনেক খবর আমি ঠিক পড়ে নিতাম। কিন্তু ধুলোবালি, বৃষ্টি জলে, কৌতূহলী চাষাদের কাঠের শুকতলায় সব চিহ্নই এতক্ষণে একাকার হয়ে গেছে। ডক্টর মর্টিমার, তখন আমাকে ডাকলেন না কেন! এজন্যে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।

আপনাকে ডাকার আগে যা কিছু জেনেছি দুনিয়ার সামনে তা প্রকাশ করতে হত। কেন তা করতে চাইনি আগেই বলেছি। তা ছাড়া, তা ছাড়া–

দ্বিধা করছেন কেন?

অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী, অত্যন্ত অভিজ্ঞ গোয়েন্দারাও অসহায় হয়ে পড়ে এমন রাজ্যও কিন্তু আছে।

জিনিসটা অলৌকিক, এই বলতে চাইছেন তো?

স্পষ্টভবে তা বলিনি।

বলেননি, কিন্তু মনে মনে তাই ভাবছেন।

মি. হোমস বিয়োগান্তক সেই ঘটনার পর এমন কতকগুলো ঘটনা আমার কানে এসেছে, প্রকৃতির বাঁধা নিয়মের আওতায় যা ফেলা যায় না।

যেমন?

ভয়ংকর সেই ঘটনা ঘটবার আগে জলাভূমিতে অনেকেই একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখেছে। বাস্কারভিল পিশাচের মতোই দেখতে তাকে। বিজ্ঞান-দুনিয়া এখনও এ-প্রাণীর হদিশ পায়নি। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলছে, জানোয়ারটা আকারে অতিকায়, বিকট এবং প্রেতচ্ছায়ার মতন। এদের তিনজনকে আমি জেরা করেছিলাম। তিনজনের মধ্যে যে-লোকটা গাঁয়ে থাকে, মাথা তার নিরেট, কপোল-কল্পনায় ভেসে যাওয়ার পাত্র নয়। আরেকজন ঘোড়ার ডাক্তার। তৃতীয় ব্যক্তি জলার চাষা। তিনজনেই বলেছে একই কাহিনি। কিংবদন্তির পিশাচ কুকুরের মতোই একটা ভয়ংকর প্রেতচ্ছায়া নাকি ঘুরে

বেড়ায় জলাভূমিতে–সাক্ষাৎ নরক থেকে তার আবির্ভাব। বিশ্বাস করুন, আতঙ্কে থমথম করেছে গোটা জলা। পাথরের মতো শক্ত যার বুকের পাটা, রাতের অন্ধকারে সে-ও আর জলা পেরোতে রাজি নয়।

বিজ্ঞানের লোক হয়ে আপনিও এইসব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বিশ্বাস করেন দেখছি।

বুঝতে পারছি না এ ছাড়া আর কী বিশ্বাস করা যায়।

কাঁধ ঝাঁকাল হোমস। বলল, এতাবকাল ইহজগতের ব্যাপার-স্যাপারেই সীমিত রেখেছিলাম আমার তদন্ত। বিনয়ের সঙ্গে বলব, অশুভ শক্তির সঙ্গে টক্কর দিয়েছি বহুবার। কিন্তু অশুভ শক্তিদের জনকের সঙ্গে লড়তে যাওয়াটা খুব বেশি উচ্চাশা হয়ে যায়। অবশ্য পায়ের ছাপটা যে জন্তুজগতের, আপনি তা স্বীকার করছেন।

কিংবদন্তি কুকুরটাও বস্তুজগতের কুকুরের মতোই টুটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু পৈশাচিক ছিল সে।

আরে সর্বনাশ! আপনি তো দেখছি অতিপ্রাকৃতবিদদের অনেক কাছে চলে গেছেন। ডক্টর মর্টিমার, এবার একটা কথা বলুন তো। এই যদি আপনার ধারণা হয়, তাহলে পরামর্শের জন্য আমার কাছে এসেছেন কেন? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে স্যার চার্লসের মৃত্যু-রহস্যের তদন্ত যে একটা পণ্ডশ্রম, আপনি তা বিশ্বাস করেন। তা সত্ত্বেও চান আমি তদন্ত করি।

আমি তো বলিনি যে আমার ইচ্ছে আপনি তদন্ত করুন।

তাহলে আপনাকে সাহায্যটা করব কীভাবে?

ঘড়ির দিকে তাকালেন ডক্টর মর্টিমার। বললেন, এখন থেকে ঠিক একঘণ্টা পনেরো মিনিট পরে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছোচ্ছেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল। কী করব তাঁকে নিয়ে, আপনি শুধু তাই বলে সাহায্য করুন আমাকে।

উত্তরাধিকারী হিসেবে আসছেন বলেই কি এই পরামর্শ চাইছেন?

হ্যাঁ। স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর খোঁজখবর নিয়ে জানলাম তরুণ এই ভদ্রলোক কানাডায় চাষবাস নিয়ে আছেন। যদ্র খবর পেয়েছি, ভদ্রলোক সবদিক দিয়ে চমৎকার। এখন কিন্তু ডাক্তার হিসেবে এসব কথা বলছি না, বলছি স্যার চার্লসের উইলের অছি আর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে।

আর কেউ দাবিদার নেই নিশ্চয়?

না। ইনি ছাড়া আর এক জ্ঞাতির সন্ধান পেয়েছিলাম। রোজার বাস্কারভিল–স্যার চার্লসের কনিষ্ঠ ভাই–স্যার চার্লস ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মেজো ভাই অল্প বয়সেই মারা যান। এই হেনরি ছেলেটা তাঁরই ছেলে। তৃতীয় ভাই রজার বংশের কুলাঙ্গার।

বাস্কারভিল বংশের আদি-পুরুষদের দাপট যেন ওঁর মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়েছিল। লোকে বলে, চেহারা চরিত্র সবদিক দিয়ে হিউগো বাস্কারভিলের দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি। হিউগোর পারিবারিক ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ইংল্যান্ডকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পালিয়ে যান মধ্য-আমেরিকায়, সেখানেই হলুদ জ্বরে মারা যান ১৮৭৬ সালে। বাস্কারভিল বংশের শেষ বংশধর এখন এই হেনরি। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে ওয়াটারলু স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা হবে আমার। তারবার্তায় জেনেছি সাদাম্পটন পৌঁছেছেন আজ সকালে। মি. হোমস, বলুন এখন কী করি তাঁকে নিয়ে।

বাপ-পিতামহের ভিটেয় কেন যাবেন না বলতে পারেন?

সেইটাই স্বাভাবিক, তাই না? অথচ দেখুন বাস্কারভিল বংশের যারাই ওখানে গেছে, কপাল পুড়েছে তাদের। অমঙ্গল এসেছে জীবনে। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর আগে আমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ যদি পেতেন স্যার চার্লস, শেষ বংশধরকে, তাঁর বিপুল বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে, করাল মৃত্যুর এহেন জায়গায় না-আসতেই বলে দিতেন। অথচ দেখুন, ওঁর উপস্থিতির ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করছে দীনহীন এই পল্লি অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি। বাস্কারভিল হলে মানুষ যদি না-থাকে, তাহলে স্যার চার্লস যা কিছু সৎকাজ করে গেছেন, সবই মাঠে মারা যাবে। আমার স্বার্থ আছে বলেই এ-ব্যাপারে পাছে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলি, তাই এসেছি আপনার উপদেশ নিতে।

একটু ভেবে নিল হোমস। বললে, সোজা কথায় ব্যাপারটা তাহলে এই–

আপনি মনে করেন, ডার্টমুরে এমন একটা পৈশাচিক শক্তি কাজ করছে যার ফলে বাস্কারভিল বংশধরদের পক্ষে জায়গাটা নিরাপদ নয়–কেমন? এই তো আপনার অভিমত?

সে-রকম অনেক প্রমাণ পেয়েছি, এটুকুই শুধু বলতে চাই। ঠিক কথা।

কিন্তু আপনার অতিপ্রাকৃত অনুমিতি যদি সঠিক হয়, তাহলে কিন্তু অশুভশক্তির প্রকোপ শুধু ডেভনশায়ার কেন, লন্ডন শহরেও সমানভাবে দেখা যাবে। শুধু গ্রাম্য-গির্জের পোশাক ঘরেই তাণ্ডবনাচ দেখিয়ে শয়তান ক্ষান্ত হবে, এমনটা কিন্তু কল্পনা করা কঠিন।

মি. হোমস, আপনি নিজে এসবের সংস্পর্শে সরাসরি আসেননি বলেই এমনি ধরনের কথা বলছেন–এলে কিন্তু এভাবে কথা আর বলতেন না। আপনার উপদেশ তাহলে এই : আপনি মনে করেন হেনরি বাস্কারভিল লন্ডন শহরে যতখানি নিরাপদ থাকবেন, ঠিক ততখানি নিরাপদ থাকবেন ডেভনশায়ারেও। পঞ্চাশ মিনিট পরে উনি আসছেন। বলুন কী সুপারিশ করতে চান?

মশায়, আমার সুপারিশ একটাই–আমার সামনের দরজা আঁচড়ে শেষ করে দিল আপনার স্প্যানিয়েল কুকুরটা। তাকে ডেকে নিয়ে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চাপুন, ওয়াটারলু। স্টেশনে যান, স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করুন।

তারপর?

তারপর, যতক্ষণ না আমি এ-ব্যাপারে মনস্থির করছি ততক্ষণ তাকে কিস্‌সু বলবেন না।

মনস্থির করতে কতক্ষণ সময় নেবেন?

চব্বিশ ঘণ্টা। ডক্টর মর্টিমার, কাল দশটার সময়ে এই ঘরে আমার সঙ্গে আপনি দেখা করলে অত্যন্ত বাধিত হব, স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে যদি সঙ্গে আনেন তাহলে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা রচনা করতেও অনেক সুবিধে হবে।

তাই করব, মি. হোমস।

শার্টের আস্তিনের কপে সাক্ষাতের সময় লিখে নিলেন ডক্টর মর্টিমার। তারপর ওঁর নিজস্ব অদ্ভুত ভঙ্গিমায় উঁকি মারা কায়দায় মাথা ঠেলে বার করে, আনমনাভাবে হন হন করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড় করাল হোমস।

বলল, আর একটা প্রশ্ন, ডক্টর মর্টিমার। আপনি বলছিলেন, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকজন এই শরীরী প্রেতকে টহল দিতে দেখেছে জলায়?

তিনজন দেখেছে।

মৃত্যুর পর আর কেউ দেখেছে?

আমি শুনিনি।

ধন্যবাদ। সুপ্রভাত।

চেয়ারে ফিরে এসে বসল হোমস। অন্তরে পরিতৃপ্তি প্রকাশ পেল প্রসন্ন মুখচ্ছবিতে। মনের মতো কাজ যেন এসে গেছে–পা বাড়ালেই হয়।

বেরোচ্ছ নাকি, ওয়াটসন?

আমাকে দিয়ে যদি তোমার কোনো কাজ না হয়, তাহলেই বেরোব।

ভায়া ওয়াটসন, সক্রিয় মুহূর্তেই তোমাকে আমার দরকার। কয়েকটা ব্যাপারে এ-কেস কিন্তু চমকপ্রদ, সত্যিই অদ্বিতীয়। ব্র্যাডলির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে এক পাউন্ড কড়া দা-কাটা তামাক পাঠিয়ে দিতে বলবে? ধন্যবাদ। সন্ধে পর্যন্ত যদি বাইরে কাটিয়ে দিতে পারো, তাহলে ভালোই হয়। সেই ফাঁকে অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এই ধাঁধার সঙ্গে আমার ধারণাগুলো মিলিয়ে নেব।

প্রগাঢ় মনঃসংযোগের প্রয়োজন দেখা দিলেই নির্জনতা আর একাকিত্ব নিতান্তই দরকার হয় বন্ধুবরের। তখন মনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখে কোন পয়েন্টটা কাজের আর কোনটা অকাজের। মনে মনে খাড়া করে বিকল্প অনুমিতি, একটার সঙ্গে আর একটা

মিলিয়ে দেখে কোনটা বেশি কার্যকর, বিধি সাক্ষ্যপ্রমাণের গুরুত্ব যাচাই করে স্রেফ চিন্তাশক্তি দিয়ে। কাজেই সারাদিন ক্লাবে কাটালাম, সন্ধের আগে বেকার স্ট্রিটমুখো হলাম না। রাত নটায় ঢুকলাম বসবার ঘরে।

ঢুকেই প্রথমে মনে হল নিশ্চয় আগুন লেগেছে কোথাও ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে, টেবিলের ওপর ল্যাম্পের আলোও ম্লান হয়ে উঠেছে ধোঁয়ার আড়ালে। ঢোকবার পর অবশ্য সে-ভয় আর রইল না। কেননা তামাক-পোড়ার গন্ধ ভেসে এল নাকে। সেইসঙ্গে কড়া তামাকের কটু, উগ্র ধোঁয়া গলায় ঢুকতেই কাশতে লাগলাম খক খক করে। ধোঁয়ার ঝাঁপসা পর্দার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম দাঁতের ফাঁকে কালো ক্লে-পাইপ কামড়ে ধরে চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে হোমস। খানকয়েক পাকানো কাগজ ছড়ানো আশেপাশে।

শুধোলো, ঠান্ডা লাগিয়ে এলে নাকি, ওয়াটসন?

না, আবহাওয়াটা বিষাক্ত।

ভাগ্যিস বললে তুমি, ধোঁয়াটা খুব ঘন হয়ে উঠেছে দেখছি।

ঘন কী হে! অসহ্য!

তাহলে বরং জানলাটা খুলে দাও!

সারাদিন ক্লাবে ছিলে দেখছি। ভায়া হোমস! ঠিক বলেছি?

নিশ্চয়, কিন্তু কীভাবে–

আমার হতচকিত ভাব দেখে হেসে ওঠে হোমস।

ওয়াটসন, তোমার মধ্যে দারুণ একটা মনমাতানো তাজা ভাব দেখতে পাচ্ছি। তাই তোমারই কৃপায় পাওয়া আমার সামান্য শক্তির কসরত দেখানোর সুযোগ ছাড়তে পারিনি। কাদাটে বাদলা দিনে রাস্তায় বেরোলেন এক ভদ্রলোক। ফিরে এলেন ফিটফাট বেশে–জুতো আর টুপির চেকনাই অম্লান রেখে। অতএব তিনি সারাদিন কোথাও ঠায় বসে ছিলেন। কোথায় থাকা সম্ভব বলে মনে হয়? স্পষ্ট ব্যাপার, নয় কী?

স্পষ্টই বটে।

দুনিয়াটা স্পষ্ট জিনিসেই ঠাসা, কিন্তু চোখ মেলে দেখার সুযোগ কেউ পায় না। আমি কোথায় ছিলাম বলে মনে হয়?

ঠায় বসে ছিলে।

ঠিক উলটো। আমি ডেভনশায়ারে গিয়েছিলাম।

সূক্ষ্ম দেহে?

ঠিক বলেছ। দেহটা এই হাতল-চেয়ারে থেকেছে; অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি– আমার অবর্তমানে সে দুটো বড়ো পট-ভরতি কফি আর অবিশ্বাস্য পরিমাণ তামাক সেবা করেছে। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর স্ট্যানফোর্ডের দোকান থেকে জলার সামরিক ম্যাপ আনিয়েছিলাম। এতক্ষণ সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করছিলাম সেখানে। রাস্তা চিনতে ভুল হয়নি।

বিরাট স্কেল ম্যাপ নিশ্চয়?

খুবই বিরাট। একটা অংশ খুলে হাঁটুর ওপর মেলে ধরল হোমস। এই সেই জলা যা নিয়ে আমাদের দরকার। মাঝখানের এইটা বাস্কারভিল হল।

জঙ্গল ঘেরা?

ঠিক। ইউ-বীথিটা ম্যাপে দেখানো হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা এই লাইন বরাবর হবে বুঝতে পারছ নিশ্চয় জল পড়ছে লাইনের ডান দিকে। এইখানে এই যে ছোটো ছোটো বাড়ির জটলা, এই হল গ্রিমপেন পল্লি, আমাদের বন্ধু ডক্টর মর্টিমারের সদরদপ্তর। পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সামান্য কিছু বাড়িঘরদোর। এই হল ল্যাফটার হল–বিবৃতিতে উল্লেখ আছে। এইখানে একটা বাড়ির চিহ্ন দেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে প্রকৃতিবিদের বাসস্থান। নামটা যদূর মনে পড়ে স্টেপলটন। এইখানে দুটো জলাভূমির খামারবাড়ি–হাই টর* আর ফাউলমায়ার। তারপর চোদ্দো মাইল দূরে রয়েছে

প্রিন্সটাউনের বিরাট কয়েদখানা। বিক্ষিপ্ত এই কয়েকটা জায়গায় চারপাশে আর মাঝে খাঁ-খাঁ করছে প্রাণহীন, জনহীন জলাভূমি। এই মঞ্চেই অভিনীত হয়েছে বিয়োগান্তক সেই দৃশ্য এবং এই মঞ্চেই তার পুনরাভিনয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা।

খুবই বন্য অঞ্চল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, উপর্যুক্ত পরিবেশ। শয়তানের যদি ইচ্ছে হয় নরলোকের ব্যাপারে নাক গলানোর—

অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার দিকে তাহলে তুমি নিজেই ঝুঁকছ।

শয়তানের অনুচর তো রক্ত-মাংসের প্রাণীও হতে পারে, পারে না কি? শুরুতেই দুটো প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। প্রথম, আদৌ কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না। দ্বিতীয়, অপরাধটা কী এবং করা হয়েছে কীভাবে? ডক্টর মর্টিমারের অনুমান যদি সত্যি হয়, সত্যিই যদি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোনো অজ্ঞাত শক্তির খেলা এ-কেসে থাকে তাহলে আমাদের তদন্তেরও ইতি এইখানে। কিন্তু এটা হল গিয়ে আমাদের শেষ অনুমিতি। এর আগের সবক-টা অনুমিতি যাচাই করার আগে এ-অনুমিতিতে ধরাশায়ী হতে আমি রাজি নই। যদি কিছু মনে না-করো, আমার মনে হয় ওই জানলাটা আবার বন্ধ করতে পারি। ব্যাপারটা অসাধারণ। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি ঘনীভূত আবহাওয়ায় চিন্তাশক্তিও ঘনীভূত হয়–একাগ্রতা বাড়ে। চিন্তাকে ঠেলেঠুলে অবশ্য একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে যাচাই করে দেখিনি কতখানি সত্য কথাটা–তবে বিশ্বাসটা এসেছে যুক্তিনির্ভর পথে। কেসটা নিয়ে ভেবেছ?

হ্যাঁ, ভেবেছি। সারাদিন অনেক চিন্তা করেছি।

ভেবে কী মনে হল?

অত্যন্ত গোলমেলে।

কাঠামোটা কিন্তু সেইরকমই। তফাতও আছে। যেমন, পায়ের ছাপের পরিবর্তন। তোমার কী মনে হয়?

মর্টিমার তো বললেন বীথির ওইদিকে আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন স্যার চার্লস।

তদন্তে কতগুলো মুখ যা বলেছে, উনি শুধু তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। বীথির পথে আঙুলে ভর দিয়ে কেউ হাঁটে?

তাহলে?

দৌড়াচ্ছিলেন, ওয়াটসন, প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়োচ্ছিলেন, স্যার চার্লস, পড়ি কি মরি করে দৌড়োচ্ছিলেন, দৌড়াতে দৌড়াতে শেষকালে কলজে ফেটে যায়, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মৃতদেহটা।

কার তাড়া খেয়ে দৌড়োচ্ছিলেন?

সেইটাই তো আমাদের প্রহেলিকা। দৌড়োনোর আগে উনি যে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন, সে-রকম ইঙ্গিত কিন্তু রয়েছে।

কেন বলছ?

আমি ধরে নিচ্ছি মৃত্যুর কারণটা এসেছে জলার ওপর দিয়ে। তাই যদি হয়, তাহলে বলব ভয়ের চোটে উনি বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাড়ির দিকে না-দৌড়ে, ঠিক উলটোদিকে দৌড়োচ্ছিলেন। যাযাবর জিপসির জবানবন্দি যদি সত্যি হয়, তাহলে উনি বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করতে করতে এমন একদিকে দৌড়চ্ছিলেন যেদিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। তারপর ধরো, সে-রাতে কার প্রতীক্ষা উনি করছিলেন? বাড়িতে বসে প্রতীক্ষা না-করে ইউ-বীথির মধ্যে দিয়ে পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?

তোমার কি মনে হয় উনি কারো অপেক্ষায় ছিলেন?

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, তার ওপর অশক্ত। সান্ধ্যভ্রমণ তাকে মানায় ঠিকই, কিন্তু সে-রাতে দারুণ ঠান্ডা পড়েছিল, ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, মাটি স্যাঁৎসেতে ছিল। এ-পরিস্থিতিতে তার মতো মানুষের পক্ষে পাঁচ থেকে দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কি স্বাভাবিক বলে মনে হয়? চুরুটের ছাই থেকে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন ডক্টর মর্টিমার।

ভদ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি এত প্রখর ভাবতে পারিনি।

উনি কিন্তু প্রতি সন্ধ্যাতেই বেড়াতেন।

প্রতি সন্ধ্যায় জলার গেটে অপেক্ষা করতেন, তা কিন্তু মনে হয় না। পক্ষান্তরে, সাক্ষীরা বলেছে উনি জলাভূমি এড়িয়ে চলতেন। অথচ সে-রাতে অপেক্ষা করেছেন ফটকের কাছে। পরের দিনই তার লন্ডন রওনা হওয়ার কথা। এবার একটা আকার নিচ্ছে কেসটা। বোধগম্য হচ্ছে। বেহালাটা এগিয়ে দেবে, ওয়াটসন? কাল সকালে স্যার হেনরি বাস্কারভিল আর ডক্টর মর্টিমারের সাক্ষাতের আগে মুলতবি থাক এ-প্রসঙ্গে যাবতীয় ভাবনাচিন্তা।

স্যার হেনরি বাস্কারভিল

সকাল-সকাল সাফ হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট টেবিল, পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারীদের অপেক্ষায় ড্রেসিংগাউন পরে বসে রইল হোমস। মক্কেলরা দেখলাম ঘড়ি ধরে চলেন। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এলেন। ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গেসঙ্গে ডক্টর মর্টিমারকে নিয়ে আসা হল ওপরে, পেছনে পেছনে এলেন তরুণ ব্যারনেট। ভদ্রলোকের বয়স বছর তিরিশ, ছোটোখাটো মানুষ, সতর্ক, চোখ কালো, অত্যন্ত বলিষ্ঠ গঠন–যেন পেটাই লোহা, পুরু কালো ভুরু এবং দৃঢ়, যুদ্ধপ্রিয় মুখাবয়ব। পরনে লালচে টুইডসুট, চেহারায় রোদ জলের স্বাক্ষর যেন জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন খোলা হাওয়ায়, তা সত্ত্বেও কিন্তু স্থির চোখ আর শান্ত আচরণের মধ্যে উচ্চবংশের সুপষ্ট ছাপ।

ইনিই স্যার হেনরি বাস্কারভিল, বললেন ডক্টর মর্টিমার।

কী কাণ্ড দেখুন দিকি, বললেন স্যার হেনরি, অদ্ভুত ব্যাপার মি. শার্লক হোমস, এই বন্ধুটি যদি আজ সকালে আপনার এখানে আসবার কথা না-বলতেন, আমি নিজেই আসতাম। ছোটোখাটো ধাঁধার সমাধান আপনি করেন জানি। আজ সকালেই এমনি একটা ধাঁধায় আমি পড়েছি। একটু বেশি চিন্তার দরকার আমার সে সময় নেই।

বসুন স্যার হেনরি। লন্ডনে পোঁছে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন মনে হচ্ছে?

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, মি. হোমস। ঠাট্টা বলেই মনে হয়। আজ সকালে এই চিঠিটা পেয়েছি জানি না একে চিঠি বলবেন কি না।

টেবিলের ওপর একটা লেফাফা রাখলেন স্যার হেনরি, আমরা প্রত্যেকেই ঝুঁকে পড়লাম খামটার ওপর। মামুলি কাগজের খাম, রংটা ধূসর। অসমান ছাঁদে লেখা ঠিকানা স্যার হেনরি বাস্কারভিল, নরদামবারল্যান্ড হোটেল। ডাকঘরের ছাপ শেরিংক্রস, চিঠি ডাকে ফেলার তারিখ গতকাল সন্ধ্যা।

তীক্ষ্ম চোখে তরুণ ব্যারনেটের পানে তাকিয়ে শার্লক হোমস, আপনি যে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে উঠেছেন, কে তা জানত?

কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ডক্টর মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ঠিক করেছিলাম দু-জনে।

কিন্তু ডক্টর মর্টিমার নিশ্চয় আগেই উঠেছিলেন ওখানে?

না, আমি উঠেছি এক বন্ধুর বাড়িতে বললেন ডক্টর মর্টিমার, এ-হোটেলে আসব, এ-রকম কোনো আভাস আগে প্রকাশ পায়নি।

হুম! আপনার গতিবিধির ব্যাপারে কোনো একজনের গভীর আগ্রহ রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

খামের মধ্যে থেকে চার ভাঁজ করা এক তাড়া ফুলক্যাপ কাগজ বার করে হোমস। ভাজ খুলে মেলে ধরে টেবিলের ওপর। কাগজ থেকে কাটা কতকগুলো ছাপা শব্দ মাঝখানে আঠা দিয়ে লাগিয়ে একটা বাক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটা এই: প্রাণের মায়া আর বুদ্ধি থাকলে জলার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না। জলার শব্দটা লেখা কালি দিয়ে।

স্যার হেনরি বাস্কারভিল বললেন, এবার বলুন মি. হোমস, মানে কী এসবের? আমার ব্যাপারেই-বা এত আগ্রহ কার?

ডক্টর মর্টিমার, আপনার কী মনে হয়? মানছেন নিশ্চয় এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই?

তা নেই। তবে এ-চিঠি যে লিখেছে তার দৃঢ় বিশ্বাস পুরো ব্যাপারটা অতিপ্রাকৃত।

কী ব্যাপার? ঝটিতে জিজ্ঞেস করেন স্যার হেনরি। আমার নিজের ব্যাপারে আমি যা জানি, মনে হচ্ছে তার চাইতে ঢের বেশি খবর রাখেন আমার?

স্যার হেনরি, এ-ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগেই আমরা যা জানি, আপনিও তা জানবেন। কথা দিচ্ছি আমি, বললে শার্লক হোমস। অতঃপর যদি অনুমতি দেন, অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এই দলিলটায় মন দিতে পারি। নিশ্চয় কাল সন্ধ্যায় এ-চিঠি জোড়াতালি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর ডাকে ফেলা হয়েছে। গতকালের টাইমস কাগজ আছে?

এই তো কোণে রয়েছে।

একটু কষ্ট করে মাঝের কাগজটা দেবে–যাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা আছে। একটার পর একটা স্তম্ভের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল হোমস। মুক্ত বাণিজ্যের ওপর শীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধ। কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি। কেউ কেউ বুদ্ধি দিচ্ছেন, একটা বাড়তি শুল্কের আড়াল থাকলে ব্যবসার সমৃদ্ধি ঘটবে, স্বদেশি জিনিসের ওপর মায়া বাড়বে, কিন্তু বুঝছেন না এ ধরনের আইনের ফলে শেষকালে বিদেশের অর্থ এদেশের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না, আমদানির পরিমাণ কমে যাবে, আর এ-দ্বীপের লোকের প্রাণধারণের মানও কমে যাবে। কীরকম বুঝছ, ওয়াটসন? দারুণ উৎফুল্ল হয়ে পরম পরিতৃপ্তির স্বরে হাত ঘষতে ঘষতে বললে হোমস। প্রশংসনীয় সেন্টিমেন্ট, তাই না?

পেশাদারি আগ্রহ ফুটে ওঠে ডক্টর মর্টিমারের চোখে-মুখে নির্নিমেষে তাকালেন হোমসের পানে। স্যার হেনরি বাস্কারভিল কিন্তু বিভ্রান্ত দুই কৃষ্ণ চক্ষু নিবদ্ধ করলেন আমার ওপর।

বললেন, বাণিজ্য আর শুল্কের অত খবর আমি রাখি না। তবে বোধ হয় চিঠির প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি।

ঠিক উলটো, স্যার হেনরি, সূত্র ধরে দিব্যি এগিয়ে চলেছি। ওয়াটসন আমার পদ্ধতির খবর রাখে। কিন্তু দেখছি সে-ও কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারেনি।

সত্যিই পারিনি। দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক দেখছি না।

ভায়া ওয়াটসন, সম্পর্কটা এতই নিবিড় যে একটাকে আর একটা থেকে টেনে বার করা হয়েছে। প্রাণের, মায়া, আর, বুদ্ধি, থাকলে, ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না। বুঝতে পারছ। না কোত্থেকে নেওয়া হয়েছে শব্দগুলো?

কী আশ্চর্য! ঠিক ধরেছেন তো! দারুণ স্মার্ট দেখছি। আপনি! সবিস্ময়ে বললেন স্যার হেনরি!

সম্ভাব্য সন্দেহ যদিও-বা কিছু থাকে, ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না শব্দগুলো দেখলেই তা ঘুচে যাবে।ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না একসঙ্গে কেটে নেওয়া হচ্ছে একটা ন অন্য জায়গা থেকে কেটে এনে ঘেঁষবের পাশে লাগিয়ে ঘেষবেন করা হয়েছে।

তাই তো বটে!

ডক্টর মর্টিমার অবাক চোখে আমার বন্ধুর পানে তাকিয়ে বললেন—মি. হোমস, এ যে আমি ভাবতেই পারছি না! খবরের কাগজ থেকে কেটে নিয়ে শব্দগুলো আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে, যে কেউ তা বলতে পারে। কিন্তু খবরের কাগজের নাম বলে দেওয়া, এমনকী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকেই যে তা নেওয়া–এ যে রীতিমতো আশ্চর্য ব্যাপার! এ-রকম কাণ্ড

কখনো শুনিনি আমি। কী করে বললেন বলুন তো?

ডক্টর, নিগ্রো আর এস্কিমোর করোটি দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন?

নিশ্চয় পারব।

কীভাবে?

আরে, সেটাই তো আমার বিশেষ শখ। তফাতগুলো সুস্পষ্ট। চোখের কোটরের ওপর দিককার হাড়ের উঁচু গড়ন, মুখাবয়বের কোণ, চোয়ালের বাঁক—

এটাও আমার বিশেষ শখ, তফাতগুলো এক্ষেত্রেও সমানভাবে সুস্পষ্ট! আপনার ওই এস্কিমোর খুলি আর নিগ্রোর খুলির মধ্যে যে তফাত, আধপেনি দামের অগোছালো সান্ধ্য-দৈনিক ছাপা আর টাইমস প্রবন্ধের ছোটো ছোটো বরজয়িস হরফের মধ্যে সেই একই তফাত ধরা পড়ে যায় আমার চোখে। অপরাধ বিষয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞ হতে গেলে হরফ দেখেই চিনতে পারার বিদ্যে একটা রীতিমতো অসাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে; যদিও স্বীকার করছি, খুব অল্প বয়সে লিডস মার্কারি আর ওয়েস্টার্ন মর্নিং ক্রনিকল-এর হরফ দেখে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তবে কি জানেন, টাইমস কাগজের প্রধান সম্পাদকীর একেবারেই আলাদা জাতের, এ-শব্দগুলো অন্য কোনো কাগজে নেওয়া হয়নি কখনোই নয়। যেহেতু কাজটা সারা হয়েছে গতকাল, তাই গতকালের টাইমস থেকে নেওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি করে দেখা দিয়েছিল।

স্যার হেনরি বাস্কারভিল বললেন, আপনার কথা শুনে যদূর বুঝছি, এই চিঠির শব্দগুলো কেউ কাঁচি দিয়ে কেটে

নখ কাটা কাঁচি দিয়ে, বললে হোমস। কাচির ফলা দুটো খুবই ছোটো। ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না কাটতে গিয়ে দু-বার কঁচি চালাতে হয়েছে।

ঠিক। ছোটো ফলাওলা কঁচি দিয়ে শব্দগুলো কেউ কেটেছে, তারপর ময়দার আঠা দিয়ে—

গঁদের আঠা দিয়ে, বললে হোমস।

গঁদের আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়েছে। কিন্তু জলার শব্দটা হাতে লেখা হল কেন জানতে পারলে খুশি হতাম।

কারণ ছাপার অক্ষরে শব্দটা পাওয়া যায়নি। অন্য শব্দগুলো সোজা, যেকোনো দিনের সংখ্যাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু জলার শব্দটা চট করে চোখে পড়ে না।

ঠিক বলেছেন, বুঝলাম ব্যাপারটা। চিঠির বয়ানে আর কিছু চোখে পড়ল, মি. হোমস?

দু-একটা ইঙ্গিত চোখে পড়েছে, তবে অত্যন্ত যত্নসহকারে যাবতীয় সূত্র মুছে ফেলা হয়েছে। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়, ঠিকানাটা লেখা হয়েছে অসমান ছাঁদে। কিন্তু টাইমস এমনই একটা কাগজ যা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কারু হাতে সচরাচর যায় না। তাহলেই

ধরে নিচ্ছি, ঠিকানা যে লিখেছে, সে লেখাপড়া জানা মানুষ কিন্তু অশিক্ষিত সেজে থাকতে চাইছে। হাতের লেখা লুকোনোর এই চেষ্টা, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে হয় তার হাতের লেখা আপনি চেনেন অথবা চিনে ফেলতে পারেন। তারপর দেখুন, শব্দগুলো সঠিক লাইনে গদ দিয়ে সাঁটা হয়নি। যেমন, এই প্রাণের শব্দটা লাইনের যেখানে থাকার কথা, সেখান থেকে ঠেলে উঠে পড়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে শব্দ যে কেটেছে, হয় সে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে উত্তেজনার চোটে মেপেজুপে লাগায়নি, অথবা সে অসতর্ক পুরুষ। আমি কিন্তু প্রথম মতবাদের পক্ষপাতী। কেননা বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এ-চিঠি যে সৃষ্টি করেছে, সে অসতর্ক পুরুষ, ভাবতে পারছি না। তাড়াতাড়িই যদি করে থাকে, কেন তাড়াতাড়ি করেছিল সেটাই হবে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। কেননা, মাঝরাত পর্যন্ত যেকোনো সময়ে চিঠি ডাকে ফেললে হোটেল ছেড়ে বেরোনোর আগে স্যার হেনরির হাতে পৌঁছে যেত। তবে কি বাধা পাওয়ার আশঙ্কা করেছিল পত্রলেখক? কে বাধা দিত?

ডক্টর মর্টিমার বললেন, আমরা কিন্তু এবার অনুমানের রাজ্যে ঢুকে পড়েছি।

বরং বলুন এমন একটা রাজ্যে ঢুকেছি যেখানে বিভিন্ন সম্ভাবনা পাল্লায় চাপিয়ে দেখি কোনটা বেশি ভারী, বেছে নিই যেটা সবচেয়ে বেশি সম্ভবপর। এ হল কল্পনার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগপদ্ধতি, দূর কল্পনা শুরু করতে হবে কিন্তু বস্তুজগতের বনেদের ওপর। আপনি বলবেন অনুমান, আমি কিন্তু প্রায় নিশ্চিত যে এ-ঠিকানা লেখা হয়েছে কোনো একটা হোটেল থেকে।

কী করে তা জানছেন?

খুঁটিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে কলম আর কালি দুটোই ভুগিয়েছে লেখককে। একটিমাত্র শব্দ লিখতে গিয়ে দু-বার কালি ছিটিয়েছে কলম এবং ছোট্ট একটা ঠিকানা লিখতে গিয়ে কালি ফুরিয়েছে তিন বার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দোয়াতে নামমাত্র কালি ছিল। বাড়ির দোয়াত বা কলম কদাচিৎ এ-রকম দুরবস্থায় থাকে–একই সাথে দুটোর এ-রকম হাল বিরল ঘটনা বললেই চলে। কিন্তু হোটেলের দোয়াত আর কলমের ছিরি কীরকম হয়, আপনি তা জানেন, এর চেয়ে ভালো জিনিস সেখানে আশা করা যায় না। শেরিংসের আশপাশের হোটেলগুলোয় ছেড়া কাগজের ঝুড়ি হাঁটকালে কাটা-ছেড়া টাইমস সম্পাদকীয় পাওয়া যে যাবে, এ-কথা বলতে খুব একটা দ্বিধা আমার নেই। অত্যাশ্চর্য এই পত্র যে রচনা করেছে, তাকেও ধরে ফেলা যাবে অনায়াসে। আরে! আরে! আরে! এ আবার কী?

খবরের কাগজের শব্দগুলো যে ফুলক্যাপ কাগজে গদ দিয়ে লাগানো হয়েছে, দেখলাম, হোমস সেই কাগজখানা চোখের সামনে এক ইঞ্চি কি দু-ইঞ্চি তফাতে রেখে কী যেন দেখছে।

কী হল?

কিছু না, কাগজটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে হোমস।জলছাপের দাগ পর্যন্ত নেইবেবাক ফাঁকা আধখানা একটা কাগজ। অদ্ভুত এই চিঠি থেকে অনেক কিছুই লাভ

করা গেল। স্যার হেনরি, এবার বলুন, লন্ডনে পৌঁছোনোর পর কৌতূহলোদ্দীপক আর কোনো ঘটনা ঘটেছে আপনাকে নিয়ে?

না, মি. হোমস, মনে তো হয় না।

আপনার পিছু নিচ্ছে বা আপনার ওপর নজর রাখছে, এমন কাউকে লক্ষ করেননি?

সস্তার রোমাঞ্চ উপন্যাসের নায়ক হয়ে পড়েছি মনে হচ্ছে? আরে মশাই, আমার পেছন নিয়ে বা আমার ওপর নজর রেখে কার কী লাভ বলতে পারেন?

বলছি সে-কথা। সে-প্রসঙ্গ শুরু করার আগে বলবার মতো আর কোনো খবরই কি নেই?

বলবার মতো কিনা, সেটা আপনার মনে করার ওপর নির্ভর করছে।

দৈনন্দিন জীবনের বাইরে যা কিছু, সবই বলবার মতো ঘটনা বলে জানবেন।

মৃদু হাসলেন স্যার হেনরি, ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবনের খবর আমি খুব একটা রাখি না। জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছি কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব এক পাটি বুট জুতো হারানোটা নিশ্চয় এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে পড়ে না।

এক পাটি বুট জুতো হারিয়েছেন? উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ডক্টর মর্টিমার। হোটেলে ফিরে গিয়েই দেখবেন আপনার জুতো আপনার কাছেই আবার ফিরে এসেছে। সামান্য এই বিষয় নিয়ে মি. হোমসকে উত্ত্যক্ত করে লাভ কী বলতে পারেন?

উনি কিন্তু বলেছেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাইরে যা কিছু ঘটেছে, সব বলতে হবে।

ঠিকই তো, বললে হোমস। যত উদ্ভটই হোক না কেন, তবুও তা শুনতে হবে। একপাটি বুট হারিয়েছে আপনার?

নিশ্চয় কোথাও পড়ে-উড়ে আছে। কাল রাত্রে দরজার সামনে দু-পাটি রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি এক পাটি রয়েছে। বুটপালিশ ছোকরার পেট থেকে কথা বার করতে পারলাম না। সবচেয়ে যাচ্ছেতাই হল, বুটজোড়া কালকেই রাত্রে কিনেছিলাম স্ট্যান্ড থেকে, একবারও পায়ে দিয়ে হাঁটা হয়নি।

যদি পায়ে দিয়েই না-থাকেন তো পরিষ্কার করার জন্যে বাইরে রেখেছিলেন কেন?

কষ লাগিয়ে পাকা করা কাঁচা চামড়ার বুট তো, ভার্নিশ ছিল না। তাই রেখে ছিলাম বাইরে।

আপনি তাহলে গতকাল লন্ডনে পা দিয়েই বেরিয়েছিলেন? জুতো কিনে হোটেলে ফিরেছিলেন?

বেশ কিছু কেনাকাটাও করেছিলাম। ডক্টর মর্টিমার আমার সঙ্গে ছিলেন। ব্যারনেট হয়ে থাকতে গেলে সাজপোশাক সেইরকম হওয়া দরকার। পশ্চিমে অত হিসেব করে চলিনি। অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল বাদামি বুটজোড়া ছডলার দিয়ে কিনেছিলাম–পায়ে দেওয়ার আগেই চুরি হয়ে গেল এক পাটি।

শার্লক হোমস বললেন, চুরি করার মতো জিনিসই নয় এটা কোনো কাজেই লাগবে না। ডক্টর মর্টিমারের সঙ্গে আমিও একমত। শিগগিরই যথাস্থানে ফিরে আসবে নিখোঁজ বুটের পার্টি।

সংকল্প দৃঢ় স্বরে ব্যারনেট বললেন, জেন্টলমেন, আমি যেটুকু জানি, সবই বললাম। এবার আপনাদের কথা রাখুন। বলুন কী নিয়ে এত গোলমাল।

আপনার অনুরোধ খুবই যুক্তিযুক্ত, জবাব দিলেন হোমস। ডক্টর মর্টিমার, গল্পটা আমাদের যেভাবে শুনিয়েছিলেন, সেইভাবেই বললে একটা কাজের কাজ করবেন।

উৎসাহ পেয়ে পকেট থেকে পাণ্ডুলিপির তাড়া টেনে বার করলেন বৈজ্ঞানিকবন্ধু এবং গতকাল সকালে যেভাবে বলেছেন, সেইভাবেই নিবেদন করলেন সম্পূর্ণ কেসটা। অত্যন্ত তন্ময়ভাবে শুনলেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল মাঝে মাঝে কেবল চেঁচিয়ে উঠলেন বিস্ময়ে।

সুদীর্ঘ বিবৃতি সমাপ্ত হলে পর বললেন, উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু সম্পত্তি নয়, তার মানে একটা অভিশাপ আর প্রতিশোধও পেয়েছি দেখছি। ধাইমা-র ঘরে যখন থাকতাম, তখন থেকেই অবশ্য এই কুকুরের গল্প শুনেছি। পরিবারের প্রিয় কাহিনি। আমি কিন্তু খুব একটা পাত্তা দিইনি কোনোদিনই। কাকার মৃত্যুটা অবশ্য ব্যাপারটা এখনও ধোঁয়াটে আমার কাছে, মাথার মধ্যে যেন ফুটছে। কেসটি পুলিশের না পুরুতঠাকুরের সেইটাই ঠিক করা যাচ্ছে না।

খাঁটি বলেছেন।

তারপরেই ধরুন হোটেলে পাঠানো এই চিঠির ব্যাপারটা। বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

ডক্টর মর্টিমার বললেন, জলার কাণ্ডকারখানার খবরাখবর আমাদের চাইতে বেশি কেউ জানে, এই চিঠি পড়ে তা মনে হচ্ছে।

হোমস বললে, এবং সেই ব্যক্তি আপনার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয়–তাই বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি পাঠাচ্ছে।

অথবা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে।

তাও সম্ভব। ডক্টর মর্টিমার, আপনার কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এমন একটা সমস্যায় আমাকে টেনে এনেছেন যার অনেকগুলো কৌতূহলোদ্দীপক বিকল্প। কিন্তু একটা কার্যকর

বিষয় এখুনি ঠিক করতে হবে আমাদের। স্যার হেনরি, বিষয়টা এই বাস্কারভিল হলে আপনার এখন যাওয়াটা সমীচীন হবে কিনা।

কেন যাব না শুনি? বিপদটা কীসের বলে মনে হয় আপনার? ভয়টা কাকে? পারিবারিক শত্রু সেই শয়তানকে? না, মানুষকে?

সেইটাই তো বার করতে হবে।

বিপদ যে ধরনেরই হোক না কেন, আমার জবাবের নড়চড় হবে না। আমার বাপপিতামহের ভিটেয় যাওয়া রোধ করতে পারে, এমন শয়তান নরকে নেই, এমন মানুষও মর্তে নেই। মি. হোমস এই আমার শেষ জবাব। কথা বলতে বলতে কালচে লাল হয়ে গেল স্যার হেনরির মুখ, গ্রন্থিল হল কালো ভুরু। বেশ বোঝা গেল, বাস্কারভিল বংশের প্রচণ্ড মেজাজ শেষ বংশধরটির মধ্যেও লোপ পায়নি। বললেন, ইতিমধ্যে যা বললেন, তা নিয়ে ভাববার সময় আমার নেই। একবারেই সব বুঝে নিয়ে মন ঠিক করে ফেলাটা যেকোনো মানুষের কাছেই একটা বিরাট ব্যাপার। মনস্থির করতে আমাকে নির্জনে ঘণ্টাখানেক বসতে হবে। মি. হোমস, আপনার বন্ধুকে নিয়ে দুটো নাগাদ আসবেন? একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে? তখন আরও স্পষ্টভাবে বলতে পারব এ-ব্যাপারে আমার মনের অবস্থা।

তাহলে আসছি জানবেন।

গাড়ি ডেকে দেব?

আমি বরং হেঁটেই ফিরব। একটু চঞ্চল হয়েছি এ-ব্যাপারে।

ডক্টর মর্টিমার বললেন, আমিও সানন্দে হাঁটব আপনার সঙ্গে।

তাহলে ফের দুটোয় দেখা হবে। আসুন, সুপ্রভাত।

সাক্ষাৎপ্রার্থী দু-জনের পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, তারপরেই দড়াম করে বন্ধ হল সামনের দরজা। পরমুহূর্তে উধাও হল হোমসের অবসন্ন স্বপ্নাচ্ছন্নতা বিদ্যুৎ খেলে গেল হাতে পায়ে।

টুপি আর বুট পরে নাও, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি! একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। ড্রেসিং গাউন পরেই ঘর থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল হোমস, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল গায়ে ফ্রককোট চাপিয়ে। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে এসে পড়লাম। রাস্তায়। প্রায় দু-শশা গজ সামনে তখনও দেখা যাচ্ছে ডক্টর মর্টিমার আর বাস্কারভিলকে–চলেছেন অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে।

দৌড়ে গিয়ে দাঁড় করাব?

ভায়া ওয়াটসন, ও-কাজটি কোরো না। তোমার সঙ্গ পেয়েই আমি বিলক্ষণ সন্তুষ্ট–অবশ্য আমার সঙ্গ যদি পছন্দ হয় তোমার। আমাদের নতুন বন্ধু দু-জন দেখছি বুদ্ধিমান পুরুষ সকালটা সত্যিই অতি চমৎকার–হাঁটবার উপযুক্ত।

মাঝের ব্যবধান অর্ধেক কমিয়ে না-আনা পর্যন্ত দ্রুত পা চালাল হোমস। এক-শো গজ ব্যবধান বজায় রেখে পেছন পেছনে এলাম অক্সফোর্ড স্ট্রিটে, সেখান থেকে রিজেন্ট স্ট্রিটে। সামনের দুই একবার একটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে শো-কেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন, হুবহু তাই করল শার্লক হোমসও। পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল হৃষ্টকণ্ঠে। অনুসরণ করলাম ওর সাগ্রহ দৃষ্টি। দেখলাম, রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে একটা দু-চাকার ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে একজন পুরুষ আরোহী। আমি তাকাতে-না-তাকাতেই গাড়িটা আবার আস্তে আস্তে এগোল সামনের দিকে।

ওয়াটসন! ওয়াটসন! ওই সেই লোক! চলে এসো, আর কিছু না-পারি, চেহারাটা ভালো করে দেখে রাখি।

তৎক্ষণাৎ গাড়ির পাশের জানলা দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল অন্তর্ভেদী একজোড়া চক্ষু ঝোঁপের মতো কালো দাড়িতে আচ্ছন্ন একখানা মুখ। সঙ্গেসঙ্গে ছিটকে উঠে গেল গাড়ির ছাদের ঠেলে-তোলা দরজা–আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কী যেন বলা হল কোচোয়ানকে–অমনি রিজেন্ট স্ট্রিটের ওপর দিয়ে উন্মত্ত বেগে যেন উড়ে চলল গাড়িখানা। বিপুল আগ্রহে আর একটা ভাড়াটে গাড়ির আশায় আশপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল হোমস, কিন্তু কোনো গাড়িই চোখে পড়ল না। তখন পাগলের মতো ধেয়ে চলল ধাবমান গাড়ির পেছন পেছন গাড়িঘোড়ার

স্রোতের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু পাল্লা দেওয়া গেল না দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হল সামনের গাড়ি।

পালাল! যানবাহন বন্যার মধ্যে থেকে বিষম বিরক্তিতে নীরক্ত মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসে তিক্তকণ্ঠে বললে হোমস। এ-রকম যাচ্ছেতাই বরাত আর যাচ্ছেতাই কাজ কখনো দেখেছ? ওয়াটসন! ওয়াটসন! সততা বলে যদি কিছু থাকে তোমার মধ্যে, আমার সাফল্যের পাশে চরম এই ব্যর্থতার কাহিনিও লিখে রাখ হে!

লোকটা কে?

কিস্‌সু জানি না।

চর?

হতে পারে, শহরে পা দেওয়া ইস্তক ছায়ার মতো লোক ঘুরছে বাস্কারভিলের পেছন পেছন। তা না-হলে উনি নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে উঠবেন ঠিক করেছেন, এত তাড়াতাড়ি লোকটা জানল কী করে? প্রথম দিন যারা ছায়ার মতো পেছন পেছন ঘুরেছে, মনকে বোঝালাম দ্বিতীয় দিনেই নিশ্চয় তারা পেছন ছাড়বে না। ডক্টর মর্টিমার যখন কিংবদন্তি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, মনে থাকতে

পারে তোমার দু-বার জানলার সামনে দিয়ে ঘুরে এসেছিলাম।

হ্যাঁ মনে আছে।

রাস্তায় কেউ পায়চারি করছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ ছিল না। ওয়াটসন, যার সঙ্গে টক্কর লেগেছে আমাদের, সে কিন্তু মহা ধড়িবাজ। জল ক্রমশ গভীর হচ্ছে। আড়ালে থেকে যে আমাদের ওপর নজর রেখেছে, সে আমাদের ইষ্ট চায়, না, অনিষ্ট চায় এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে তার কাজকর্মের মধ্যে শক্তির চমক আর নিখুঁত পরিকল্পনার আভাস দেখেছি। বন্ধ দু-জন রাস্তায় পা দিতেই পেছন পেছন আমি নেমে এসেছিলাম ওঁদের অদৃশ্য সহচরকে দেখবার মতলবে। লোকটা এতই ধূর্ত যে নিজের পা জোড়ার ওপর ভরসা না-রেখে ভাড়াটে গাড়ির শরণ নিয়েছে, যাতে দরকার মতো পেছন পেছন যাওয়া যাবে, নয়তো পাশ দিয়ে বেগে বেরিয়ে যাওয়া যাবে–চোখ এড়িয়ে পালানো যাবে। ব্যবস্থাটার আর একটা সুবিধে ছিল। বন্ধু দু-জন যদি ভাড়াটে গাড়িতে চাপে, গাড়ির জন্যে আর ছুটোছুটি করতে হবে না–অনায়াসে যাবে পেছন পেছন। একটা অসুবিধে অবশ্য থেকে যাচ্ছে এ ব্যবস্থায়!

কোচোয়ানের অধীন থাকতে হচ্ছে।

ঠিক।

ইস, গাড়ির নাম্বারটা যদি লিখে নিতাম।

ভায়া ওয়াটসন, কাজটা খুবই খারাপ করেছি সন্দেহ নেই, তাই বলে, নম্বরটা দেখে রাখিনি, সত্যিই মনে কারো নাকি? নম্বরটা ২৭০৪। এই মুহূর্তে অবশ্য ও-নম্বর কোনো কাজে আসছে না।

এর বেশি আর কী করণীয় ছিল আমার মাথায় আসছে না।

গাড়িটা চোখে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে অন্যদিকে ফিরে হাঁটা উচিত ছিল। তাহলে ধীরেসুস্থে আর একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে বেশ খানিকটা তফাতে থেকে সামনের গাড়িকে ফলো করতে পারতাম, তার চাইতেও ভালো করতাম নরদামবারল্যান্ড হোটেলে গিয়ে যদি অপেক্ষা করতাম। অজ্ঞাত এই ব্যক্তি যখন বাস্কারভিলের পেছন ছাড়বে না বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবেই তখন ওর চালেই ওকে ধরতাম যেখানে চলেছে সেখানে গিয়েই ওত পেতে থাকতাম। কিন্তু অবিবেচকের মতো আগ্রহ দেখিয়ে ফেলে সব মাটি করেছি। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা আর উদ্যম দেখিয়ে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে প্রতিপক্ষ নিজেদের ধরা দিয়েছি, প্রতিপক্ষকে হারিয়েছি।

কথা বলতে বলতে অলসভাবে হাঁটছি রিজেন্ট স্ট্রিট বরাবর, সঙ্গীসহ ডক্টর মর্টিমার বহু আগেই অদৃশ্য হয়েছেন দৃষ্টিপথ থেকে।

হোমস বললে, ওঁদের পেছন পেছন গিয়ে লাভ নেই। ছায়া উধাও হয়েছে, আর ফিরবে না। দেখা যাক হাতে এবার কী তাস আসে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। গাড়ির ভেতরকার লোকটার মুখ কীরকম, হলফ করে বলতে পারবে?

শুধু দাড়িটার কথাই হলফ করে বলতে পারব।

আমারও সেই কথা–এই থেকেই ধরে নেব, দাড়িটা নিশ্চয় নকল। এ ধরনের সূক্ষ্ম কাজে ধড়িবাজরা যখন নামে, তখন দাড়ি জিনিসটা কোনো কাজেই আসে না চেহারা গোপন করা ছাড়া। এদিকে এসো, ওয়াটসন!

আঞ্চলিক বার্তাবাহকদের একটা অফিসে ঢুকে পড়েছে হোমস। ওকে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানায় ম্যানেজার।

উইলসন যে! ছোট্ট সেই কেসটার কথা এখনও ভোলোনি দেখছি। আমার কপাল ভালো, তাই তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম।

কিছুই ভুলিনি, স্যার। আমার সুনাম শুধু নয়, জীবনটাও রক্ষে করেছিলেন আপনি।

আরে ভায়া, বড্ড বাড়িয়ে বলছ। উইলসন, বন্ধুর মনে পড়ছে কার্টরাইট নামে একটা ছোকরা তোমার এখানে কাজ করত। গতবারের তদন্তে সে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছিল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এখনও কাজ করে এখানে।

ঘণ্টা বাজিয়ে একটু ডেকে পাঠাবে? ধন্যবাদ! পাঁচ পাউন্ডের এই নোটটা ভাঙিয়ে দিয়ো।

ম্যানেজারের তলব পেয়ে চোদ্দো বছরের এক কিশোর এসে দাঁড়াল সামনে। উজ্জ্বল, শানিত মুখ। সুবিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবরের দিকে চেয়ে রইল অপরিসীম শ্রদ্ধায়।

হোমস বললে, হোটেল ডিরেক্টরিটা দেখি। ধন্যবাদ। কার্টরাইট, তেইশটা হোটেলের নাম দেখছি এখানে–সবই শেরিংক্রসের ধারেকাছে। দেখেছ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

প্রত্যেকটা হোটেলে তুমি যাবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিয়েই আগে বাইরের দারোয়ানকে একটা শিলিং দেবে। এই নাও তেইশটা শিলিং।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলবে, গতকালের ছেড়া কাগজের ঝুড়িগুলো দেখতে চাই। বলবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রাম অন্য ঠিকানায় চলে গেছে–খুঁজে বার করতে হবে, বুঝেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আসলে কিন্তু খুঁজবে গতকালের টাইমস কাগজের মাঝের পাতা দেখবে কাঁচি দিয়ে কতকগুলো ফুটো করা রয়েছে কাগজের মাঝখানে। এই পাতাটা। দেখলেই চিনতে পারবে তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রত্যেক হোটেলেই বাইরের দারোয়ান হল ঘরের দারোয়ানকে ডেকে পাঠাবে, তাকেও একটা শিলিং দেবে। এই নাও তেইশটার মধ্যে খুব সম্ভব কুড়িটা হোটেলে শুনবে, গতকালের ছেড়া কাগজ ফেলে দেওয়া হয়েছে, অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বাকি তিনটে হোটেলে তাগাড় করা কাগজ দেখিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে টাইমস-এর এই পাতাখানা তার মধ্যে তুমি খুঁজবে। না-পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। জরুরি দরকারের জন্যে এই নাও আরও দশ শিলিং। সন্ধের আগেই বেকার স্ট্রিটে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবে কী পাওয়া গেল। ওয়াটসন, এবার একটা কাজই বাকি রইল। টেলিগ্রাম মারফত ২৭০৪ নম্বর ছ্যাকড়াগাড়ির কোচোয়ানকে শনাক্ত করতে হবে। তারপর বন্ড স্ট্রিট ললিতকলা প্রদর্শনীর ঘরে গিয়ে ছবি দেখব হোটেলে যাওয়ার সময় না-হওয়া পর্যন্ত।

তিনটে ছিন্নসূত্র

ইচ্ছে করলেই মনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ক্ষমতা অত্যন্ত আশ্চর্য মাত্রায় উপস্থিত ছিল শার্লক হোমসের মধ্যে। ঝাড়া দু-ঘণ্টা বেলজিয়ান শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে বেমালুম হারিয়ে ফেলল নিজেকে একেবারেই ভুলে গেল কী বিচিত্র ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি আমরা সবাই। ছবির জগৎ সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্থূল, কিন্তু প্রদর্শনীকক্ষ থেকে বেরিয়ে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে পৌঁছোনোর পথে ছবির আলোচনা ছাড়া আর কোনো কথার মধ্যেই গেল না।

হোটেলে যেতেই কেরানি বললে, ওপরতলায় স্যার হেনরি বাস্কারভিল অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। আপনারা এলেই ওপরে নিয়ে যেতে বলেছেন আমাকে।

হোমস বললে, রেজিস্টারে একটু চোখ বুলোলে আপত্তি আছে?

একদম না।

খাতার পাতায় দেখা গেল বাস্কারভিল হোটেলে ওঠার পর আরও দুটি নাম লেখা হয়েছে। একটা থিয়োফিলাস জনসন এবং তার পরিবার নিউক্যা থেকে এসেছেন; আরেকটা মিসেস ওল্ডমোর এবং তাঁর পরিচারিকা–অ্যালটনের হাইলজ থেকে এসেছেন।

দারোয়ানের সঙ্গে যেতে যেতে হোমস বললেন, জনসন ভদ্রলোককে চিনি। উকিল মানুষ, তাই না? মাথার চুল সব সাদা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন?

আজ্ঞে না, ইনি কয়লাখনির মালিক। খুব চটপটে। বয়স আপনার চেয়ে বেশি নয়।

জানছ কী করে উনি কী কাজ করেন? ভুল করছ মনে হচ্ছে?

আজ্ঞে না, এ হোটেলে উনি নতুন নন, অনেক বছর ধরে আসছেন। আমরা সবাই তাকে ভালোভাবেই জানি।

তাহলে তো মিটেই গেল। মিসেস ওল্ডমারের নামটাও যেন চেনা চেনা লাগছে। কৌতূহল দেখাচ্ছি বলে কিছু মনে কোরো না; তবে কী জানো, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেক সময়ে আরেক বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়।

উনি পঙ্গু। স্বামী এককালে গ্লসেস্টারের মেয়র ছিলেন। শহরে এলেই এখানে ওঠেন।

ধন্যবাদ; উনি যে আমার পরিচিত, আর তা বলা যাবে না। ওয়াটসন, প্রশ্নগুলো করে কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা খাড়া করে ফেললাম, পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময়ে খাটো গলায় বলল হোমস। আমাদের এই বন্ধুটিকে নিয়ে যাদের এত মাথাব্যথা, তারা কেউই এ-হোটেলে ওঠেনি সেটা জানা গেল। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই: স্যার

হেনরিকে ওরা চোখে চোখে রাখতে যেমন উদবিগ্ন, স্যার হেনরিও যাতে ওদের দেখে না-ফেলে, সে-ব্যাপারেও সমান উদবিগ্ন। ঘটনাটা কিন্তু অতিশয় সংকেতপূর্ণ।

কীসের সংকেত?

সংকেতটা–আরে, আরে, ভায়া, এ আবার কী কাণ্ড?

সিঁড়ির মাথায় আসতেই প্রায় মুখোমখি ধাক্কা খেলাম স্বয়ং স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, এক হাতে ধূলিধূসরিত পুরোনো একপাটি বুটজুতো ঝুলছে। এমনই উগ্রমূর্তি ধারণ করেছেন যে ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। কথা যখন ফুটল, সে-কথা বোঝে কার সাধ্য। এ-রকম পশ্চিমি টানে কথা বলতে সকালে তো শুনিনি।

চিৎকার করে বললেন, ভেবেছে কি ওরা? বাঁদরামি হচ্ছে আমার সঙ্গে? ভুল জায়গায় খাপ খুলতে এসেছে, ঠেলাটা টের পাইয়ে ছাড়ব বলে দিলাম। নিখোঁজ বুটের পাটি যদি ও-ছোঁড়া উদ্ধার করতে না-পারে তো ওর একদিন কি আমার একদিন। ফষ্টিনষ্টির একটা সীমা আছে, মি. হোমস, এ-হোটেল সে-মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

এখনও বুট খুঁজছেন?

খুঁজছি এবং খুঁজে বার করবই।

কিন্তু আপনি তো বলছিলেন বাদামি বুট হারিয়েছে?

সেটা তো গেছেই, এখন গেল একটা পুরোনো কালো বুট।

সে কী! আপনি কি তাহলে বলতে চান–?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাই। তিন জোড়া জুততার মালিক আমি–নতুন বাদামি, পুরোনো কালো, আর পেটেন্ট চামড়া–যা এখন পরে আছি। কাল রাতে সরিয়েছে একপাটি বাদামি, এখন সরাল একপাটি কালো। বুঝেছেন? কী হে? চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? হাঁ করে চেয়ে না-থেকে মুখে কথা বলতে কী হয়েছে?

অকুস্থলে আবির্ভূত হয়েছে জনৈক উত্তেজিত জার্মান ওয়েটার।

পেলাম না, স্যার, তন্নতন্ন করে খুঁজে এলাম সমস্ত হোটেল, কেউ কিছু বলতে পারছে না।

সূর্য ডোবার আগে যদি জুতো ফিরে না-পাই, সোজা ম্যানেজারের অফিসে যাব সেখান থেকে রাস্তায়–এ-হোটেলে আর নয়–এই বলে দিলাম।

পাওয়া যাবে স্যার, আমি বলছি পাওয়া যাবে। একটু ধৈর্য ধরুন, খুঁজে বার করবই।

যত্তোসব চোরেদের আড্ডা। জুতো চুরি বার করে দেব! মি. হোমস সামান্য এই ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিতে আমি—

আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা সামান্য নয় এবং কষ্টটুকু দিয়ে ভালোই করলেন।

তার মানে? আপনি দেখছি বিলক্ষণ সিরিয়াস?

জুতো চুরির কারণটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?

বোঝানোর চেষ্টাও করতে চাই না। এর চাইতে উদ্ভট, সৃষ্টিছাড়া পাগলামি জীবনে কখনো দেখিনি।

সৃষ্টিছাড়া তো বটেই, চিন্তিতস্বরে বললে হোমস।

আপনার কী মনে হয়?

আমিও যে সব বুঝে ফেলেছি, তা বলব না। স্যার হেনরি, আপনার এ-কেস অত্যন্ত জটিল। বিশেষ করে আপনার কাকার মৃত্যুর পটভূমিকায় যদি বিচার করতে হয় সৃষ্টিছাড়া এই সব ঘটনা, তাহলে ধরব, সারাজীবনে আমি যে শপাঁচেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেসের ফয়সালা করেছি তার কোনোটাই আপনার এই কেসের মতো প্যাচালো ছিল না।

তবে কী জানেন, অনেকগুলো সূত্র হাতে নিয়ে বসে আছি তো, একটা-না-একটা ধরে ঠিক পৌঁছে যাব মূল সত্যে। ভুল সূত্র ধরে হয়তো কিছুটা সময় নষ্ট করে ফেলতে পারি, কিন্তু আজ হোক কি কাল হোক–সঠিক সূত্র ধরে ফেলবই।

লাঞ্চ খেলাম তৃপ্তির সঙ্গে এবং মনোরম পরিবেশে। যে-ঝামেলায় জড়িয়ে একত্র হয়েছি, তা নিয়ে কথা হল খুবই কম। প্রাইভেট রুমে বসবার পর বাস্কারভিলকে হোমস জিজ্ঞেস করল কী করবেন বলে ঠিক করলেন তিনি।

বাস্কারভিল হলে যাব।

কবে?

এই সপ্তাহের শেষে?

মোটের ওপর সিদ্ধান্তটা বুদ্ধিমানের মতোই নিয়েছেন আপনি, বললেন হোমস। আপনার পেছনে লোক ঘুরছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমি পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ লোকে ঠাসা বিরাট এই শহরে যারা আপনার ওপর নজর রেখেছে, তাদের খুঁজে বার করা বা তাদের উদ্দেশ্যটা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার। উদ্দেশ্য যদি অশুভ হয়, আপনার অনিষ্ট করতে পারে আমরা তা আটকাতে পারব না। ডক্টর মর্টিমার, আজ সকালে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনার পেছনে লোক লেগেছিল জানেন কি?

ভীষণ চমকে উঠলেন ডক্টর মর্টিমার। লোক লেগেছিল! কে সে?

দুর্ভাগ্যবশত সেটা বলতে পারব না। ডার্টমুরে আপনার চেনাজানা প্রতিবেশীদের মধ্যে দাড়িওয়ালা কেউ আছে? মুখভরতি দাড়ি?

না–ইয়ে, দাঁড়ান–আরে, হ্যাঁ। স্যার চার্লসের খাসচাকর ব্যারিমুরেরই তো মুখভরতি কালো চাপদাড়ি আছে।

আচ্ছা! ব্যারিমুর এখন কোথায়?

বাস্কারভিল হলের দেখাশুনা করছে।

সত্যিই সে সেখানে আছে, না কি লন্ডনে এসেছে, তা জানতে হবে।

কী করে জানবেন?

একটা টেলিগ্রাম ফর্ম দিন। স্যার হেনরির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ? ওতেই হবে। ঠিকানা লিখুন, ব্যারিমুর, বাস্কারভিল হল। সবচেয়ে কাছের টেলিগ্রাফ অফিস কোনটা? গ্রিমপেন। ঠিক আছে, গ্রিমপেনের পোস্টমাস্টারকে আর একখানা টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি : মি. ব্যারিমুরের টেলিগ্রাম তার হাতে দেবেন। বাড়িতে না-পেলে, নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে স্যার হেনরি

বাস্কারভিলের কাছে ফেরত পাঠাবেন! সন্ধের আগেই জানতে পারব ব্যারিমুর ডেভনশায়ারে আছে কি নেই।

বাস্কারভিল বললেন, তা তো হল। কিন্তু এই ব্যারিমুরটি কে, ডক্টর মর্টিমার?

আগের কেয়ারটেকারের ছেলে–সে-লোকটি মারা গেছে। চার পুরুষ ধরে বাস্কারভিল হল দেখাশুনা করছে এরা। যদূর জানি, ওরা স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই সজ্জন–গাঁয়ের প্রত্যেকে যথেষ্ট সম্মান দেয়।

বাস্কারভিল বললেন, এটাও ঠিক যে বাস্কারভিল হলে ফ্যামিলির কেউ যদ্দিন না-থাকছে, তদ্দিন এদের পোয়াবারো। কিছু না-করেই চমৎকার প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি দিব্যি ভোগ করতে পারছে।

তা ঠিক।

স্যার চার্লসের উইলে ব্যারিমুর কিছু পেয়েছে? শুধোয় হোমস।

স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই পাঁচশো পাউন্ড করে পেয়েছে।

আচ্ছা! ওরা কি জানে টাকা পাচ্ছে?

হ্যাঁ, জানে। উইলে কাকে কী দিয়েছেন, তাই নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন স্যার চার্লস।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

ডক্টর মর্টিমার বললেন, স্যার চার্লস ইচ্ছাপত্রে যাদের টাকা দিয়ে গেছেন, আশা করি তাদের সবাইকে সন্দেহ করবেন না। কেননা, উনি আমাকেও হাজার পাউন্ড দিয়ে গেছেন।

বটে! আর কেউ?

সামান্য অঙ্কের টাকা অনেককে দিয়েছেন–দাঁতব্য প্রতিষ্ঠানেও অনেক দান করেছেন। বাদবাকি সমস্ত পাবেন স্যার হেনরি।

বাদবাকি টাকার অঙ্কটা কী?

সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউন্ড।

বিস্ময়ে ভুরু তুলে ফেলল শার্লক হোমস। বলল, এইরকম টাকার পাহাড় এ-কেসে জড়িয়ে রয়েছে ভাবিনি।

স্যার চার্লস বড়োলোক, সবাই তা জানত। কিন্তু কতখানি বড়োলোক, তা তাঁর মৃত্যুর পর দলিল দস্তাবেজ দেখতে গিয়ে জানলাম। জমিদারির মোট মূল্য প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড।

বলেন কী! এ-টাকার জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিয়ে মরণ-বাঁচন খেলা শুরু করা যায় বই কী। আর একটা প্রশ্ন, ডক্টর মর্টিমার। ধরুন, আমাদের এই তরুণ বন্ধুটির কিছু একটা হয়ে গেল অনুমিতিটা অস্বস্তিকর, ক্ষমা করবেন!–সেক্ষেত্রে জমিদারি পাবে কে?

যেহেতু স্যার চার্লসের ছোটো ভাই রোজার বাস্কারভিল বিয়ে না-করে মারা গেছেন, জমিদারি পাবে দূর সম্পর্কের তুতো ভাই ডেসমন্ডরা। জেমস ডেসমন্ডের বয়স হয়েছে, পুরুতগিরি করেন ওয়েস্টমুরল্যান্ডে।

ধন্যবাদ। খবরগুলো সত্যিই কৌতূহল জাগায়। মি. জেমস ডেসমন্ডের সঙ্গে কখনো আলাপ হয়েছে আপনার?

হয়েছে, স্যার চার্লসের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলেন তখন। সৌম্যদর্শন পুরুষ, থাকেন সন্ন্যাসীর মতন। বেশ মনে আছে, স্যার চার্লস নিজে থেকেই পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও উনি এক কপর্দকও নিতে রাজি হননি।

এইরকম সরল লোক স্যার চার্লসের লাখ লাখ টাকা পাবে?

স্যার চার্লসের জমিদারিটাই পাবে–উইলে সেইরকমই লেখা আছে। বর্তমান ওয়ারিশ অন্য উইল না-করলে টাকাও তিনি পাবেন। স্যার হেনরি যা ভালো মনে করেন, তাই করবেন।

স্যার হেনরি, উইল করেছেন আপনি?

না, মি. হোমস এখনও করিনি। সময় পেলাম কখন? গতকাল তো জানলাম জল কদ্দূর গড়িয়েছে। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, উপাধি আর জমিদারির সঙ্গে টাকাও যাবে একসঙ্গে। কাকা বেচারার ইচ্ছে ছিল সেইরকমই। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকাই যদি না-থাকে, বাস্কারভিল বংশের গৌরব কি ফিরিয়ে আনতে পারবে জমিদারির মালিক? বাড়ি, জমি, টাকা যাবে একসাথে।

ঠিক বলেছেন। স্যার হেনরি, আপনার মতো আমিও বলি আর দেরি না-করে ডেভনশায়ারে যাওয়া দরকার। শুধু একটা শর্ত আছে আমার। একলা যাবেন না কখনোই না।

ডক্টর মর্টিমার আসছেন আমার সঙ্গে।

ডক্টর মর্টিমারকে রুগি দেখতে বেরোতে হয়, ওঁর বাড়িও আপনার বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। শত ইচ্ছে থাকলেও আপনার পাশে উনি দাঁড়াতে পারবেন না। না,

না, স্যার হেনরি, আপনি আর কাউকে সঙ্গে নিন, খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া চাই, যে আপনার পাশে পাশে থাকতে পারে।

আপনি নিজে এলে হয় না, মি. হোমস?

সে-রকম সংকট দেখা দিলে, আমি সশরীরে হাজির হতে চেষ্টা করব। কিন্তু নানা দিক থেকে ডাক আসে আমার, কনসাল্টিং প্র্যাকটিস ছড়িয়েছে অনেকদ্দূর, অনির্দিষ্টকাল লন্ডনের বাইরে থাকা আমার পক্ষে তাই সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে ধরুন ইংলন্ডের এক পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে দোহন করার চেষ্টা করছে এক ব্ল্যাকমেলার–আমি উঠে পড়ে না-লাগলে কেলেঙ্কারি ঠেকানো যাবে না। দেখতেই পাচ্ছেন ডার্টমুরে যাওয়া কতখানি অসম্ভব আমার পক্ষে।

তাহলে কাউকে সুপারিশ করছেন?

আমার বাহুতে হাত রাখল হোমস।

আমার এই বন্ধুটি যদি রাজি হয়, তাহলে জানবেন দুরবস্থায় যখন পড়বেন আপনার পাশে দাঁড়ানোর মতন এঁর চাইতে যোগ্য লোক আর নেই। এত জোর দিয়ে আমার চাইতে এ-কথা আর কেউ বলতে পারবে না।

ডক্টর ওয়াটসন, আপনার অশেষ অনুগ্রহ, বললেন স্যার হেনরি। আমার অবস্থা তো আপনি দেখছেনই, এ-ব্যাপারে আমি যা জানি আপনিও তাই জানেন। বাস্কারভিল হলে এসে আমার সঙ্গে থেকে শেষটা যদি দেখে যান, জীবনে আপনার উপকার ভুলব না।

অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে চিরকালই উশখুশ করে উঠি, তার ওপরে হোমসের অভিনন্দন আর ব্যারনেটের সাগ্রহ আমন্ত্রণ।

বললাম, সানন্দে আসব আপনার সঙ্গে। সময়টাকে কাজে লাগানোর পক্ষে এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর হয় না।

হোমস বলল, আমাকে কিন্তু রিপোর্ট পাঠাবে বেশ দেখেশুনে। সংকট আসবেই, এলে কী করতে হবে, আমি তোমায় জানিয়ে দেব। আশা করি শনিবারেই সব ঠিক হয়ে যাবে?

ডক্টর ওয়াটসন, অসুবিধে হবে না তো?

মোটেই না।

তাহলে ওই কথাই রইল। মাঝখানে যদি উলটো কথা না-শোনেন, তাহলে শনিবার সাড়ে দশটার ট্রেনে রওনা হব প্যাডিংটন থেকে।

যাবার জন্যে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি বিজয়োল্লাসে চিৎকার করে উঠে স্যার হেনরি ধেয়ে গেলেন ঘরের কোণে এবং একটা ক্যাবিনেটের তলা থেকে টেনে বার করলেন একপাটি বাদামি বুট।

বললেন সোল্লাসে, আমার হারানো বুট।

শার্লক হোমস বললে, এইভাবেই যেন অনায়াসে মিলিয়ে যায় আমাদের সব অসুবিধে।

ডক্টর মর্টিমার মন্তব্য করলেন, কিন্তু এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। লাঞ্চ খাওয়ার আগে আমি নিজে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি ঘরটা!

আমিও খুঁজেছি, বললেন বাস্কারভিল। এক ইঞ্চিও বাদ দিইনি।

তখন তো বুট ছিল না ওখানে।

তাহলে আমরা যখন লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত, ওয়েটার তখন রেখে গেছে।

ডেকে আনা হল জার্মান ওয়েটারকে। সে কিন্তু দিব্যি গেলে বললে, এ-ব্যাপারে কিছুই সে জানে না। বিস্তর খোঁজখবর নিয়েও রহস্য পরিষ্কার হল না। এইভাবেই রহস্য-সিরিজে যুক্ত হল আরও একটা রহস্য। প্রত্যেকটা রহস্যই ছোটো, বাহ্যত উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু তাদের আবির্ভাব ঘটছে বিরামবিহীনভাবে এবং দ্রুতবেগে। স্যার চার্লসের মৃত্যুর

করালকাহিনি ছাড়াও গত দু-দিনের মধ্যে লাইন দিয়ে এসেছে একটার পর একটা অব্যাখ্যাত ঘটনা। এর মধ্যে আছে ছাপা কাগজ সাঁটা আজব চিঠি, দু-চাকার ঘোড়ার গাড়িতে কালো দাড়িওলা রহস্যময় চর, নতুন বাদামি বুটের অন্তর্ধান, পুরোনো কালো বুটের অন্তর্ধান, এবং এখন নতুন বাদামি বুটের বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন। বেকার স্ট্রিটে ফেরার পথে ছ্যাকড়াগাড়ির কোণে নীরবে বসে রইল হোমস। কুঞ্চন আর শানিত মুখচ্ছবি দেখেই বুঝলাম, আমার মতো সে-ও মনে মনে এইসব অদ্ভুত আর বাহ্যত সম্পর্কহীন ঘটনাগুলোকে এক মালায় গেঁথে একটা ফ্রেমের মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে। সমস্ত বিকেলটা আর সন্ধেটা তামাক আর চিন্তা নিয়ে এইভাবে ব্যাপৃত রইল সে।

ডিনার খাওয়ার ঠিক আগে এল দুটো টেলিগ্রাম। প্রথমটা এইরকম :-

এইমাত্র খবর পেলাম ব্যারিমুর বাস্কারভিল হলে আছে। বাস্কারভিল।

দ্বিতীয়টা :-

নির্দেশমতো তেইশটা হোটেল ঘুরেছি। কিন্তু টাইমস-এর কাটা কাগজ পাইনি।- কার্টরাইট।

দুটো সুতো ছিঁড়ল, ওয়াটসন। যে-কেসে কেবলই ব্যর্থতা, সে-কেসের মতো চনমনে কেস আর নেই-ভেতর পর্যন্ত চাঙা করে দেয়। চারদিকে তাকিয়ে থাকতে হয় নতুন সূত্রের আশায়।

যার গাড়িতে চর লেগেছিল পেছনে, এখনও সেই কোচোয়ানের খবর কিন্তু পাওনি।

তা ঠিক। সরকারি রেজিস্ট্রিতে তার নাম-ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি। জবাবটা বোধ হয় এসে গেল মনে হচ্ছে।

জবাবের চাইতেও সন্তোষজনক যে একটা কিছু এসেছে, দরজার ঘন্টাধ্বনি শুনেই তা মালুম হল। দু-হাট হয়ে গেল দরজা, রুক্ষ চেহারার একটা লোক ঢুকল ভেতরে নিঃসন্দেহে কোচোয়ান স্বয়ং।

বললে, হেডঅফিসে খবর পেলাম এই ঠিকানার এক ভদ্রলোক ২৭০৪ নম্বর গাড়ি সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন। সাত বছর গাড়ি চালাচ্ছি, আজ পর্যন্ত কেউ নালিশ করেনি। তাই সোজা ইয়ার্ড থেকে আসছি। যা বলতে চান, সামনাসামনি বলুন মশায়।

হোমস বললে, ওহে, তোমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশই নেই আমার। ঠিক উলটোটাই বরং আছে। আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব যদি দাও, আধ গিনি বকশিশ পাবে।

কাষ্ঠ হেসে কোচোয়ান বললে, দিনটা দেখছি ভালোই যাচ্ছে, ভুলচুক করিনি। বলুন স্যার, কী জানতে চান?

যদি পরে দরকার হয়, তাই প্রথমে জানতে চাই নাম কী তোমার, থাকো কোথায়?

জন ক্লেটন, তিন নম্বর, টার্পে স্ট্রিট, দ্য বরো। আমার গাড়ি থাকে ওয়াটারলু স্টেশনের কাছে শিপলির গাড়ির আড্ডায়।

লিখে নিল শার্লক হোমস।

ক্লেটন, এবার বলো আজ সকাল দশটায় তোমার গাড়িতে এসে যে এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল–কী জানেনা তার সম্পর্কে। এখান থেকে দু-জন ভদ্রলোক বেরিয়ে রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে গাড়ি নিয়ে তাদের পেছন পেছনও গেছিলে?

অবাক চোখে তাকাল ক্লেটন, ভাব দেখে মনে হল যেন বেশ বিব্রত বোধ করছে।

বললে, আপনি যখন সবই জেনে বসে আছেন, তখন না-বলার কোনো কারণ দেখি না। আসলে কী হয়েছিল জানেন, ভদ্রলোক আমাকে বললেন তিনি একজন ডিটেকটিভ এবং তাঁর সম্বন্ধে যেন কাউকে কিছু না-বলি।

ওহে, ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমার কাছে একটা কথাও যদি গোপন করতে যাও তো ঝামেলায় পড়বে। তোমাকে বললেন, উনি একজন ডিটেকটিভ?

হ্যাঁ, তাই বললেন।

কখন বললেন?

চলে যাওয়ার সময়ে!

আর কিছু বললেন?

নিজের নামটা বলে গেলেন।

বিজয়-উল্লসিত চোখে আমার পানে চকিত চাহনি নিক্ষেপ করে হোমস।

তাই নাকি? নিজের নাম বলে গেলেন? ভারি অবিবেচক লোক দেখছি। কী নাম বললেন শুনি?

শার্লক হোমস।

কোচোয়ানের এহেন জবাবে বন্ধুবর যেভাবে চমকে উঠল, এভাবে কখনো তাকে চমকাতে দেখিনি। নীরব বিস্ময়ে বসে রইল ক্ষণকাল। তারপরেই ফেটে পড়ল প্রাণখোলা অট্টহাসিতে:

বাহাদুর বটে ওয়াটসন, শেষ তাসখানা কীরকম ছেড়েছে দেখলে? সত্যিই বাহাদুর, স্বীকার করতেই হবে। আমারই মতো চটপটে। এবার কিন্তু বেশ একহাত নিয়েছে আমাকে। যাক, ভদ্রলোকের নামটা তাহলে শার্লক হোমস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চমৎকার! কোত্থেকে তাঁকে গাড়িতে তুললে, তারপর কী কী হল–সব বলে যাও।

সাড়ে নটার সময়ে ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমাকে ডাক দিলেন। বললেন, আমি একজন ডিটেকটিভ। দুটো গিনি দেব। সারাদিন যা-যা বলবেন, তাই করতে হবে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। খুশি হয়ে রাজি হলাম। প্রথমেই এলাম নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে। দুই ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আড্ডা থেকে একটা গাড়ি না-নেওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর চললাম পেছন পেছন, সামনের গাড়ি এসে দাঁড়াল এইখানে কোথায় যেন।

এই বাড়িরই দরজার সামনে বললে হোমস।

সঠিক বলতে পারব না। তবে আমার গাড়িতে যিনি উঠেছিলেন, তিনি সবই জানতেন। এই রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরে ভদ্রলোক দু-জন বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলেন। বেকার স্ট্রিট বরাবর আমরাও চললাম পেছন পেছন, তারপর–

জানি, বলল হোমস।

রিজেন্ট স্ট্রিটের তিনভাগ রাস্তা পেরোনোর পর ডিটেকটিভ ভদ্রলোক আচমকা ঠেলা-দরজা তুলে চিৎকার করে আমাকে ঝড়ের মতো ওয়াটারলু স্টেশনে যেতে বললেন। চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেলাম দশ মিনিটেই। উনি তখন সত্যিকারের ভদ্রলোকের মতোই দুটো গিনি আমাকে দিয়ে স্টেশনের মধ্যে ঢুকলেন। ঢোকবার ঠিক আগে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন–কাকে নিয়ে এতক্ষণ চক্কর দিলে জানা থাকলে তোমার ভালো লাগতে পারে। আমার নাম শার্লক হোমস। নামটা তখনই জানলাম।

বটে! তারপর আর দেখা হয়নি?

স্টেশনে ঢুকে যাওয়ার পর আর দেখিনি। শার্লক হোমসকে দেখতে কীরকম?

মাথা চুলকোলো কোচোয়ান। দেখুন স্যার, ভদ্রলোকের চেহারাটা আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মত খুঁটিয়ে বলার নয়। বয়স বছর চল্লিশ, উচ্চতা মাঝামাঝি–আপনার চাইতে দু-তিন ইঞ্চি বেঁটে। ফিটফাট বাবু, ফ্যাকাশে মুখ, চৌকোনা কালো দাড়ি। এর বেশি কিছু দেখিনি।

চোখের রং?

বলতে পারব না।

আর কিচ্ছু মনে পড়ছে না?

না স্যার, কিচ্ছু না।

তাহলে এই নাও আধগিনি। আরও খবর যদি দিতে পারো আর একখানা আধগিনি তোলা রইল তোমার জন্যে। শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি। ধন্যবাদ, স্যার!

নীরস হাসি হাসতে হাসতে বিদেয় হল জন ক্লেটন। ক্ষোভের হাসি হেসে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস তাকাল আমার পানে।

বলল, তৃতীয় সুতোটাও ছিঁড়ে গেল, ওয়াটসন। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, শেষ-ও করলাম সেইখানে। কী ধড়িবাজ বদমাশ দেখেছ? আমার ঠিকানা সে জানত, স্যার হেনরি বাস্কারভিল যে আমার পরামর্শ নিচ্ছেন–সে-খবরও রাখত, রিজেন্ট স্ট্রিটে দেখেই আমাকে চিনেছে, গাড়ির নম্বর যখন আমি দেখেছি তখন শেষ পর্যন্ত কোচোয়ানকে পাকড়াও করে ফেলব হিসেব করে নিয়েই উদ্ধত এই সংবাদটি পাঠিয়েছে তার মুখে! ওয়াটসন, আমাদের এবারকার শত্রুটি কিন্তু খাঁটি ইস্পাত–আমাদের মতোই। লন্ডনে

কিস্তিমাত করে গেল সে–গগাহারান হারলাম আমি। ডেভনশায়ারে কপাল ফিরবে আশা রাখি। কিন্তু মনটাকে সহজ করতে পারছি না।

কী ব্যাপারে?

তোমাকে পাঠানোর ব্যাপারে। কেসটা কুৎসিত, ওয়াটসন, অত্যন্ত বিপজ্জনক, অত্যন্ত জঘন্য। এ-কেসের যতই দেখছি, ততই উদবেগ বাড়ছে। ভায়া, হাসছ তুমি। হেসে নাও। কিন্তু আমি হাসব তখনই যখন তুমি নির্বিঘ্নে নিরাপদে আবার ফিরে আসবে বেকার স্ট্রিটে।

বাস্কারভিল হল

নির্দিষ্ট দিনে তৈরি হয়ে গেলেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল এবং ডক্টর মর্টিমার, এবং ডেভনশায়ার

অভিমুখে রওনা হলাম আমরা। স্টেশন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একই গাড়িতে গেল শার্লক। হোমস এবং শেষবারের মতো নির্দেশ আর উপদেশ দিলে আমাকে।

বলে, ওয়াটসন, আগে থেকেই কাউকে সন্দেহ করে বসে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে যাও, এটা আমি চাই না। তাই কোনো অনুমিতি তোমাকে শোনাব না–কাকে সন্দেহ বেশি, তাও বলব , যদূর সম্ভব খুঁটিয়ে সমস্ত ঘটনা লিখে জানাবে, থিয়োরি-টিয়োরি যা কিছু খাড়া করবার, আমি করব।

কী ধরনের ঘটনা লিখব? জিজ্ঞেস করলাম।

স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত যেকোনো তাজা খবর, অথবা হাতের দুই কেসে কাজে লাগতে পারে এমনি যেকোনো ঘটনা–তা সে যত পরোক্ষই হোক না কেন, বিশেষ করে তরুণ বাস্কারভিল আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে সেই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ। গত ক-দিনে আমি নিজেই কিছু তদন্ত করেছি বটে, কিন্তু ফলাফলটা নেতিবাচক হয়েছে। একটা জিনিস কিন্তু নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছে। পরবর্তী

ওয়ারিশ মি. জেমস ডেসমন্ডের কথা বলছি। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে এবং চেহারা চরিত্র অত্যন্ত অমায়িক! সুতরাং এ-জাতীয় নিগ্রহ বা নির্যাতন তার দিক থেকে আশা করা যায় না। আমার কিন্তু সত্যিই মনে হয়, অনায়াসেই তাঁকে হিসেব থেকে বাদ দিতে পারি আমরা। তাহলে থেকে যাচ্ছে তাঁরাই যারা প্রকৃতপক্ষে জলাভূমিতে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে ঘিরে থাকছে।

প্রথমেই এই ব্যারিমুর দম্পতিকে হিসেব থেকে বাদ দিলে ভালো হয় না?

কোনোমতেই না। এর চাইতে বড়ো ভুল আর নেই। নিরপরাধ যদি হয়, নিষ্ঠুর অবিচার হবে ঠিকই, কিন্তু অপরাধী যদি হয়, ঘুণাক্ষরেও তারা যেন টের না-পায় তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে। না হে না, সন্দেহভাজনের ফর্দে এদের নামও থাকবে। তারপর ধরো, যদূর মনে পড়ে, বাস্কারভিল হলে একজন সহিস আছে। দু-জন জলাভূমির চাষি আছে। বন্ধু ডক্টর মর্টিমার রয়েছেন–ওঁকে আমি খাঁটি সচ্চরিত্র বলেই বিশ্বাস করি, ওঁর স্ত্রী রয়েছেন যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। প্রকৃতিবিদ স্টেপলটন রয়েছেন, এবং তার বোন রয়েছেন, শুনেছি ভদ্রমহিলা নাকি তরুণী এবং সুন্দরী। তারপরেও রয়েছেন ল্যাফটার হলের মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড তিনিও একটা অজানা বিষয়, এ ছাড়াও দু-একজন অন্য প্রতিবেশী। এদেরকে নিয়েই তোমার বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে।

যথা সম্ভব করব আমি।

অস্ত্র নিয়েছ আশা করি?

হ্যাঁ, নেওয়াটা উচিত মনে করেই নিয়েছি।

নিশ্চয়, ঠিকই করেছ। অষ্টপ্রহর কাছে রাখবে রিভলবার দিনে রাতে সবসময়ে হুঁশিয়ার থাকবে–মুহূর্তের জন্যেও ঢিলে দেবে না।

নতুন বন্ধু দু-জন এর মধ্যেই একটা প্রথম শ্রেণির কামরা জোগাড় করে নিয়েছেন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের প্রতীক্ষায়।

হোমসের প্রশ্নের জবাবে ডক্টর মর্টিমার বললেন–না, নতুন খবর নেই। একটা কথাই শপথ করে বলতে পারি এবং তা হল গত দু-দিনে কেউ আমাদের পেছনে ঘোরেনি। বাইরে বেরিয়েছি, কিন্তু সবসময়ে কড়া নজর রেখেছি চারপাশে, কেউ চোখ এড়ায়নি।

দু-জনে কখনো ছাড়াছাড়ি হননি তো?

গতকাল বিকেল ছাড়া আর হইনি। শহরে এলে সাধারণত একটা দিন নির্ভেজাল আমোদ-প্রমোদ নিয়েই কাটাই। তাই গিয়েছিলাম কলেজ অফ সার্জন্স-এর মিউজিয়ামে।

বাস্কারভিল বললেন, আর আমি গিয়েছিলাম পার্কের লোকজন দেখতে। কিন্তু গোলমাল কিছু ঘটেনি।

তাহলেও অত্যন্ত অবিবেচকের মতো কাজ করেছেন, মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে হোমস। স্যার হেনরি, আমার একান্ত অনুরোধ, একলা কখনো রাস্তায় বেরোবেন না। যদি বেরোন, সাংঘাতিক দুর্বিপাকে পড়বেন। অন্য বুটের পাটিটা পেয়েছেন?

না, মশায়, ওটা দেখছি একেবারেই গেল।

বটে। সেইটাই অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ঠিক আছে, বিদায়, ট্রেন তখন নড়ে উঠেছে, প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। স্যার হেনরি, ডক্টর মর্টিমার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে যে কিংবদন্তিটা পড়ে শুনিয়েছেন, তার একটা কথা সবসময়ে মনে রাখবেন। সন্ধের পর যখন অশুভ শক্তির নরক গুলজার চলে জলাভূমিতে, তখন ও-তল্লাট মাড়াবেন না।

অনেক পেছনে প্ল্যাটফর্ম ফেলে আসার পর ফিরে দেখলাম আমাদের পানে স্থির চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শার্লক হোমসের দীর্ঘ, সাদাসিধে, কঠোর, নিস্পন্দ মূর্তি।

দ্রুত ছুটে চলল ট্রেন। বেশ ভালোই লাগছে ছুটন্ত ট্রেনে বসে থাকতে। দুই বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়িয়ে নিলাম নানা কথার মাধ্যমে। খেলা করতে লাগলাম ডক্টর মর্টিমারের স্প্যানিয়েলের সঙ্গে। এইভাবেই হুহু করে কেটে গেল সময় ঘন্টা কয়েকের মধ্যে। মাটির রং বাদামি থেকে লালচে হয়ে গেল, ইট থেকে গ্রানাইটে এসে পড়লাম, সুবিন্যস্ত ঝোপ দিয়ে ঘেরা উজ্জ্বল সবুজ ঘাস ছাওয়া মাঠে লাল রঙের গোরু চরতে দেখলাম, গাছপালার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেখেই বুঝলাম চমৎকার আবহাওয়া আসছে–যদিও আদ্রর্তার ভাগ

একটু বেশি। চোখ বড়ো বড়ো করে সাগ্রহে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন তরুণ বাস্কারভিল এবং ডেভনের পরিচিত নৈসর্গিক দৃশ্য চিনতে পেরে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন জোর গলায়!

বললেন, ডক্টর ওয়াটসন, এ-জায়গা ছেড়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর অনেক জায়গাই আমি দেখেছি, কিন্তু এমনটি কোথাও দেখিনি। তুলনা হয় না?

আমি মন্তব্য করলাম, ডেভনশায়ারের লোকেরা কিন্তু শপথ নেয় নিজেদের জেলার নামে ব্যতিক্রম আজও চোখে পড়েনি।

সেটা শুধু জেলা নয়, নির্ভর করে মানুষগুলোর শিক্ষাদীক্ষা রক্তের ওপরেও, বললেন ডক্টর মর্টিমার। এই যে আমাদের এই বন্ধুটি, মাথাটি দেখুন, পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন আর্যজাতি কেল্টদের মাথার মতোই গোল; তাদের সেই উৎসাহ আর স্বদেশপ্রীতি এঁর খুলির মধ্যেও রয়েছে। স্যার চার্লস বেচারার মাথাটি ছিল সত্যিই অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অর্ধেকটা স্কটল্যান্ডের পার্বত্য জাতি গেলদের মতে, বাকি অর্ধেক আইভারমিয়ান। কিন্তু আপনি যখন বাস্কারভিল দেখেছিলেন, তখন নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলেন নয় কি?

বাবা যখন মারা যান, আমি তখন কিশোর। তারপর থেকে বাস্কারভিল আর চোখে দেখিনি। কেননা বাবা থাকতেন দক্ষিণ উপকূলে একটা ছোটো কুঁড়েঘরে। সেখান থেকে সোজা গেলাম আমেরিকায় এক বন্ধুর কাছে। তাই বলছি, ডক্টর ওয়াটসনের চোখে সব

যেমন নতুন লাগছে, আমার চোখেও তাই লাগছে। জলাভূমির চেহারা দেখবার জন্যেও জানবেন প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছে।

করছে নাকি? তাহলে পূর্ণ হোক আপনার মনোবাসনা, ওই দেখুন জলাভূমি, কামরার জানলা দিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন ডক্টর মর্টিমার।

চৌকোনা সবুজ মাঠ আর গাছপালার নীচু বক্ররেখার ওপর দিয়ে দেখা গেল বহু দূরে ঠেলে উঠেছে ধূসর, বিষণ্ণ একটা পাহাড়, চুড়োটা অদ্ভুত রকমের এবড়োখেবড়ো খোঁচা-খোঁচা, অনেক দূরে থাকায় তা আবছা আর মায়াময়–ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা ফ্যানট্যাসটিক নিসর্গ দৃশ্য! দীর্ঘক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চুপ দেহে বসে রইলেন বাস্কারভিল, স্থির দুই চক্ষু নিবদ্ধ রইল সেই দুঃস্বপ্ন দৃশ্যের পানে–সাগ্রহ মুখ দেখেই উপলব্ধি করলাম কী ধরনের ভাবের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে তার মনের মধ্যে; এই প্রথম তিনি দেখছেন রহস্যমদির সেই জলাভূমির দৃশ্য; প্রহেলিকাময় এই জলার বুকে যারা যুগ যুগ ধরে শাসনের দণ্ড ঘুরিয়েছে তাদেরই রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই আদি পুরুষদের সুগভীর ছাপ রয়েছে এখানকার আকাশে বাতাসে মাটিতে। কাঠখোট্টা রেলকামরার এক কোণে টুইডস্যুট পরে ওই দিন যিনি আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলেছেন, তার মলিন আর ভাবব্যঞ্জক মুখে পরতে পরতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই পূর্বপুরুষদের প্রচণ্ড চরিত্রের ব্যঞ্জনা, দেখতে পাচ্ছি খানদানি রক্তের উচ্ছ্বাস। উপর্যুক্ত বংশধরই বটে। হেজেলগাছের মতো পিঙ্গলবর্ণ বিশাল দুই চোখে অনুভূতিপ্রবণ স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে, ঘন ভুরু যুগলে আদিমপুরুষদের দর্প শৌর্য এবং শক্তি যেন উচ্ছরিত হচ্ছে। নিষিদ্ধ ওই জলা সত্যিই যদি বিপদসংকুল, দুঃসাধ্য তদন্ত পথ চেয়ে থাকে আমাদের প্রতীক্ষায়, এইরকম

একজন কমরেডের জন্যে তার সম্মুখীন হতে দ্বিধা নেই আমার—কেননা সে-বিপদকে বুক পেতে নেওয়ার মতো দুঃসাহস এঁর আছে।

ছোট্ট একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল ট্রেন, নেমে পড়লাম আমরা সকলে। বাইরে, সাদা, নীচু বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে একজোড়া বলবান টাট্টু ঘোড়ায় টানা একটা খোলা গাড়ি। আমরা এসেছি, এটাই যেন একটা বিরাট ব্যাপার এ-অঞ্চলে। কেননা, স্টেশনমাস্টার নিজে দাঁড়িয়ে নামিয়ে দিলেন আমাদের মালপত্র। সাদাসিধে, সুস্নিগ্ধ এ-পল্লি অঞ্চলে একটু অবাক হলাম দু-জন বন্দুকধারী লোক দেখে। পরনে সিপাইদের মতো গাঢ় রঙের ইউনিফর্ম, ফটকের সামনে খাটো রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দু-জনে। আমরা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তীক্ষ্ণ, সন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কোচোয়ান লোকটার মুখখানা শক্ত, গাঁটযুক্ত খর্বকায় চেহারা। স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে দেখেই খটাস করে সেলাম ঠুকল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চওড়া সাদা রাস্তা বেয়ে যেন উড়ে চললাম আমরা। দু-পাশে টানা লম্বা পশুচারণের তৃণভূমি—ঢেউ খেলে উঠে গেল ওপর দিকে। ঘন সবুজ গাছপাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ঢালা ছাদ দিয়ে ঘেরা বাড়ির তিনকোনা উপরিভাগ। শান্তিপূর্ণ, রৌদ্রালোকিত পল্লিভূমির পেছন দিক দিয়ে কিন্তু ঠেলে উঠেছে বুক-কাঁপানো জলাভূমির ঢেউ-খেলানো দীর্ঘ আভাস—সন্ধ্যাকাশের পটভূমিকায় তা কৃষ্ণকালো, মাঝে মাঝে খোঁচা-খোঁচা কুটিল পাহাড়।

পাশের রাস্তায় বোঁ করে ঢুকে পড়ল খোলা গাড়িখানা। গভীর গলি এঁকেবেঁকে উঠতে লাগলাম ওপরদিকে। রাস্তা ক্ষয়ে বসে গেছে বহু শতাব্দীর চক্রযানের যাতায়াতে। দু-পাশের খাড়া পাড়ে পুরু শ্যাওলা, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে তা থেকে; ঝুলছে পুষ্পহীন

মাংসল ফার্ন। পড়ন্ত রোদে ঝকমক করছে ব্রোঞ্জশুভ্র ব্রাকেনফার্ন আর নানা রঙের ছাপযুক্ত কাটাঝোপ। আরও উঠতে উঠতে পেরিয়ে এলাম একটা গ্রানাইট পাথর। তলা দিয়ে সশব্দে বইছে স্রোতস্বিনী, ধূসর বর্ণের পাথরের চাইয়ের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ফেনা ছড়িয়ে গর্জাতে গর্জাতে দ্রুত নেমে চলেছে নীচের দিকে। ফার আর ওক গাছের ঘন ঝোপে ছাওয়া একটা উপত্যকার মধ্যে রাস্তা আর স্রোতস্বিনী। প্রত্যেকবার মোড় ফেরার সঙ্গেসঙ্গে হর্ষধ্বনি করছেন বাস্কারভিল, ব্যগ্র চোখে চারপাশে দেখছেন এবং অসংখ্য প্রশ্ন করছেন। ওঁর চোখে সবই সুন্দর, আমি কিন্তু বিচিত্র এই পল্লিদৃশ্যের ওপর একটা বিষাদের ছায়া লক্ষ করছি–শীতের প্রকোপ কমে আসার সুস্পষ্ট লক্ষণ। হলদে পাতার গালচে পাতা রয়েছে গতিপথে গাড়ি যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তা উড়ছে খসখস শব্দে। উড়ন্ত পত্রপ আর পচা উদ্ভিদের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত চাকার ঘড় ঘড় শব্দ। প্রকৃতি যেন কীরকম! বাস্কারভিল বংশের উত্তরাধিকারী বাড়ি ফিরছেন–গাড়ির সামনে এহেন বিষণ্ণ উপহার না-দিলেই কি নয়!

আরে! আরে! এ আবার কী? সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর মর্টিমার।

জলাভূমির শৈলশ্রেণির মধ্যে থেকে গুল্মচ্ছাদিত একটা উদগত পর্বত খাড়া হয়েছে সামনে। চূড়ায় দাঁড়িয়ে একজন অশ্বারোহী সৈন্য, বাহুর ওপর রাইফেল উদ্যত। ঠিক যেন পাদভূমির ওপর কঠিন, সুস্পষ্ট ঘোড়সওয়ারের প্রস্তর মূর্তি–মলিন, কিন্তু কঠোর নজর রাস্তার দিকে–যে-রাস্তা বেয়ে আমরা চলেছি।

পাকিন্স, ব্যাপার কী বলো তো? শুধোন ডক্টর মর্টিমার।

সিটে বসেই শরীরটাকে অর্ধেক ঘুরিয়ে বলল চালক, প্রিন্সটাউন থেকে একজন কয়েদি। পালিয়েছে, হুজুর। আজ নিয়ে তিন দিন হল নিখোঁজ, প্রত্যেকটা স্টেশন আর রাস্তা পাহারা দিচ্ছে সেপাইরা কিন্তু তার টিকি দেখা যাচ্ছে না। এখানকার চাষিরা মোটেই ভালো চোখে দেখছে না ব্যাপারটা।

খবর দিলে তো পাঁচ পাউন্ড পাবে।

তা পাবে। কিন্তু গলাটাও কাটা যেতে পারে–পাঁচ পাউন্ড সে তুলনায় কিছু নয়। এ কিন্তু সাধারণ কয়েদি নয়, হুজুর। এর অসাধ্য কিছু নেই।

কে বলো তো?

সেলডন, নটিংহিল খুনি।

কেসটা স্পষ্ট মনে পড়ল। গুপ্তঘাতক নির্মম পাশবিকতা আর অদ্ভুত হিংস্রতা দেখিয়েছিল খুনটার মধ্যে। হোমস সেই কারণেই আগ্রহী হয়েছিল ব্যাপারটায়। প্রাণদণ্ড মকুব করে লঘুদণ্ড দেওয়া হয় মস্তিষ্কের পুরোপুরি সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় মাথা খারাপ না-থাকলে নাকি অমন বর্বরতা দেখানো যায় না। ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল আমাদের ভোলা গাড়ি, সামনেই ভেসে উঠল দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি এবং গ্রন্থিল, এবড়োখেবড়ো প্রস্তরস্তূপ আর ছোটো ছোটো অদ্ভুত পাহাড়–যা ডার্টমুর ছাড়া সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। ঠান্ডা

কনকনে একটা হাওয়ার ঝাঁপটা সেদিক থেকে এসে গা কাঁপিয়ে দিল আমাদের। ওইখানে কোথাও নির্জন, জনশূন্য ওই প্রান্তরের কোনো এক বিবরে বন্যজন্তুর মতো ঘাপটি মেরে আছে শয়তান-সদৃশ এই লোকটা, সমস্ত মানুষ জাতটার ওপর বিষিয়ে আছে তার অন্তর–তাদের জন্যেই আজ সে সমাজচ্যুত, গৃহহারা, নির্বাসিত। উষর এই পতিত প্রান্তরের ক্রুর সংকেতময়তা, হাড়কাঁপানো এই বাতাস এবং আকাশের ঘনায়মান অন্ধকার যেন সম্পূর্ণ হয়েছে নরপিশাচ ওই কয়েদির আবির্ভাবে। এমনকী বাস্কারভিলও চুপ মেরে গেলেন, ওভারকোট টেনেটুনে গায়ে আরও জড়িয়ে নিলেন।

উর্বর জমি এখন পেছনে এবং নীচে ফেলে এসেছি। পেছন ফিরে তাকালাম সেদিকে। তির্যক সূর্যরশ্মির দৌলতে ছোটো ছোটো জলের ধারাগুলো যেন সোনার সুতো হয়ে গিয়েছে, সদ্যকর্ষিত মাঠের কালো মাটি যেন আগুনরঙে জ্বলছে এবং বনজঙ্গলের জটাজাল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সামনের রাস্তা আরও নিরানন্দ, আরও ধন্য হয়ে উঠছে পাটকিলে আর জলপাই রঙের সুবিশাল ঢেউ খেলানো প্রান্তরের ওপর এলোমেলোভাবে ছড়ানো দানবিক গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের ওপর দিয়ে বিরামবিহীনভাবে বয়ে আসছে কনকনে হাওয়ার ঝাঁপটা। মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে আসছিল জলাভূমির কুঁড়েঘর; দেওয়াল আর ছাদ পাথর দিয়ে তৈরি; কর্কশ গায়ে লতার আচ্ছাদন নেই। আচম্বিতে চোখ গিয়ে পড়ল কাপের মতো একটা নিম্নভূমির ভেতর দিকে মাথা নেড়া ওক আর ফার গাছ দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক–বহুবছর ধরে মত্ত প্রভঞ্জন দাপট চালিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে মাথা হেঁট করে ছেড়েছে গাছগুলোর। নতমস্তক এইসব গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আকাশপানে উঠে রয়েছে দুটো উঁচু, সংকীর্ণ টাওয়ার। চাবুক দিয়ে দেখাল চালক।

বলল, বাস্কারভিল হল।

হলের মালিক উঠে বসলেন, আরক্ত গাল আর প্রদীপ্ত চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। মিনিট কয়েক পরেই পৌঁছোলাম দারোয়ানের গেটের সামনে। ঢালাই লোহার ওপর গোলোকধাঁধার মত অদ্ভুতরকমের কারুকার্য করা ফটক। দু-পাশে রোদ-জলে বিবর্ণ দুটো থাম, সর্বাঙ্গে চর্মরোগের মতো শ্যাওলার ধ্যাবড়া দাগ, এবং ওপরে বাস্কারভিল বংশের প্রতীকচিহ্ন শূকর-মস্তক। ফটক সংলগ্ন দারোয়ানের বাড়িটা কালো গ্রানাইট আর বেরিয়ে-পড়া পাঁজরার মতো বরগার ধ্বংসস্তূপ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা অর্ধনির্মিত নতুন ভবন–স্যার চার্লসের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অর্জিত স্বর্ণস্তূপের প্রথম ফসল।

ফটক পেরিয়ে এলাম একটা বীথির মধ্যে, আবার চাকার আওয়াজ ডুবে গেল ঝরা পাতার মধ্যে, মাথার ওপর লম্বা ডাল বাড়িয়ে পাতার চাঁদোয়া মেলে ধরল দু-পাশের গাছের সারি ঠিক যেন একটা বিষণ্ণ সুড়ঙ্গ পথ। অন্ধকারময় সুদীর্ঘ এই পথের একদম প্রান্তে ঝকমক করছে বাস্কারভিল ভবন! সেদিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন স্যার হেনরি।

এইখানেই কি? শুধোলেন খাটো গলায়।

না, না, ইউ-বীথিই রয়েছে বাড়ির দিকে।

মুখ কালো করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন তরুণ ওয়ারিশ।

বললেন, কাকার আর দোষ কী। এ-জায়গায় থাকলে আতঙ্ক পেয়ে বসে, সবসময়ে ভাবতেন ওই বুঝি বিপদে পড়লেন। যেই আসুক না কেন, ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করবে। ছ-মাসের মধ্যে দু-পাশে বিদ্যুৎবাতি বসাব। হলের দরজার সামনে সোয়ান আর এডিসনের হাজার পাওয়ারের আলো জ্বললে এখানকার চেহারা পালটে যাবে চিনতেও পারবেন না।

বীথিপথ শেষ হয়েছে ঘাস ছাওয়া একটা প্রশস্ত চত্বরের সামনে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বাড়িটাকে। পড়ন্ত আলোয় দেখা যাচ্ছে বাড়ির মাঝের দিকটাই বেশি ভারী একটা গাড়িবারান্দা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। পুরো সামনের দিকটা আইভিলতায় ঢাকা। যেখানে যেখানে জানলা আছে বা বংশের প্রতীক চিহ্ন রয়েছে, সেইসব জায়গাগুলোই কেবল ফাঁকা থেকে গেছে রহস্যময় এই অবগুণ্ঠনের মাঝে মাঝের এই অংশ থেকেই সুপ্রাচীন জোড়া টাওয়ার উঠে শূন্যে, সারাগায়ে অনেক ছিদ্র, গুলি চালাবার জন্যে ফোকরওয়ালা পাঁচিল। খাঁজ কাটা এই পাঁচিলের ডাইনে আর বাঁয়ে কালো গ্রানাইটের আধুনিক বাড়িটা প্রায় নির্মিত হয়েছে পরবর্তীকালে। মোটা মোটা গরাদ-ঢাকা জানলাগুলোর ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে, কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে খাড়া ছাদের ওপরকার উঁচু চিমনির মাথা থেকে।

স্বাগতম স্যার হেনরি! স্বাগতম জানাই বাস্কারভিল হল।

খোলা গাড়ির দরজা খুলে ধরার জন্যে দেউড়ির ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি। হলের হলদেটে আলোর পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে একটি স্ত্রী মূর্তি। এগিয়ে এসে পুরুষ মূর্তির হাত থেকে আমাদের ব্যাগ নিয়ে নামিয়ে রাখতে লাগল মেঝেতে!

ডক্টর মর্টিমার বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার হেনরি, এই গাড়িতেই সোজা বাড়ি যাচ্ছি আমি। স্ত্রী পথ চেয়ে আছে।

থেকে যান না? খেয়েদেয়ে যাবেন?

না না, আমি যাই। গিয়ে দেখব হয়তো কাজের পাহাড় জমে রয়েছে। থেকে গিয়ে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারতাম ঠিকই, তবে ও-ব্যাপারে ব্যারিমুর আমার চেয়ে ভালো গাইড জানবেন। চললাম। দিনে রাতে যখন দরকার পড়বে, খবর দেবেন–দ্বিধা করবেন না।

চাকার আওয়াজ মিলিয়ে গেল পেছনে। আমি আর স্যার হেনরি ঢুকলাম হলের ভেতরে, ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দে ভারী দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। দেখলাম একটা ভারি চমৎকার ঘরে দাঁড়িয়ে আমরা। বিরাট, ভারী ওককাঠের বরগা দিয়ে মজবুত সিলিং অনেক উঁচুতে–মহাকালের প্রাকুটি নিক্ষেপে কালো হয়ে গিয়েছে প্রতিটি কাঠের কড়ি। পেল্লায় আকারের লোহার কুকুরের পেছনে সেকেলে ধাঁচের প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি পট পট শব্দে জ্বলছে তার মধ্যে। আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলাম আমি আর স্যার হেনরি দীর্ঘপথ পরিক্রমায় দু-জনেরই হাত ঠান্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর দেখলাম চারিদিকের সুউচ্চ পাতলা জানালা, দেওয়ালের ওককাঠের তক্তা, হরিণের মাথা, বংশ প্রতীক, দাগ

ধরা শার্সির কাচ সব কিছুই মাঝের ল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় যেন বিষণ্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ম্লান।

স্যার হেনরি বললেন, এইরকমটাই কিন্তু আশা করেছিলাম। প্রাচীন যেকোনো ফ্যামিলির বাড়ির ছবি এই ধরনেরই হয়। ভাবুন দিকি, এই হলেই পাঁচ-শশা বছর ছিলেন আমার পূর্বপুরুষরা! ভাবলেও বুক দমে যায়।

দেখলাম, চারিদিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষি উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মলিন মুখ। আলো পড়েছে মুখে, লম্বা ছায়া লুটোচ্ছে দেওয়ালে, কালো চাদোয়ার মতো ঝুলছে মাথার ওপরে। মালপত্র আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে ব্যারিমুর। হাতেকলমে ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ পরিচালকের মতোই বিনম্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে। লোকটার চেহারা সত্যিই অসাধারণ। দীর্ঘাঙ্গ, সুশ্রী, চৌকোনা, কালো দাড়ি এবং দশজনের ভিড়ে চোখে পড়ার মতো পাণ্ডুর চোখ-মুখ।

স্যার, ডিনারের ব্যবস্থা এখুনি করব কি?

খাবার তৈরি?

মিনিট কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। ঘরে গেলেই গরম জল পাবেন। যতদিন আপনি নতুন ব্যবস্থা না-করছেন, ততদিন আমি আর আমার স্ত্রী সানন্দে আপনার সেবা করে যাব। নতুন পরিস্থিতিতে কিন্তু এ-বাড়িতে চাকর-বাকর আরও দরকার।

নতুন পরিস্থিতিটা আবার কী?

স্যার চার্লস অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন বলে আমরা দুজনেই তার সেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলাম। আপনি কিন্তু নিশ্চয় আরও সঙ্গীসাথি চাইবেন, ঘরকন্নার কাজেও পরিবর্তন আসবে।

তুমি আর তোমার স্ত্রী কি কাজ ছেড়ে দিতে চাও?

আপনি যখন সুবিধে বুঝবেন, তখন।

তোমাদের ফ্যামিলি কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরেই রয়েছে এ-বাড়িতে, তাই না? এত পুরোনো একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে যদি থাকতে হয় এখানে, খুবই দুঃখ পাব জানবে।

খাস চাকরের সাদা মুখে যেন আবেগের লক্ষণ দেখলাম বলে মনে হল আমার।

স্যার, একইরকম মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমার আর আমার স্ত্রীর। কিন্তু সত্যি কথাটা কী জানেন, স্যার চার্লসকে আমরা দুজনেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। বড়ো আঘাত পেয়েছি তাঁর মৃত্যুতে। বুক ফেটে যাচ্ছে এই পরিবেশে থাকতে। বাস্কারভিল হলে জীবনে আর কখনো সহজ মনে থাকতে পারব বলে মনে হয় না।

কিন্তু করবেটা কী?

ব্যাবসা করলে দাঁড়িয়ে যাব, এ-বিশ্বাস স্যার আছে। মূলধন তো দয়া করে দিয়েই গেছেন স্যার চার্লস। আসুন স্যার, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

সেকেলে হলের মাথার ওপর দিয়ে ঘিরে রয়েছে একটা চৌকোনা ব্যালাস্ট্রেড রেলিং দিয়ে যুক্ত ছোটো ছোটো পিলপের সারি। জোড়া সোপান শ্রেণি বেয়ে উঠতে হয় সেখানে। এর মাঝ থেকে দুটো লম্বা অলিন্দ বিস্তৃত বাড়ি যদ্র লম্বা, তদ্দূর পর্যন্ত এই অলিন্দের দু-পাশে রয়েছে সারি সারি শয়নকক্ষ। আমার আর স্যার হেনরির শোবার ঘর পড়েছে বাড়ির একদিকে এবং প্রায় পাশাপাশি। বাড়ির মাঝের অংশের চেয়ে এই অংশটি অনেক আধুনিক। অসংখ্য মোমবাতি আর ঝকমকে কাগজের দৌলতে নিরানন্দ ভাবটা অনেকটা কম এখানে–এ-বাড়ি ঢুকেই যে-ছাপ মনে দাগ কেটেছে, এদিকে তা অনেকটা ফিকে।

কিন্তু ডাইনিংরুমে বিরাজ করেছে ছায়া আর বিষণ্ণতা। হল ঘর থেকেই যেতে হয় খাবার ঘরে। লম্বাটে ঘর, একদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় উঁচু মঞ্চে। এখানে বসত ফ্যামিলির লোকজন, আশ্রিত ব্যক্তিদের পৃথক ব্যবস্থা। মাথার ওপরে কালো কড়িকাঠের পর কড়িকাঠ–তারও ওদিকে ধোঁয়া-মলিন সিলিং। সুদূর অতীতে এখানে সারি সারি মশাল জ্বলত–সেই আলোয় আলোকিত পরিবেশে বর্ণ আর অমার্জিত উল্লাস হয়তো অনেক কোমল হয়ে আসত; কিন্তু একটিমাত্র চাকা দেওয়া ল্যাম্পের স্বল্প আলোক-বলয়ের মধ্যে কৃষ্ণবেশে দুই ভদ্রলোক বসতেই একজনের গলা খাটো হয়ে এল অজান্তেই, আর একজনের বুক দমে গেল ভীষণভাবে। বিবিধ পরিচ্ছদে সজ্জিত সারি সারি নির্বাক

পূর্বপুরুষরা শুধু স্থির চাহনি নিক্ষেপ করেই বুক কাঁপিয়ে ছাড়ল আমাদের! এলিজাবেথের আমলের নাইট থেকে আরম্ভ করে রাজপ্রতিনিধির শাসনকালের বাবু ব্যক্তিরাও আছেন সেই সারিবদ্ধ আদিপুরুষের মধ্যে। কথা বললাম খুবই কম, খাওয়া শেষ হতেই স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বাঁচলাম এবং আধুনিক বিলিয়ার্ড-রুমে গিয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম।

স্যার হেনরি বললেন, তাই বলুন, খুব একটা সুখের জায়গা এটা নয়। থাকলে হয়তো সয়ে যায়, আমি কিন্তু এই মুহূর্তে খাপ খাওয়াতে পারছি না। এ-রকম বাড়িতে একেবারে একলা ছিলেন বলেই ছায়া দেখেও চমকে উঠতেন কাকা। যাই হোক, রাত হয়েছে। বলেন তো শুতে যাওয়া যাক। কাল সকালে হয়তো অনেকটা সুখকর মনে হতে পারে জায়গাটা।

বিছানায় ওঠার আগে পর্দা সরিয়ে তাকালাম জানলার বাইরে। হলের দরজার সামনেই যে ঘাসছাওয়া প্রশস্ত চত্বর, এ-জানলা থেকে তা দেখা যায়। তার ওদিকে দু-সারি গাছ ক্রমাগত দুরন্ত হাওয়ার টানে দুলছে আর ককিয়ে উঠছে। দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন মেঘের দল, ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাদ। হিমশীতল চন্দ্রকিরণে চোখে পড়ল বৃক্ষসারির অনেক দূরে ভাঙাচোরা শৈলশ্রেণি এবং টানা, লম্বা, তরঙ্গায়িত বিষণ্ণ জলাভূমি। বন্ধ করে দিলাম জানালা। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, প্রথম উপলব্ধির সঙ্গে এই শেষের উপলব্ধির কোনো ফারাক নেই।

তা সত্ত্বেও বলব, এইটাই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। ঘুমোতে পারছিলাম না। অসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও এপাশ-ওপাশ করছিলাম। সাধনা করেও ঘুমকে চোখে আনতে পারছিলাম

না। অনেক দূরে পনেরো মিনিট অন্তর শোনা যাচ্ছে একই সুরে মেলানো অনেক ঘণ্টার ঐকতান বাজনা এ ছাড়া বিরাট বাড়িখানায় বিরাজ করছে মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা! আর তারপরেই আচম্বিতে, নিথর নিস্তব্ধ সেই নিশুতি রাতে, একটা শব্দ ভেসে এল আমার কানে সুস্পষ্ট সে-শব্দ শুনতে এতটুকু ভুল আমার হয়নি বাতাসের মধ্য দিয়ে অনুরণন আর প্রতিধ্বনি জাগিয়ে শব্দটা আছড়ে পড়ল আমার কানের পর্দায়। ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি স্ত্রী-কণ্ঠ, বুকফাটা দুঃখ যেন চাপা হাহাকার হয়ে বেরিয়ে আসছে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে কেঁদেই চলেছে। উঠে বসলাম বিছানায়, কানখাড়া করে শুনলাম সেই কান্না। শব্দের উৎস খুব দূরে নয়, বাড়ির মধ্যে প্রতিটি স্নায়ু টান টান করে ঝাড়া আধঘণ্টা এইভাবে বসে রইলাম, কিন্তু ঘণ্টাশ্রেণির মিলিত ঐকতান বাজনা আর দেওয়ালের গায়ে আইভির খস খস শব্দ ছাড়া নতুন কোনো আওয়াজ কানে এল না।

মেরিপিট হাউসের স্টেপলটনরা

বাস্কারভিল হলে এসেই একটা কৃষ্ণকুটিল ছায়াপাত অনুভব করেছিলাম মনের মধ্যে মনের সতেজ সৌন্দর্য কিন্তু অনেকটা মুছে নিয়ে গেছে সেই অভিজ্ঞতা। প্রাতরাশ টেবিলে এসে বসলাম আমি এবং স্যার হেনরি। গরাদ দেওয়া সুউচ্চ জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ল ঘরে, জানলা-ঢাকা কুলমর্যাদার নকশা আঁকা ঢাল থেকে ছাপকা ছাপকা জলরং ভাসিয়ে দিল ঘরের সব কিছু। দেওয়ালের গাঢ় রঙের কাঠের তক্তাগুলো সোনালি রশ্মিতে ঝকঝক করতে লাগল ব্রোঞ্জধাতুর মতন, দেখে বোঝা ভার যে এই ঘরেই গত সন্ধ্যায় মন মুষড়ে পড়েছিল আমাদের নামহীন বিষণ্ণতায়।

ব্যারনেট তো বলেই ফেললেন, দোষটা দেখছি বাড়ির নয়, আমাদের! একে পথকষ্ট, তার ওপর কনকনে ওই ঠান্ডা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ধরে নিয়েছি বাড়ির জন্যেই মন অত মুষড়ে পড়ছে। এখন দেখুন শরীর ঝরঝরে, বাড়িও বেশ প্রসন্ন।

জবাবে বললাম আমি, সবটাই কিন্তু কল্পনা নয়। কাল রাতে একজন মেয়েছেলের ফুঁপিয়ে কান্না শুনেছিলাম?

তন্দ্রার মধ্যে ওই ধরনের কী একটা যেন শুনেছিলাম। অদ্ভুত কাণ্ড! কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রইলাম। কিন্তু আর কোনো আওয়াজ না-পেয়ে ভাবলাম নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি।

আমি কিন্তু শব্দটা স্পষ্ট শুনেছি। সত্যিই ফুঁপিয়ে কাঁদছিল একটা মেয়ে।

তাহলে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।

ঘণ্টা বাজালেন স্যার হেনরি। ব্যারিমুরকে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের এই অভিজ্ঞতার কোনো ব্যাখ্যা তার জানা আছে কিনা। আমার মনে হল, খাস চাকরের পাণ্ডুর মুখ যেন আরও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল প্রশ্নটা শুনে। কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুনল কান্নার বিবরণ।

বললে, স্যার হেনরি, এ-বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে দু-জন। একজন রান্নাঘরের পেছনের ঘরে বাসন ধোয়। ঘুমোয় বাড়ির ওদিককার অংশে আপনাদের দিকে নয়, আরেকজন আমার স্ত্রী। আওয়াজটা যে তার দিক থেকে আসেনি, সেটুকু আমি বলতে পারি।

কথাটা কিন্তু মিথ্যে। কেননা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর লম্বা করিডরে পূর্ণ সূর্যালোকে মিসেস ব্যারিমুরকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। রোদ পড়েছিল মুখে। দোহারা চেহারা, ভারী গড়ন, অনুভূতিহীন মুখচ্ছবি, দৃঢ়সংবদ্ধ কঠিন ঠোঁট। ঠোঁট টেপা হলে কী হবে, চোখ দুটোয় তো কিছু গোপন নেই। চোখের পাতা ফোলা, চোখও লাল। কাল রাতে তাহলে কেঁদেছে ওই স্ত্রীলোকটিই, কেঁদেই যদি থাকে দেবতার তো তা জানা উচিত। ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও মিথ্যে বলার ঝুঁকি নিয়েছে সে! কেন? এ কাজ সে করল কেন? মিসেস ব্যারিমুরই-বা কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কেন? পাণ্ডুর মুখ, সুদর্শন, কালো দাড়িওলা এই ব্যক্তিটিকে ঘিরে কিন্তু রহস্য দানা বেঁধেছে এরই মধ্যে, সেইসঙ্গে

জড়ো হয়েছে বিষণ্ণতা। স্যার চার্লসের মৃতদেহ সে-ই প্রথম আবিষ্কার করেছে। বৃদ্ধের মৃত্যু সম্পর্কে যে-পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া গেছে, সেটাও তারই কথা। এই ব্যারিমুরকেই রিজেন্ট স্ট্রিটে ছ্যাকড়াগাড়ির মধ্যে দেখেছি, এমনও তো হতে পারে? দাড়িটা বোধ হয় এইরকমই! গাড়োয়ান অবশ্য বলেছিল, মাথায় একটু খাটো–তবে সেটা চোখের ভুলও হতে পারে। বিষয়টা যাচাই করা যায় কীভাবে? গ্রিমপেন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলেই হল। জিজ্ঞেস করব পরীক্ষামূলক টেলিগ্রামটা সত্যিই ব্যারিমুরের হাতে হাতে দেওয়া হয়েছে কিনা। জবাব যাই হোক না কেন, শার্লক হোমসকে জানানোর মতো কিছু একটা পাওয়া তো যাবে।

ব্রেকফাস্টের পর অসংখ্য কাগজপত্র দেখতে বসলেন স্যার হেনরি। আমি দেখলাম, মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেছে–অভিযান সেরে আসা যাক। মাইল চারেক হাঁটতে হল জলার কিনারা ঘেঁষে। বেশ লাগল হাঁটতে। পৌঁছোলাম একটা ছোট্ট ধূসর গাঁয়ে। ছোটো কুঁড়েঘরগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে দুটি বড়ো বাড়ি একটা নিশ্চয় সরাইখানা, আর একটা ডক্টর মর্টিমারের আবাসস্থান। পোস্টমাস্টার লোকটা গাঁয়ের মুদিও বটে। টেলিগ্রামের কথা স্পষ্ট মনে আছে দেখলাম।

বললে, যেভাবে বলা হয়েছিল, সেইভাবেই টেলিগ্রামটা তো পৌঁছে দিয়েছি ব্যারিমুরকে।

কে দিয়েছে?

আমার এই ছেলেটা। জেমস গত সপ্তাহে বাস্কারভিল হয়ে মি. ব্যারিমুরকে টেলিগ্রামটা তুই দিয়েছিলিস?

হ্যাঁ বাবা, আমি দিয়েছিলাম।

ব্যারিমুরের নিজের হাতে? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মি. ব্যারিমুর মাচায় উঠেছিল বলে মিসেস ব্যারিমুরের হাতে দিয়েছিলেন। বলল, এখুনি দেবে মি, ব্যারিমুরকে।

ব্যারিমুরকে দেখেছিলে?

আজ্ঞে না; বললাম তো মাচায় উঠেছিল।

নিজের চোখে না-দেখে থাকলে জানলে কী করে মাচায় উঠেছে?

খিটখিটে গলায় পোস্টমাস্টার বললে, সে কোথায় আছে না-আছে সেটা তার নিজের স্ত্রীই ভালো জানে। টেলিগ্রাম কি পায়নি বলতে চান? ভুল যদি কোথাও হয়ে থাকে, নালিশ যা করবার মি. ব্যারিমুরই করবে।

অসম্ভব, এ-তদন্ত নিয়ে আর এগোনো যাবে না। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। হোমসের ধোঁকাবাজিতে কাজ হয়নি। ঠিক ওই সময়ে ব্যারিমুর লন্ডনে ছিল কিনা, সেটা প্রমাণ করা যাবে না। যদি ধরা যায়, স্যার চার্লসকে সর্বশেষ যে-ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় দেখেছে, সেই লোকই নতুন উত্তরাধিকারী ইংলন্ডে পা দিতে না-দিতেই ফেউয়ের মতো পেছন পেছন ঘুরছে? তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? তবে কি সে অন্যের চর? না, নিজেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে? বাস্কারভিল বংশকে নির্বংশ করায় তার স্বার্থ? টাইমস প্রবন্ধ থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে অদ্ভুত হুঁশিয়ারির কথা মনে পড়ল। এ কাজও কি তার? নাকি পৈশাচিক এই চক্রান্ত বানচাল করায় উদ্যোগী হয়েছে অন্য এক ব্যক্তি? একটা মোটিভই কল্পনায় আনা যায় স্যার হেনরি নিজেই তো বলেছিলেন, ভয় দেখিয়ে যদি ফ্যামিলির সবাইকে ভাগিয়ে দেওয়া যায়, পুরো বাড়িটা স্থায়ীভাবে ভোগে লাগবে ব্যারিমুর দম্পতির। কিন্তু অদৃশ্য যে-জাল ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে তরুণ ব্যারনেটকে, তার পেছনে যে সুগভীর চক্রান্ত বিরাজমান–এ-সিদ্ধান্ত দিয়ে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না হোমস নিজেই স্বীকার করেছে, জীবনে অনেক চাঞ্চল্যকর তদন্ত সে করেছে, কিন্তু এ-রকম জটিল কেস সে কখনো দেখেনি। ধূসর, নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে যাজ্ঞা করলাম, বন্ধুবর যেন ঝটপট হাতের কাজ শেষ করে এখানে এসে ওই গুরুর দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দেয়।

আচম্বিত চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল পেছনে ধাবমান পদশব্দে–সেইসঙ্গে শুনলাম কে যেন নাম ধরে ডাকছে আমায়। ডক্টর মর্টিমারকে দেখব আশা করেই পেছন ফিরলাম, কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম এক অচেনা ভদ্রলোককে আমার পেছনে ছুটে আসতে দেখে। আকারে ছোটোখাটো, ছিপছিপে, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো, চোখ-মুখ নিখুঁত, শনের

মতো একমাথা চুল, পাতলা চোয়াল, বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, পরনে ধূসর স্যুট, মাথায়-হ্যাট। গাছগাছড়ার নমুনা সংগ্রহের একটা টিনের বাক্স ঝুলছে কাঁধে। হাতে একটা সবুজ রঙের প্রজাপতি ধরবার জাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে বললেন, মাপ করবেন, আপনিই তো ডক্টর ওয়াটসন। জলাভূমিতে আমরা সবাই কাজের মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে কারো পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকি না–আলাপটা গায়ে পড়েই করে নিই। আমাদের দুজনের বন্ধু মি. মর্টিমারের মুখে নিশ্চয় শুনেছেন আমার নাম। আমিই মেরিপিট হাউসের স্টেপলটন।

বললাম, আপনার জাল আর বাক্স দেখেই তা বোঝা যায়। মিঃ স্টেপ্লটন যে একজন প্রকৃতিবিদ–এইটুকু আমি জানি। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কী করে?

মর্টিমারের ওখানে গেছিলাম। আপনি তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সার্জারি-ঘরের জানালা থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। একই পথে যেতে হবে দু-জনকে, তাই ভাবলাম দৌড়ে এসে নাগাল ধরে ফেলি যেতে যেতে পরিচিত হই। স্যার হেনরি এতটা পথ এসে ভালো আছেন তো?

খুবই ভালো আছেন। ধন্যবাদ।

সবাই ভেবেছিলাম, স্যার চার্লসের শোচনীয় মৃত্যুর পর ব্যারনেট আর বুঝি এখানে থাকতে চাইবেন না। এ-রকম একটা জায়গায় এসে কোনো বড়োলোকই নিজেকে শেষ

করতে চায় না। কিন্তু এলে যে পল্লিঅঞ্চলের কতখানি ভালো হয়, তা আর নাই-বা বললাম। এব্যাপারে স্যার হেনরির মনে কুসংস্কার বা ভয়-টয় নেই তো?

মনে তো হয় নেই।

পিশাচ কুকুরের কাহিনি শুনেছেন নিশ্চয়? ভৌতিক উপদ্রব চলছে এ-ফ্যামিলির প্রত্যেকের ওপর।

শুনেছি।

আশ্চর্য এখানকার চাষিরা কিন্তু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে গল্পটা! সরল মানুষ তো, সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে। যাকেই জিজ্ঞেস করুন, সে-ই দিব্যি গেলে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-রকম একটা প্রাণী সে জলায় দেখে বটে, হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেও ভদ্রলোকের চোখ দেখে মনে হল ব্যাপারটাকে উনি হাসির ব্যাপার হিসেবে নেননি। এইসব গল্প শুনেই স্যার চার্লস মনে মনে অনেক কল্পনা করে ফেলেছিলেন, ফলে মৃত্যু আসে শোচনীয়ভাবে।

কিন্তু কীভাবে?

ধকল সইতে সইতে স্নায়ু শেষ হয়ে এসেছিল, হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও ভালো ছিল না– যেকোনো কুকুরের ছায়া দেখলেও তাই হয়তো আঁতকে উঠতেন। এইভাবেই নিশ্চয় হার্টফেল করেছেন। আমার মনে হয়, আগের রাতে ইউ-বীথিতে সত্যিই কিছু একটা

দেখেছিলেন উনি। বৃদ্ধকে ভালোবাসতাম, জানতাম ওঁর হার্টের অবস্থা ভালো নয়। তাই এইরকম একটা বিপর্যয়ের ভয় কিন্তু বরাবরই ছিল আমার মনে।

হার্টের অবস্থা ভালো নয় জানলেন কী করে?

বন্ধু মর্টিমার বলেছেন।

আপনার বিশ্বাস তাহলে কুকুরের তাড়া খেয়ে স্রেফ ভয়ের চোটে মারা গেছেন স্যার চার্লস?

এর চাইতে ভালো ব্যাখ্যা আর কিছু দিতে পারেন?

কোনো সিদ্ধান্তেই আসিনি আমি।

মি. শার্লক হোমস এসেছেন কি?

কথাটা শুনেই মুহূর্তের জন্যে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু সঙ্গী ভদ্রলোকের শান্ত মুখ আর ধীরস্থির চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম চমকে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

বললেন, ডক্টর ওয়াটসন, আপনাকে জানি না, ভান করে তো লাভ নেই। আপনার ডিটেকটিভের কীর্তিকাহিনি এদেশেও পৌঁছে গেছে। নিজেকে বাদ দিয়ে তার গুণগান তো গাইতে পারেন না। মর্টিমার আপনার নাম বলতেই বুঝেছি আপনি কে, অস্বীকার করতে পারেননি, মর্টিমার। আপনি এখানে এসেছেন মানে মি. শার্লক হোমসও এ-কেসে আগ্রহী, সেইজন্যই জানতে চাইছিলাম এ-ব্যাপারে তিনি কী মত পোষণ করছেন।

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারব বলে মনে হয় না।

উনি কী নিজে এসে ধন্য করবেন আমাদের?

এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে বেরোতে পারবে না। হাতে অন্যান্য কেস রয়েছে।

কী কপাল দেখুন! আমাদের কাছে যা অন্ধকার, উনি এলে তা পরিষ্কার হয়ে যেত। আমাকে দিয়ে যদি আপনার গবেষণায় কোনো সাহায্য হয় তো নির্দ্বিধায় বলবেন। কাকে সন্দেহ করছেন, অথবা কীভাবে তদন্ত শুরু করবেন যদি আঁচ দেন তো আমার দিক থেকে সাহায্য অথবা উপদেশ পেতে পারেন।

শুনুন, আমি এসেছি আমার বন্ধু স্যার হেনরির সঙ্গে দিন কয়েক থাকতে–তদন্ত করতে নয়। কাজেই সাহায্য বা উপদেশ কোনোটারই দরকার হবে না।

চমৎকার? বললেন স্টেপলটন। ঠিকই তো, এখনই তো বিচক্ষণ এবং সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে। অনধিকার চর্চার জন্যে ধমক দিয়ে ভালোই করেছেন। কথা দিচ্ছি, এ নিয়ে আর জিজ্ঞেস করব না।

সরু একটা ঘাস-ছাওয়া রাস্তার সামনে এসে গেছি কথা বলতে বলতে। মূল রাস্তা থেকে এ-রাস্তাটা বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়েছে জলার মধ্যে। ডান দিকে, গোলাকার পাথর সমাকীর্ণ একটা খাড়াই পাহাড়–বিস্মৃত অতীতে গ্রানাইট পাথর কেটে আনা হত ওখান থেকে। বুক কাঁপানো মলিন অতীতে চুড়োর দিকে দাঁড়িয়ে আমরা খাঁজে খাঁজে ফার্ন আর কাটাঝোপ। তারও ওদিকে দূরে উঁচু জায়গায় একরাশ পালকের মতো ভাসছে ধোঁয়া।

স্টেপলটন বললেন, জলার এই রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটলেই মেরিপিট হাউস। ঘণ্টাখানেক সময় যদি হাতে থাকে তো আসুন, আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

স্যার হেনরির পাশে পাশে আমার থাকা দরকার, প্রথমেই এই চিন্তাটা লাফিয়ে উঠল মনের মধ্যে। তারপরেই চোখের সামনে ভেসে উঠল পড়ার ঘরের টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্র নিয়ে বসে আছেন তিনি। এ অবস্থায় তার কোনো সাহায্যেই আমি আসছি। হোমসও পইপই করে বলে দিয়েছে, জলার প্রতিবেশীদের ওপর যেন মনটা থাকে আমার তাদের হালচাল লক্ষ করতে হবে, খবর সংগ্রহ করতে হবে। তাই স্টেপল্টনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঘেসো পথটার দিকে ফিরলাম।

ঢেউ খেলানো প্রান্তর, দীর্ঘ সবুজ উত্তাল তরঙ্গ, মাঝে মাঝে খোঁচা খোঁচা গ্রানাইট পাথরের প্রচণ্ড তরঙ্গাকার উত্থান-পতন—সব মিলিয়ে সত্যিই বড়ো অপূর্ব জায়গা এই জলাভূমি। হাজার বার দেখেও ক্লান্তি আসে না। কত আশ্চর্য রহস্যই না লুকিয়ে রয়েছে এর খানাখন্দে। আকারে যেমন বিরাট, তেমনি অনুর্বর আর রহস্যময়।

আপনার নখদর্পণে নিশ্চয়?

আমি তো এখানে এসেছি মাত্র দু-বছর, স্যার চার্লস আসবার কিছুদিন পরেই। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে আমি নবাগত। তবে আমার নেশা টোটো টোটো করে বেড়ানো। শখের তাগিদে এ-তল্লাটের কোথায় না গেছি বলুন। আমি যা জানি, এখানকার খুব কম লোকই তা জানে।

জানাটা কি খুব কঠিন?

খুবই কঠিন। উত্তরে বিরাট প্রান্তরটা দেখেছেন, মাঝে মাঝে অদ্ভুত পাহাড় মাথা চাড়া দিয়েছে। অসাধারণ কিছু লক্ষ করছেন?

ঘোড়া হাঁকানোর পক্ষে এমন জায়গা দুর্লভ।

স্বভাবতই তাই মনে হয়। এই কারণেই অনেক ঘোড়া, অনেক মানুষ জীবন দিয়েছে ওখানে। ঝকঝকে সবুজ কতকগুলো জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লক্ষ করেছেন?

করেছি। অন্য অংশের চাইতে এই জায়গাগুলোই বেশি উর্বর মনে হচ্ছে।

হেসে উঠলেন স্টেপলটন। বললেন, ওই হল বিখ্যাত গ্রিমপেন পঙ্কভূমি। একটু ভুল পা ফেলেছেন কি আর দেখতে হবে না। মানুষ তোক কি জানোয়ার হোক–মৃত্যু অনিবার্য। কালকেই তো আমার চোখের সামনে তলিয়ে গেল একটা টাট্টু ঘোড়া। জলারই ঘোড়া। ঘাসের খোঁজে গেছিল ভেতরে। বেরিয়ে আর আসেনি। পাঁকভরতি জমিতে মুণ্ডুখানা কেবল দেখলাম–ঘাড় লম্বা করে চেষ্টা করছিল উঠে আসবার। কিন্তু টেনে নিল ভেতর থেকে। শুকনো ঋতুতেও অঞ্চল পেরোনো বিপজ্জনক–শরতের বর্ষায় অত্যন্ত ভয়ংকর। আমি কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে পথ করে ঠিক মাঝখানে যেতে পারি, জ্যান্ত ফিরেও আসতে পারি। আরে সর্বনাশ! শুনুন, আর একটা টাট্টু মরতে চলেছে।

সবুজ নলখাগড়ার মধ্যে বাদামি মতো কী যেন একটা গড়াগড়ি দিচ্ছে, পাকসাট খাচ্ছে দেখলাম। তারপরেই বিষম যন্ত্রণায় তেউড়ে গিয়ে একটা লম্বা গলা ছটফটিয়ে উঠল ওপর দিকে এবং একটা ভয়াবহ আর্তনাদ প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে ভেসে গেল জলার ওপর দিয়ে দূরে। বিষম আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল আমার, কিন্তু সঙ্গী ভদ্রলোকটির স্নায়ুর জোর দেখলাম আমার চাইতে বেশি।

বললেন, তলিয়ে গেল! গিলে নিল গ্রিমপেন পঙ্ক! দু-দিনে দুটো, হয়তো আরও অনেক–জানছে কে? শুকনোর সময়ে নানা দিক থেকে ভেতরে ঢোকে–পাঁকে পা দেওয়ার আগে টের পায় না কোথায় ঢুকেছে। বড়ো বিপজ্জনক জায়গা এই গ্রিমপেন পঙ্কভূমি।

এর মধ্যে আপনি ঢুকতে পারেন?

পারি। দু-একটা পথ আছে–চটপটে লোক সে-পথে যেতে পারে। সে-পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

কিন্তু এ-রকম ভয়ানক জায়গায় যান কেন?

দূরের ওই পাহাড়গুলো দেখছেন? ঠিক যেন দ্বীপ–যুগ যুগ ধরে দুর্গম পাঁক দিয়ে ঘেরা। অনেক দুর্লভ গাছগাছড়া আর দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতির আস্তানা ওই পাহাড়গুলো। বুদ্ধি যদি থাকে, গিয়ে জানা যায়।

কপাল ঠুকে একদিন দেখবখন।

বিস্মিত মুখে আমার পানে তাকালেন স্টেপলটন। বললেন, দোহাই আপনার, ওই ইচ্ছেটি মনে ঠাঁই দেবেন না। আপনার অপঘাত মৃত্যুর জন্যে শেষে কি আমি দায়ী হব? বিশ্বাস করুন, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না। জমির ওপর জটিল কতকগুলো চিহ্ন দেখে আমিই কেবল যেতে পারি।

আরে! আরে! ও আবার কী? বললাম সবিস্ময়ে।

সূচিপত্র

জলার ওপর দিয়ে প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে ভেসে গেল একটানা একটা গোঙানি–অবর্ণনীয় ভাবে করুণ। আকাশ বাতাস ভরে গেল সেই হাহাকারে অথচ বোঝা গেল না কোত্থেকে আসছে শব্দটা। প্রথম অনুচ্চ গজরানি, তারপর গভীর গর্জন, শেষে আবার সেই চাপা বিষণ্ণ অস্ফুট ঘড় ঘড় শব্দ–হৃদঘাতের মতো নিয়মিত ছন্দে স্পন্দিত হতে হতে এক সময়ে মিলিয়ে গেল গোঙানি। কীরকম যেন হয়ে গেল স্টেপলটনের মুখের চেহারা। অদ্ভুত চোখে তাকালেন আমার পানে।

বললেন, বড়ো বিচিত্র জায়গা এই জলা।

কিন্তু আওয়াজটা কীসের?

চাষিরা বলে, বাস্কারভিল কুকুরের গর্জন–শিকার খুঁজছে। এর আগেও বার দুয়েক এ-ডাক আমি শুনেছি কিন্তু এত জোরালো কখনো হয়নি।

ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল আমার চেয়ে দেখলাম বিশাল ঢেউখেলানো প্রান্তরের দিকে মাঝে মাঝে সবুজ নলখাগড়ার ছোপ-ছোপ দাগ। কোথাও কোনো স্পন্দন নেই–নিথর নিস্তব্ধ চারিদিক দিগন্তবিস্তৃত সেই ধু-ধু প্রান্তরের ওপর উড়ছে কেবল একজোড়া মিশমিশে কালো দাঁড়কাক আমাদের ঠিক পেছনেই একটা অদ্ভুত দর্শন এবড়োখেবড়ো পাহাড়ে বসে সহসা কা-কা শব্দে ডেকে উঠল কর্কশ গলায়।

বললাম, আপনি তো মশাই শিক্ষিত মানুষ। এইসব আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করেন নাকি? অদ্ভুত আওয়াজটা কীসের বলে মনে হয়?

পাঁকের গর্তে মাঝে মাঝে অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। হয় কাদা থিতিয়ে যাচ্ছে, নয় জল ঠেলে উঠছে, অথবা ওইরকম কিছু একটা ঘটছে।

না, না, এ-আওয়াজ সে-আওয়াজ নয়। এ তো জীবন্ত প্রাণীর ডাক।

তবে হয়তো তাই। জলার বকের গভীর ডাক কখনো শুনেছেন?

না, কখনো শুনিনি।

ইংলন্ডে এ-পাখি খুবই দুস্পাপ্য প্রায় লোপ পেতে বসেছে বললেই চলে। তবে কি জানেন, এ-জলায় সবই সম্ভব। আওয়াজটা এই বকবংশের শেষ কোনো বংশধরের ডাক হলে খুব একটা অবাক হব না। আমি।

জীবনে এমন পিলে চমকানো, ভূতুড়ে, বিকট ডাক আমি শুনিনি।

জায়গাটাও যে সেইরকম অলৌকিক গা ছমছম করে। দূরের পাহাড়গুলো দেখুন! কী মনে হয়?

ধূসর বর্ণের বিস্তর প্রস্তর-বলয় ছেয়ে রয়েছে পাহাড়ের ঢাল। সংখ্যায় গোটা কুড়ি তো বটেই।

কী ওগুলো? ভেড়ার খোঁয়াড়?

না, অনেক গুণ ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের—এগুলো তাদের বাড়ি। এককালে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের ঘনবসতি ছিল এই জলায়। তারপর থেকে কেউ আর এখানে থাকেনি। বাড়িঘরদোর পড়ে আছে ঠিক এইভাবেই। রেড ইন্ডিয়ানদের কুঁড়ের মতোই এইগুলি ছিল তাদের মাথা গোঁজার আস্তানা–ছাদগুলো কেবল উড়ে গেছে। কৌতূহল চরিতার্থ করতে ভেতরে যদি যান, আগুনের চুল্লি আর বসবার কৌচ পর্যন্ত দেখবেন রয়েছে ওখানে।

কিন্তু এ তো দেখছি একটা শহর বললেই চলে। মানুষ থাকত কোন সময়ে? প্রস্তর যুগের সময়ে সঠিক তারিখ নেই। কী করত? গরু ভেড়া চরাত পাহাড়ের ঢালে, তারপর যখন পাথরের কুঠারের বদলে ব্রোঞ্জের তলোয়ারের যুগ এল–মাটি খুঁড়ে টিন বার করতে শিখল। উলটোদিকের পাহাড়ে সারি সারি বিরাট খাতগুলো দেখছেন? ওদের কীর্তি, ডক্টর ওয়াটসন, অনেক অসাধারণ ব্যাপারই নজরে আসবে এই জলায়। আরে! আরে! নিশ্চয় সাইক্লোপাইড়স! আসছি দাঁড়ান।

ছোট্ট একটা মাছি বা মথ পোকার মতো কী যেন পত পত করে উড়ে গেল সরু পথের উপর দিয়ে। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে অসাধারণ ক্ষিপ্র বেগে এবং উদ্যমে

তাড়া করলেন স্টেপলটন। সোজা সুবিখ্যাত পঙ্ক অভিমুখে প্রাণীটা উড়ছে দেখে হতাশ হলাম আমি, স্টেপলটন কিন্তু থামলেন না। সবুজ জাল শূন্যে দুলিয়ে এতটুকু দ্বিধা না-করে এক ঘাসের চাপড়া থেকে আর এক ঘাসের চাপড়ায় লাফিয়ে ধেয়ে চললেন পেছন পেছন। ধূসর পোশাক আর ঝুঁকি মেরে এঁকাবেঁকা অনিয়মিত গতিপথের দরুন মনে হল যেন নিজেই একটা অতিকায় মথ-পোকা। সভয়ে বিস্ময়ে সপ্রশংস চোখে চেয়ে রইলাম সেইদিকে। ভয় হল যেকোনো মুহূর্তে পা ফসকে বিশ্বাসঘাতক পাকে পড়তে পারেন ভেবে; প্রশংসা করলাম অসাধারণ তৎপরতার জন্যে; বিস্মিত হলাম ভয়হীনতা দেখে। এমন সময়ে পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দেখি সরু রাস্তা বেয়ে আসছে একজন মহিলা। একরাশ পালকের মতো ধূম্রপুঞ্জ ভাসছে যেদিকে এবং যেদিকে রয়েছে মেরিপিট হাউস মেয়েটি আসছেন সেইদিক থেকে জলার উঁচু-নীচু জমির আড়ালে থাকায় কাছাকাছি না-হওয়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি।

দেখেই বুঝলেন ইনিই মিস স্টেপলটন–যাঁর কথা আগেই শুনেছি। জলাভূমিতে ভদ্রমহিলা সংখ্যার বেশি নেই নিশ্চয়। তা ছাড়া, আগেই শুনেছিলাম মিস স্টেপলটন নাকি রূপসী। এ-মহিলাও রূপসী এবং অনন্যা বললেই চলে। এ ধরনের রূপ বড়ো একটা দেখা যায় না। ভাইবোনের মধ্যে দেখলাম আসমান-জমিন ফারাক। স্টেপলটনের গায়ের রং না-ফর্সা না-ময়লা, চুল হালকা রঙের, চোখ ধূসর। কিন্তু তার বোনটির মতো শ্যামা মেয়ে সারা ইংলন্ডে আর দেখিনি–চামড়া কালো, চুল কালো, চোখ কালো। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মার্জিত। নিখুঁত সুচারু সম্ভ্রান্ত মুখাবয়ব–কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই বলেই হয়তো আবেগহীন মনে হতে পারে কিন্তু অনুভূতি সচেতন ঠোঁট, কৃষ্ণকালো চোখ আর সাগ্রহ চাহনি দেখে সে-ধারণা মনে ঠাঁই পায় না। বেশভূষায় সূক্ষ্ম রুচির ছাপ, ফিগার নিখুঁত।

www.bengaliebook.com

নিরালা জলপথে এ-মূর্তি যেন একটা অদ্ভুত প্রেতচ্ছায়া। আমি যখন ঘুরে দাঁড়ালাম, উনি তখন তাকিয়ে ভাইয়ের দিকে। পরক্ষণেই দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। মাথার টুপি তুলে বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছি আমি কে এবং কোথায় চলেছি এমন সময়ে ভদ্রমহিলা নিজেই যা বলে বসলেন, তাতে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বয়ে গেল আমার চিন্তাধারা।

বললেন, ফিরে যান। সোজা লন্ডনে ফিরে যান! এক্ষুনি যান!

আকাট মূর্খের মতো বোবা বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তার পানে।

চোখ জ্বলে উঠল ভদ্রমহিলার। অধীরভাবে পা ঠুকলেন মাটিতে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন ফিরে যাব?

তা বলতে পারব না, ব্যর্থ, খাটো গলায় বললেন মিস স্টেপলটন-উচ্চারণটা অদ্ভুত—আধো আধো, অস্ফুট। দোহাই আপনার, যা বলি তাই করুন। চলে যান এখান থেকে-এ-জীবনে আর পা দেবেন না জলায়।

কিন্তু এই তো এলাম আমি।

কী বিপদ! আপনার ভালোর জন্যে সাবধান করা হচ্ছে বুঝছেন না কেন? ফিরে যান লন্ডনে! আজ রাতেই রওনা দিন! যত ক্ষতিই হোক–এ-জায়গা ছেড়ে চলে যান এখুনি! চুপ, আমার ভাই আসছে! যা বললাম, তার একটা কথাও ওকে বলবেন না। দূরের ওই অর্কিডটা দয়া করে এনে দেবেন? হরেকরকম অর্কিডে ঠাসা আমাদের জলা–কিন্তু আপনি এসেছেন বড়ো দেরিতে অর্কিডের বাহারটা দেখতে পেলেন না।

পলায়মান প্রাণীর পেছন ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আরক্ত মুখে ফিরে এলেন স্টেপলটন।

আরে, বেরিল দেখছি! কেন জানি আমার মনে হল, স্বাগত সম্ভাষণে প্রাণের সাড়া যেন নেই। বরং তার উলটো।

জ্যাক, তুমি দেখছি তেতে লাল হয়ে গেছ।

সাইক্লোপাইডের পেছনে ছুটেছিলাম। খুবই দুষ্প্রপ্য, শরতের শেষে কদাচিৎ চোখে পড়ে। ইস, একটুর জন্য ফসকে গেল!

কথাগুলো নির্লিপ্তস্বরে বললেন স্টেপলটন, ছোটো ছোটো হালকা রঙের চোখ দুটোর চাহনি কিন্তু বিরামবিহীনভাবে পর্যায়ক্রমে ঘুরতে লাগল আমার আর মেয়েটির ওপর। নিজেরাই আলাপ পরিচয় করে নিয়েছ দেখছি।

তা নিয়েছি। স্যার হেনরিকে বলছিলাম বড়ো দেরি করে এলেন, জলার আসল সৌন্দর্য এখন বিদায় নিয়েছে।

আরে, উনি কে বলে মনে হয় তোমার?

নিশ্চয় স্যার হেনরি বাস্কারভিল।

আরে না, না, বললাম আমি। খুবই সাধারণ মানুষ আমি, তবে ওঁর বন্ধু। আমার নাম ডক্টর ওয়াটসন।

মেয়েটির ভাবব্যঞ্জক মুখের ওপর দিয়ে বিরক্তির লাল আভা ভেসে যায়।

কথায় কথায় দেখছি ভুল করে ফেলেছি, বললেন মিস স্টেপলটন।

কিন্তু বেশি কথা বলার মতো সময় তো পাওনি, আগের মতোই সন্ধানী চোখে তাকিয়ে মন্তব্য করেন ভাই।

বোন বললেন, ডক্টর ওয়াটসন যে বেড়াতে এসেছেন বুঝিনি, আমি ভেবেছিলাম উনি ও-বাড়িতেই থাকেন। অর্কিডের সময় চলে গেছে, কি, সবে শুরু হয়েছে তা নিয়ে ওঁর খুব একটা মাথাব্যথা নেই। যাই হোক, আসুন। মেরিপিট হাউসে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

একটু হাঁটতেই একটা নির্জন নিরাপদ জলাভূমি ভবনের সামনে এসে পৌঁছোলাম। এক সময়ে এখানে যে থাকত, সে গোরু ছাগল খাইয়ে রোজগার করত। তখন এ-অঞ্চল অনেক সমৃদ্ধ ছিল। এখন সেদিন গিয়েছে। একটু মেরামত করে বাড়িটাকে বসতবাড়িতে পরিণত করা হয়েছে। ফলফুলের একটা বাগান ঘিরে রয়েছে বাড়ির চারধারে, কিন্তু জলাভূমির সব গাছের মতোই এ-বাগানের গাছও মাথা চাড়া দিতে পারেনি মাথা হেঁট করে রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে জায়গাটা নিম্নমানের এবং বিষাদাচ্ছন্ন। অদ্ভুত ধরনের শুষ্কবদন একজন পরিচারক এসে দরজা খুলে ধরলে। গায়ে সেকেলে ধাঁচের কোট, মুখের চামড়া কুঞ্চিত, এ-বাড়ির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মূর্তি। ভেতরের ঘরগুলো বেশ বড়ো; রুচিসম্মত আসবাবপত্র দিয়ে সাজানোভদ্রমহিলার রুচি-সুন্দর হাতের ছোঁয়া রয়েছে সর্বত্র। জানলা দিয়ে গ্রানাইট সমাকীর্ণ দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির একঘেয়ে তরঙ্গায়িত প্রান্তরের পানে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, উচ্চশিক্ষিত এই ভদ্রলোক এবং পরমাসুন্দরী এই মহিলা কীসের আকর্ষণে রয়েছেন এখানে।

আমার মনের চিন্তা পাঠ করে নিয়েই যেন বললেন স্টেপলটন, এ-রকম একটা জায়গা বসবাসের জন্য পছন্দ করলাম ভেবে অবাক হচ্ছেন তো? যত অদ্ভুতই হোক না, আমরা কিন্তু বেশ সুখে আছি, তাই না বেরিল?

খুবই সুখে, বললেন মিস স্টেপলটন, কিন্তু কথাটা প্রাণ থেকে যেন বললেন না– আত্মপ্রত্যয় ধ্বনিত হল না কণ্ঠস্বরে।

স্টেপলটন বললেন, একটা স্কুল খুলেছিলাম উত্তর অঞ্চলে। আমার মতো মেজাজের লোকের পক্ষে কাজটা যন্ত্রবৎ আগ্রহ জায়গায় না। কিন্তু ছোটোদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাওয়াটা কম নয়। নিজের চরিত্র আর আদর্শ অনুযায়ী ছোট্ট মানুষগুলোকে গড়ে তুলতে কী ভালোই না লাগত। কিন্তু নিয়তি তা চাইলেন না। সাংঘাতিক মড়ক লাগল স্কুলে মারা গেল তিনটে ছেলে। আঘাত সামলে উঠতে পারল না স্কুল–আমার বেশ কিছু মূলধন জলে গেল এইভাবে। ছেলেগুলোর মিষ্টি সঙ্গ যদি পেতাম, লোকসান সত্ত্বেও প্রাণে ফুর্তি থাকত। কেননা উদ্ভিদতত্ত্ব আর প্রাণীবিদ্যা দুটোতেই আমার ঝোঁক প্রচণ্ড কাজ করার অসীম সুযোগ রয়েছে এখানে, আমার বোনটিও আমার মতোই প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ডক্টর ওয়াটসন, ঘরের জানলা দিয়ে জলাভূমির চেহারা দেখে এইসব কথাই ভিড় করে আসছে আপনার মাথার ভেতরে।

সত্যিই তাই জায়গাটা এত মনমরা আপনার চেয়ে আপনার বোনের কাছে হয়তো আরও বেশি মনমরা।

না, না, মনমরা আমি কখনোই নই, ঝটিতি জবাব দিলেন ভদ্রমহিলা!

বই রয়েছে, পড়াশুনো রয়েছে, ইন্টারেস্টিং প্রতিবেশীরা রয়েছেন। স্বক্ষেত্রে ডক্টর মর্টিমার অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ। স্যার চার্লস বেচারাও সঙ্গী হিসেবে প্রশংসার পাত্র ছিলেন। খুবই খাতির ছিল আমাদের সঙ্গে ওঁর মৃত্যু যে আমাদের কাছে কতখানি, তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ বিকেলেই স্যার হেনরির সঙ্গে আলাপ করতে গেলে বিরক্ত হবেন বলে মনে হয়?

খুশিই হবেন।

তাহলে দয়া করে বলবেন আমি আসতে পারি। উনি যাতে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারেন, সব কিছুই সহজভাবে নিতে পারেন আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সে-চেষ্টা করব। ডক্টর ওয়াটসন, আসুন না, ওপরতলায় এসে আমার লেপিডটেরা-র সংগ্রহটা দেখে যান। ইংলন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে এর চাইতে সম্পূর্ণ সংগ্রহ আর নেই বলেই আমার বিশ্বাস। দেখতে দেখতেই লাঞ্চ তৈরি হয়ে যাবে।

আমি কিন্তু তখন ছটফট করছি ফিরে যাওয়ার জন্য যে-দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তা ফেলে এখানে লাঞ্চ খাওয়া যায় না। মন ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে টাট্টুর শোচনীয় মৃত্যু, জলার বিষণ্ণতা এবং বাস্কারভিল বংশের ভয়ংকর কিংবদন্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ভৌতিক ডাকের দরুন। সব মিলিয়ে যেন দমে গিয়েছে কিছু ভালো লাগছে না। সবার ওপরে রয়েছে মিস স্টেপলটনের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি সুগভীর আন্তরিকতায় ব্যাকুল সেই হুঁশিয়ারি ভোলবার নয়–আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয় গুরুতর এবং গভীর একটা কারণ আছে। তাই খেয়ে যাওয়ার সব অনুরোধ ঠেলে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাস-ছাওয়া পথে রওনা হলাম বাস্কারভিল হল অভিমুখে।

কিন্তু সোজা রাস্তা নিশ্চয় একটা ছিল–সবাই তা জানে না। কেননা, মূল রাস্তায় পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম মিস স্টেপলটনকে দেখে। আমার আগেই উনি পৌঁছেছেন এবং

রাস্তার পাশে একটা পাথরের ওপর বসে আছেন। মুখটি সুন্দরভাবে রাঙা হয়ে গিয়েছে হাঁপিয়ে যাওয়ায়।

বললেন, ডক্টর ওয়াটসন, আপনাকে ধরব বলে দৌড়ে এলাম। টুপি পর্যন্ত পরবার সময় পাইনি। দাঁড়াতে পারব না–ভাই ধরে ফেলবে। আপনাকে স্যার হেনরি ভেবে যে-বোকামি করেছি, তার জন্যে দুঃখিত। যা বলেছি, তা ভুলে যান। আপনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ভোলা কি যায়, মিস স্টেপলটন, বললাম আমি। স্যার হেনরির বন্ধু আমি। তার ভালোমন্দ নিয়ে খুবই উদবিগ্ন। স্যার হেনরি লন্ডনে ফিরে যান–এই আপনি চান। কিন্তু এত ব্যগ্রতা কেন আপনার?

মেয়েলি খেয়াল, ডক্টর ওয়াটসন। কারণ ছাড়াই অনেক সময়ে অনেক কাজ করে ফেলি, অনেক কথা বলে ফেলি আমি–আর একটু মিশুন~ তাহলেই বুঝবেন।

না, না, আপনার গলা কাঁপছিল কথা বলতে বলতে স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে আপনার চাহনি। আমার কথা রাখুন মিস স্টেপলটন, দয়া করে মন খুলে কথা বলুন–এখানে এসে ইস্তক চারপাশে একটা অশুভ ছায়ার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বলেই এত করে বলছি যা জানেন সব বলুন। মহাকুটিল ওই গ্রিমপেন পঙ্কর মতোই জীবন এখানে বিপদসংকুল–ছোটো ছোটো সবুজ ছোপ চারিদিকেই যেকোনো মুহূর্তে পা ফসকে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা–অথচ কেউ নেই যে বলে দেয় কোন পথ দিয়ে গেলে জীবনটা রক্ষে

পাবে। তাই বলছি, কী বলতে চাইছেন খুলে বলুন–কথা দিচ্ছি আপনার প্রতিটি কথা স্যার হেনরির কানে পৌঁছে দেব।

ক্ষণেকের জন্যে একটা দোটানার ভাব খেলে গেল মিস স্টেপলটনের মুখের ওপর দিয়ে, কিন্তু আবার শক্ত হয়ে এল চোখের দৃষ্টি।

বললেন, ডক্টর ওয়াটসন, আপনি দেখছি তিলকে তাল করছেন। স্যার চার্লসের মৃত্যুতে আমরা ভাই বোন দু-জনেই দারুণ আঘাত পেয়েছি। খুবই অন্তরঙ্গ ছিলাম আমরা ওঁর বেড়ানোর প্রিয় পথ ছিল জলার ওপর দিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত। বংশের মাথার ওপর এই যে-অভিশাপটা ঝুলছে, এটা খুব বেশি নাড়া দিয়েছিল ওঁকে। তাই তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর মনে হয়েছিল, উনি তাহলে খামোকা দুশ্চিন্তায় ভোগেননি নিশ্চয় একটা কারণ ছিল। তাই বংশের আর একজন অভিশপ্ত এই ভিটেয় এসে উঠতেই আমার মন বলল তাকে সাবধান করে দিতে বিপদ এখানে পদে পদে প্রাণের মায়া থাকলে যেন পালান। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছিলাম কথাগুলো।

কিন্তু বিপদটা কীসের?

হাউন্ডের গল্প তো শুনেছেন?

এসব রাবিশ গল্প আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু আমি করি। স্যার হেনরির ওপর যদি আপনার তিলমাত্র প্রভাব থাকে, এ-জায়গা থেকে ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যান–মনে রাখবেন এখানে এলেই একটা মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েছেন এবং বংশের প্রত্যেকে কেউ পার পায়নি। পৃথিবীটা অনেক বড়। এ-রকম। বিপদের জায়গায় উনি থাকতে চান?

কারণ এটা বিপদের জায়গা বলে। স্যার হেনরির প্রকৃতি এইরকমই। এর বেশি সঠিক কিছু খবর যদি দিতে না-পারেন, এখানে থেকে তাকে নড়াতে আমি পারব না–অসম্ভব।

সঠিক কিছুই বলতে পারব না–কারণ আমি নিজেই সঠিক কিছু জানি না।

মিস স্টেপলটন, আর একটা প্রশ্ন করব। এখন যা বললেন, প্রথমবারেও যদি এর বেশি কিছু মনে করে না-থাকেন তো ভাইকে বলতে বারণ করলেন কেন? পাছে ভাই কিছু শুনে ফেলে বলে কথা ঘুরিয়ে নিলেন কেন? এমন কিছু ছিল না কথার মধ্যে যা শুনে ফেললে তিনি অথবা অন্য কেউ আপত্তি জানাবেন?

আমার ভাই অন্তর দিয়ে চায় বাস্কারভিল হলে যেন লোকজন থাকে–জলার সাধারণ মানুষ তাতে উপকৃত হবে বলে তার বিশ্বাস। স্যার হেনরিকে চলে যাওয়ার মতো প্ররোচনা দিয়ে কথা বলেছি শুনলে ভীষণ রেগে যাবে সে। যাক, আমার কর্তব্য আমি করেছি, আর কথা বলব না। আর দাঁড়াবও না বেশিক্ষণ আমাকে না-দেখলেই ভাই ভাববে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি। আসি!

পেছন ফিরেই দেখতে দেখতে বিক্ষিপ্ত বিশালাকার প্রস্তররাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। নামহীন আতঙ্কে কানায় কানায় ভরে রইল আমার অন্তর। দ্রুত পা চালালাম বাস্কারভিল হল অভিমুখে।

ডক্টর ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট

শার্লক হোমসকে যেসব চিঠি লিখেছিলাম, আমার সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো এখন সাজানো। এখন সেই চিঠিগুলোর অনুলিপি দেব–ঘটনার স্রোত কোনদিকে গিয়েছে এই চিঠি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। একটা পাতা দেখছি খোয়া গেছে, কিন্তু অন্যগুলো যেভাবে লিখেছিলাম সেইভাবেই রয়েছে। বিয়োগান্তক ঘটনাবলির যে স্মৃতি মনের মধ্যে এখনও দগদগ করছে তার চেয়ে অনেক মর্মস্পর্শী এই চিঠি। সেই মুহূর্তে, আমি যা উপলব্ধি করেছি, বা যাদের সন্দেহ করেছি, তার যথাযথ বিবরণ কিন্তু এই চিঠিগুলো। স্মৃতি থেকে এত খুঁটিয়ে লেখা সম্ভব নয়।

বাস্কারভিল হল, তেরোই অক্টোবর

প্রিয় হোমস,

পাণ্ডববর্জিত এ-অঞ্চলে যা-যা ঘটেছে, তার সব খবরই আমার চিঠি আর টেলিগ্রাম মারফত পেয়েছ। স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি এ-জায়গা মাড়ান না। বেশিদিন এখানে থাকলে মারাত্মক অবসন্ন করে তোলে জলার প্রেতাত্মা–ধু-ধু বিস্তৃত জলার বিরাটত্ব আর বিকট সৌন্দর্য চেপে বসে মনের মধ্যে। জলার বুকে একবার পা দিলেই আধুনিক ইংলন্ডের সব চিহ্নই ফেলে আসতে হয় পেছনে, বিনিময়ে চারিধারে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক মানবের বসবাস আর কাজকর্মের নিদর্শন। যেদিকেই হাঁটো না কেন, দু-ধারে কেবল দেখব

বিস্তৃত এই মানবদের বাড়িঘরদোর, নয়তো কারখানা, অথবা বিরাট বিরাট পাথরের স্তম্ভ একটিমাত্র পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড এই থামগুলো নাকি তাদের মন্দির। উদ্ভিদবর্জিত ক্ষতচিহ্নযুক্ত পাহাড়গুলোর গায়ে নির্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের কুটিরগুলোর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হবে বর্তমান সময় থেকে পেছিয়ে গেছ, তখন যদি দেখো চামড়ার পোশাক পরা লোমশ মানব হামাগুড়ি দিয়ে নীচু দরজা পেরিয়ে এসে ধনুকের ছিলায় চকমকি পাথরের ফলক বাঁধা তির লাগাচ্ছে, তোমার মনেই হবে না এটা অতীত এবং অবাস্তব মনে হবে তোমার চাইতে বরং ওই লোকটাই অনেক স্বাভাবিক। সবচেয়ে অদ্ভুত কী জানো, ঊষরতম এই জমিতেই ওরা এত ঘন বসতি করে থেকে গেছে। আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ নই, তবে আমার বিশ্বাস এরা তেমন লড়াকু জাত ছিল না, লুঠেরাদের অত্যাচারে দেশত্যাগী হয়ে এমন এক জায়গায় আস্তানা নিতে বাধ্য হয়েছিল, যে-জায়গায় দখল নিতে আর কেউ আসবে না।

যে-কাজে পাঠিয়েছ, তার সঙ্গে এইসবের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তোমার কঠোর প্র্যাকটিক্যাল মনে এসব তত্ত্ব কোনো আগ্রহই সঞ্চার করতে পারছে না নিশ্চয়। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে কি, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে–এ-ব্যাপারে তোমার পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য এখনও আমি ভুলিনি। তাই স্যার হেনরি বাস্কারভিল সম্পর্কিত ঘটনাবলির মধ্যে ফিরে আসা যাক।

গত ক-দিনের রিপোর্ট না-পাওয়ার কারণ খবর দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেনি। আজ কিন্তু সে-সুযোগ এসেছে, অত্যন্ত বিস্ময়কর একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে–

যথাসময়ে তা বলছি। তার আগে এই পরিস্থিতি সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপার তোমাকে অবহিত করা দরকার।

এর মধ্যে একটা ব্যাপারে তোমাকে খুব কম সংবাদই দিয়েছি। জেলখানার পলাতক সেই কয়েদির কথা আমি বলছি–পালিয়ে গিয়ে জলার মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছে। লোকটা আর

ওখানেও নেই, এ-রকম বিশ্বাসের জোরদার কারণ দেখা গিয়েছে। এ-জেলায় যারা নিরালা। নির্জনে বাড়ি করে আছে, এ-সংবাদে তারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। পলায়নের পর পনেরো দিন কেটেছে তার টিকি দেখা যায়নি, কোনো খবরও পাওয়া যায়নি। এতদিন জলায় ঘাপটি মেরে আছে, এটাও কল্পনায় আনা যায় না-ঘাপটি মেরে থাকাটা কঠিন কিছু নয়। পাথরের অত কুটিরের যেকোনো একটায় লুকিয়ে থাকলেই হল। কিন্তু খাবে কী? জলার ভেড়া ধরে জবাই করে খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। তাই মনে হয়, জলা থেকে সে বিদায় নিয়েছে। জলার ধারে ধারে যেসব কৃষকদের বাস, তারাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারছে।

এ-বাড়িতে আমরা চারজন সক্ষম পুরুষ রয়েছি। কাজেই আমাদের ওপর কেউ চড়াও হলে সুবিধে করতে পারবে না। কিন্তু স্টেপলটনদের কথা মনে হলে মনটা অস্বস্তিতে ভরে যায়। এক মাইল দূর থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করা যায় না। ভাইবোন ছাড়াও ও-বাড়িতে রয়েছে। একজন পরিচারিকা, আর একজন বৃদ্ধ পরিচারক। ভাইটিও তেমন বলবান নয়। নটিংহিল ক্রিমিন্যালের মতো জেলপালানো মরিয়া কয়েদি যদি কোনোরকমে একবার বাড়িতে ঢুকে পড়ে তো রেহাই পাবে না কেউই। আমি এবং স্যার হেনরি দু-

জনেই এই পরিস্থিতির জন্যে উদবিগ্ন বোধ করছিলাম। আমাদের সহিস পাকিন্স গিয়ে ওঁদের বাড়িতে রাত কাটাক, এমন প্রস্তাবও করা হয়েছিল কিন্তু স্টেপলটন রাজি হননি।

ব্যাপার কী দাঁড়িয়েছে শোনো। ব্যারনেট বন্ধুটি সুন্দরী প্রতিবেশিনীর প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এ-রকম একটা নিরালা জায়গায় সময় যেন কাটতে চায় না–ওঁর মতো কর্মঠ পুরুষের পক্ষে এ একটা যন্ত্রণা। মেয়েটিও প্রকৃত মোহিনী এবং পরমাসুন্দরী। ভাইটি যেমন শীতল আবেগহীন বোনটি ঠিক তার উলটো। গ্রীষ্মমণ্ডলের মানবী যেন বিদেশ থেকে আমদানি। তফাতটা আশ্চর্য রকমের। ভাইয়ের বুকেও অবশ্য সুপ্ত অগ্নি আছে–মাঝে মাঝে তার আভাস দিয়ে ফেলেন। বোনের ওপর ভাইয়ের প্রভাব নিশ্চয় জবরদস্ত রকমের, কেননা কথা বলতে বলতে বোনটি ঘন ঘন ভাইয়ের দিকে তাকান–যেন যা বলছেন তাতে ভাইয়ের অনুমোদন আছে কিনা চোখে চোখে জেনে নেন। আশা করি, বোনকে স্নেহ করে ভাই। মাঝে মাঝে ভদ্রলোকের চোখে শুষ্ক দীপ্তির যে ঝলক আর পাতলা ঠোঁটে যে কাঠিন্য লক্ষ করি তা অবশ্য রুক্ষ মেজাজের লক্ষণ। তোমার কাছে ইনি একটা গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়াতেন।

প্রথম দিনেই বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ইনি। দুষ্ট হিউগোর কিংবদন্তির উৎস যেখানে, পরের দিন সকালে নিয়ে গেলেন সেখানে। জায়গাটা জলার ভেতরে মাইল কয়েক ভেতর খাঁ-খাঁ করছে চারিদিকে গল্পের সৃষ্টি হয়তো সেই কারণেই। দু-পাশে দুটো এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা উপত্যকা। উপত্যকা শেষ হয়েছে একটা খোলা, ঘাস ছাওয়া জমির সামনে সাদা তুলো ঘাসের ফুট-ফুট দাগ এখানে

সেখানে। মাঝখানে খাড়া হয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড পাথর। রোদে জলে ক্ষয়ে ধারালো হয়ে গিয়েছে ওপর দিক ঠিক যেন কোনো দানব-জন্তুর একজোড়া বিষদাঁত। সুপ্রাচীন কিংবদন্তির উপর্যুক্ত ক্ষেত্রই বটে। ট্র্যাজেডির যোগ্য জায়গা। স্যার হেনরি দেখলাম বিলক্ষণ কৌতূহলী হয়েছেন। একাধিকবার স্টেপলটনকে জিজ্ঞেস করলেন, নরলোকে অলৌকিক কারসাজির সম্ভাবনা তিনি বিশ্বাস করেন কিনা, দেহধারীদের জগতে বিদেহীদের কোনো হাত থাকে কিনা। হালকাভাবে জিজ্ঞেস করলেও লক্ষ করলাম কথাগুলো বেরোচ্ছে অন্তর থেকে। স্টেপলটন রেখেঢেকে জবাব দিয়ে গেলেন! স্পষ্ট বুঝলাম, ব্যারনেটের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে ওঁর অভিমত উনি পুরোপুরি ব্যক্ত করছেন না। কতকগুলো অনুরূপ ঘটনা শুধু বললেন, অশুভ শক্তির প্রকোপে কীভাবে সর্বনাশ হয়েছে–সেইসব ঘটনার কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম, এ-ব্যাপারে জনপ্রিয় অভিমতের সঙ্গে তাঁর মতের কোনো ফারাক নেই।

ফেরার পথে মেরিপিট হাউসে লাঞ্চ খেতে গিয়ে মিস স্টেপলটনের সঙ্গে পরিচয় ঘটল স্যার হেনরির। প্রথম দর্শনেই স্যার হেনরি আকৃষ্ট হয়েছেন লক্ষ করলাম–মিস স্টেপলটনের মনোভাবও নিশ্চয় তাই। আকর্ষণটা পারস্পরিক। বাড়ি ফেরার পথে বার বার মিস স্টেপলটনের কথা বললেন স্যার হেনরি। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভাই অথবা বোনের সঙ্গে রোজই দেখা হচ্ছে আমাদের একদিনও বাদ যায়নি। আজ রাত্রে এখানে খাবেন ওঁরা কথা চলছে সামনের সপ্তাহে আমরা যাব ওঁদের বাড়ি। একেই বলে মণিকাঞ্চন যোগ। স্টেপলটনের খুশি হওয়াই উচিত। কিন্তু বোনের সঙ্গে স্যার হেনরি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলেই তীব্র অননুমোদন তার চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি। বোন-অন্ত-প্রাণ তিনি বুঝি, বোন চলে গেলে একক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তাও বুঝি, কিন্তু

এ-রকম চমকপ্রদ বিয়েতে বাদ সাধাও যে চরম স্বার্থপরতা। সম্পর্কটা যাতে প্রেমের সম্পর্কে দাঁড়ায়, ভাইটি মোটেই যে তা চান না, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত! বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছি, দু-জনের আলাদাভাবে দেখাসাক্ষাৎ বানচাল করে দিয়েছেন ভাইটি। আমার ওপর তোমার নির্দেশ আছে, স্যার হেনরির কাছ ছাড়া যেন না-হই। এ-নির্দেশ পালনে এমনিতে অনেক অসুবিধে আছে, তার ওপর যদি ভালোবাসাবাসির ব্যাপার এসে যায়, তাহলে ঝামেলার অন্ত থাকবে না। আমার জনপ্রিয়তা শিগগিরই ক্ষুণ্ণ হবে যদি তোমার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে তামিল করতে যাই।

সেদিন—মানে, বৃহস্পতিবার ডক্টর মর্টিমার লাঞ্চ খেয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে। লঙ ডাউনে উনি একটা কবর খুঁড়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক একটা করোটি উদ্ধার করে আনন্দে আটখানা হয়েছেন। সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে একটিই বিষয় এবং তাই নিয়ে তার উৎসাহ দেখে কে! স্টেপলটনরা পরে এলেন; স্যার হেনরির অনুরোধে ডাক্তার সবাইকে নিয়ে ইউ-বীথিতে গেলেন বিয়োগান্তক সেই রাতে কোথায় কী ঘটেছিল দেখানোর জন্যে। জায়গাটা যেন কেমনতরো বিষাদের ভার বুকে চেপে বসে। বেশ লম্বা বীথি! দু-পাশে ছাঁটা-ঝোঁপের উঁচু দেওয়াল। পথের পাশে ঘাসের সরু পটি। একদম শেষে একটা ভেঙে পড়া গ্রীষ্মবাস। মাঝামাঝি জায়গায় জলার ফটক বৃদ্ধ চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন সেখানে। সাদা কাঠের ফটক–হুড়কো লাগানো। তার ওদিকে বিশাল জলাভূমি। তোমার থিয়োরি মনে পড়ায় যা-যা ঘটেছে, তা মনে মনে ছবির মতো সাজাবার চেষ্টা করলাম। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ, হঠাৎ দেখলেন জলার ওপর দিয়ে কী যেন তেড়ে আসছে তারই দিকে। দেখেই নিঃসীম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে বে-দম হয়ে পড়লেন। সুড়ঙ্গের মতো সুদীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউ-বীথি ধরে দৌড়েছিলেন প্রাণভয়ে,

দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কিন্তু কীসের ভয়ে? কে তাড়া করেছিল? কার করাল খপ্পর থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি? জলারই কোনো ভেড়া-তাড়ানো কুকুর নয় তো? নাকি, নিঃশব্দে আবির্ভূত হয়েছিল কৃষ্ণকুটিল সেই দানব কুকুর–শরীরী প্রেত–ভয়াল-ভয়ংকর সেই প্রেতচ্ছায়া দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল স্যার চার্লসের? নরলোকের কোনো মানবের হাত নেই তো? পাণ্ডুর-মুখ মহা-হুঁশিয়ার ব্যারিমুর মুখে যা বলেছে, পেটে তার চাইতে বেশি খবর জমিয়ে রাখছে না তো? সবই কেমন যেন অস্পষ্ট, আবছা–কিন্তু অপরাধের কালো ছায়া দুলছে সব কিছুরই পেছনে।

শেষ চিঠির পর আর একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইনি ল্যাফটার হলের মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড আমাদের বাড়ি থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে ওঁর বাড়ি। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, মাথার চুল সব সাদা, মুখের রং লাল এবং একটুতেই ধাঁ করে রেগে যান। এঁর ধ্যান-ধারণায় ব্রিটিশ আইন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং সম্পত্তির বেশ খানিকটা অংশ মামলা-মোকদ্দমা করে উড়িয়েছেন। মামলা করেন স্রেফ মামলা করার জন্যে লড়ার জন্যে লড়া আর কী–ন্যায় অন্যায়ের বাছ-বিচার নেই–মিথ্যে মামলাও জুড়ে দেন স্রেফ মজা পাওয়ার জন্যে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ মজা, সন্দেহ নেই। কখনো পাঁচজনের ন্যায়সংগত রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন গোটা গ্রামটাকে আসুক কার ক্ষমতা, খুলুক এই রাস্তা। আবার কখনো নিজের হাতে অন্য লোকের গেট ছিঁড়ে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বলেন এখানে নাকি চিরকাল চলার রাস্তা ছিল–বিনা অনুমতিতে প্রবেশের জন্য যে পালটা মামলা হয়ে যেতে পারে তার ধার ধারেন না। ভদ্রলোক জমিদারের খাস-খামার সংক্রান্ত এবং জনসাধারণের ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাচীন অধিকারে মহাপণ্ডিত। জ্ঞানটা কখনো লাগানো হয় ফার্নওয়াদি গ্রামবাসীদের স্বপক্ষে, কখনো বিপক্ষে। তাই কখনো

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাকে কাঁধে নিয়ে গ্রামে শোভাযাত্রা বেরোয়। আবার কখনো সর্বশেষ কুকীর্তির দরুন কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। শোনা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে তার হাতে সাতটা মামলা ঝুলছে। সম্পত্তির বাকি অংশটুকু এই সাতটা মোকদ্দমার পেছনে ছুঁকে দেওয়ার পর আশা করা যাচ্ছে তার হুলটাও সেইসঙ্গে বিদায় নেবে এবং বাকি জীবনটা আর কারো ক্ষতি করতে পারবেন না! চরিত্রের এই মামলাবাজ দিকটা ছাড়া ভদ্রলোক এমনিতে কিন্তু অমায়িক, মনটা ভালো। আশপাশের সব প্রতিবেশীদের বিবরণ চেয়েছিলে বলেই এঁর কথা লিখলাম। এই মুহূর্তে উনি আর একটা বিচিত্র নেশায় মেতেছেন। ইনি শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বাড়ির ছাদে একটা চমৎকার টেলিস্কোপও আছে। সারাদিন এই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে জলাভূমি চষে ফেলছেন পলাতক কয়েদিকে দেখবার আশায়। উদ্যমটা কেবল এই কাজে খাটালেই সবার মঙ্গল হত, কিন্তু গুজব শোনা যাচ্ছে, উনি ডক্টর মর্টিমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। ডাক্তারের অপরাধ, লঙডাউনে কবর খুঁড়ে প্রস্তরযুগের করোটি উদ্ধার করার আগে প্রতিবেশীর সম্মতি নেননি। জীবনের একঘেয়েমি ইনি ঘুচিয়ে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত দরকার মতো হাস্যরসেরও সঞ্চার করছেন।

পলাতক কয়েদি, স্টেপলটন ভাইবোন, ডক্টর মর্টিমার এবং ল্যাফটার হলের ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের সর্বাধুনিক সংবাদ পরিবেশনের পর এদের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়ে আমার এই চিঠি শেষ করব–ব্যারিমুর দম্পতি সম্পর্কে আরও খবর এবার দিচ্ছি তোমায় বিশেষ করে কাল রাতের বিস্ময়কর ঘটনা শুনলে তুমি চিন্তার খোরাক পাবে।

প্রথমে ধরো তোমার সেই পরীক্ষামূলক টেলিগ্রামের ব্যাপারটা যেটা পাঠিয়ে তুমি জানতে চেয়েছিলে সত্যিই ব্যারিমুর বাড়ি আছে কি নেই। আগেই লিখেছি, পোস্টমাস্টারের কথাবার্তায় প্রমাণিত হয়ে গেছে, একেবারেই মাঠে মারা গিয়েছে তোমার পরীক্ষাটা। এই পরীক্ষা দিয়ে কোনোদিকেই কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। স্যার হেনরিকে বলছিলাম পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে; উনি আবার লুকোছাপার ধার ধারেন না। সটান ডেকে পাঠালেন ব্যারিমুরকে। জিজ্ঞেস করলেন, টেলিগ্রামটা সে পেয়েছে কিনা। ব্যারিমুর বললে, হ্যাঁ, পেয়েছে।

স্যার হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, ছোকরা কি তোমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল?

ব্যারিমুর যেন অবাক হয়ে গেল। একটু ভাবল।

বলল, না। আমি তখন বক্স-রুমে। আমার স্ত্রী ওপরে এনে দিয়েছিল আমার হাতে।

জবাব তুমি নিজে দিয়েছিলে?

না। স্ত্রীকে বলেছিলাম কী জবাব দিতে হবে, ও নীচে গিয়ে লিখে নিয়েছিল।

সন্ধেবেলা ফের নিজেই এল বিষয়টা নিয়ে।

বললে, স্যার হেনরি, সকালবেলা কেন অত কথা জিজ্ঞেস করলেন বুঝলাম না। আপনার বিশ্বাস হারানোর মতো কোনো অপরাধ করেছি কি?

সে-রকম কিছুই নয় বুঝিয়ে বললেন স্যার হেনরি। ঠান্ডা করার জন্যে নিজের কিছু জামাকাপড়ও দান করলেন লন্ডন থেকে নতুন বেশভূষা এসে যাওয়ায় পুরোনো পরিচ্ছদের আর প্রয়োজন ছিল না।

মিসেস ব্যারিমুর আমার কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছে। ভারী চেহারা, নিরেট ব্যক্তিত্ব, কখনো মাত্রা ছাড়ায় না, অতিশয় সচ্চরিত্রা, এবং নীতিনিষ্ঠতার দিকে প্রবণতা আছে! এর চাইতে কম আবেগশূন্য মানুষ তুমি আর পাবে না। তা সত্ত্বেও, আগেই লিখেছি তোমায়, যেদিন পা দিলাম এ-বাড়িতে সেই রাতেই তাকে ফুঁপিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদতে শুনেছি আমি। তারপরেও একাধিকবার চোখে-মুখে অশ্রুর দাগ লক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে হয়তো কোনো পুরোনো অপরাধের কথা ভুলতে পারছে না বলেই লুকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে; আবার কখনো সন্দেহ হয় ব্যারিমুরকে, বউকে যন্ত্রণা দেয় না তো? বরাবরই লোকটার স্বভাব-চরিত্র আমার কাছে কীরকম যেন অস্বাভাবিক এবং সন্দেহজনক মনে হয়েছে, কাল রাত্রের অ্যাডভেঞ্চারের পর তুঙ্গে পৌঁছেছে আমার সন্দেহ।

এমনও হতে পারে ব্যাপারটা হয়তো নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। তুমি তো জান ঘুমটা আমার কোনোকালেই খুব গাঢ় নয়, এ-বাড়ির পাহারায় মোতায়েন হওয়ার পর থেকে আরও পাতলা হয়ে এসেছে রাতের নিদ্রা। কাল রাত প্রায় দুটোর সময়ে ঘুম ছুটে গেল আমারই

দরজার বাইরে পা টিপে টিপে চলার আওয়াজে। উঠে পড়লাম, দরজা খুললাম এবং উঁকি মারলাম। দেখলাম, একটা লম্বা কালো ছায়া লুটিয়ে চলেছে করিডর বরাবর। যার ছায়া, সেই লোকটি আলতো পায়ে হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে হাঁটছে। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার্স–পায়ে চটি বা জুতো কিছুই নেই। শুধু দেহরেখাটুকু দেখলাম বটে, কিন্তু উচ্চতা দেখে বুঝলাম ব্যারিমুর। খুব আস্তে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে হাঁটছে এবং সমস্ত ভঙ্গিমাটার মধ্যে একটা তীব্র অপরাধবোধ আর গোপনতা অবর্ণনীয়ভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি তোমাকে, করিডরটা শেষ হয়েছে হল ঘরের মাথায় চারদিক-ঘেরা রেলিং দেওয়া বারান্দায় এবং আবার শুরু হয়েছে অন্যদিক থেকে। চোখের আড়ালে না-যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়ালাম। তারপর ফের পেছন নিলাম। বারান্দা ঘুরে আসবার পর দেখলাম ওদিককার করিডরের প্রান্তে সে পৌঁছে গেছে এবং একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, সারি সারি ঘরের একটায় সে ঢুকেছে। কেউ থাকে না এসব ঘরে, আসবাবপত্রও নেই তাই লোকটার এহেন অভিযান আরও রহস্যজনক মনে হল। আলো নড়ছে না অর্থাৎ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিমুর। নিঃশব্দে করিডর পেরিয়ে এলাম, খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

কাচের শার্সির গায়ে মোমবাতি ধরে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ব্যারিমুর। মুখখানা অর্ধেক ঘোরানো আমার দিকে এবং জলার অন্ধকারের পানে চেয়ে থাকার ধরন দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুর প্রত্যাশায় রয়েছে–আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে মুখ। বেশ কয়েক মিনিট নিবিড়ভাবে জমাট অন্ধকারের বুকে চেয়ে রইল সে। তারপর অধীরভাবে গুঙিয়ে

উঠে নিভিয়ে দিল মোমবাতি। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলাম আমার ঘরে এবং তার একটু পরেই আবার আমার ঘরের সামনে পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল কানে। তার অনেকক্ষণ পরে যখন তন্দ্রার মতন এসেছে, কোথায় যেন তালার ফোকরে চাবি ঘোরানোর ক্লিক আওয়াজ শুনলাম কিন্তু ঠাহর করতে পারলাম না কোনদিক থেকে এল শব্দটা। মানে কী এসবের, মাথায় আসছে না। শুধু এটুকু বুঝছি বিষাদঘেরা এই পুরীতে চোখের অন্তরালে একটা গোপন কারসাজি চলছে; আজ হোক কাল হোক–এই ষড়যন্ত্রের শেষ আমাদের দেখতেই হবে। তুমি তো শুধু ঘটনা চেয়েছ আমার কাছ থেকে কাজেই অনুমতির বোঝা আর তোমার মাথায় চাপাব না। আজ সকালে স্যার হেনরির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গত রাতে আমি যা দেখেছি তার ভিত্তিতে একটা অভিযানের পরিকল্পনা আমরা স্থির করেছি। এখন সে-সম্পর্কে কিছু বলব না। তবে এর ফলে আমার পরবর্তী রিপোর্ট পড়ায় অনেক বেশি আগ্রহ পাবে।

ডক্টর ওয়াটসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট : জলায় আলো

বাস্কারভিল হল, পনেরোই অক্টোবর

ভায়া হোমস,

আমার এই দৌত্য-পর্বের প্রথম দিকে খুব একটা খবর তোমায় দিতে পারিনি। সময় যা নষ্ট করেছি, এখন তা পূরণ করে দিচ্ছি। ঘটনা এখন পরপর ঘটছে এবং ভিড় করে আসছে চারপাশে। আমার গত চিঠি শেষ করেছিলাম জানলায় ব্যারিমুরের রহস্যজনক দাঁড়িয়ে থাকা দিয়ে। এবার যে ঘটনা-ফর্দ হাতে এসেছে, আমি জানি তা শুনলে তুমি দারুণ অবাক হয়ে যাবে। ঘটনাস্রোত যে এইভাবে মোড় নেবে, ভাবতে পারিনি। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে একদিক দিয়ে ঘটনামালা যেমন অধিকতর স্বচ্ছ হয়েছে, আর একদিক দিয়ে তেমনি আরও জটিল হয়েছে। যাই হোক, সব বলব তোমাকে, বিচার যা করবার তুমিই করবে।

ব্যারিমুর যে-ঘরে আগের রাতে ঢুকেছিল, নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের পরের দিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার আগে করিডর দিয়ে গিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করলাম সেই ঘরটা। লক্ষ করলাম, পশ্চিমের যে-জানলা দিয়ে জলার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল ব্যারিমুর, এ-বাড়ির অন্য জানলা থেকে সে-জানলার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে–জলার খুব কাছের চেহারা এখান থেকে দেখা যায় না। অন্য যেকোনো জানলায় দাঁড়ালে চোখে

পড়ে জলার দূরের দৃশ্য। কিন্তু এ-জানলায় দাঁড়ালে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে জলার ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : ব্যারিমুর জানে এ-জানলায় দাঁড়ালে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে; তার মানে নিশ্চয় জলার বুকে কিছু বা কাউকে দেখার আশায় সে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেবে পেলাম না, ওইরকম নিকষ কালো রাতে কাউকে দেখতই-বা কী করে। গোপন প্রেমের ষড়যন্ত্র চলেছে বোধ হয়। চোরের মতো পা টিপে টিপে যাওয়া এবং স্ত্রী বেচারার কান্নাকাটির এইটাই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। লোকটার চেহারায় আকর্ষণ আছে, যেকোনো গ্রাম্যবালার মন কেড়ে নেওয়ার মতো। অনুমিতিটাও সেই কারণে খাপ খেয়ে যাচ্ছে মনে হল! আমি ঘরে ফিরে আসার পর তালার ফোকরে চাবি ঘোরানোর আওয়াজ শুনেছিলাম। অর্থাৎ, ব্যারিমুর গোপন অভিসারে বেরিয়েছিল নিশ্চয়। এইভাবেই মনে মনে যুক্তিতর্ক করলাম সকালবেলা। সন্দেহ কোনদিকে বইছে, তাও শুনলে। শেষকালে অবশ্য কোনো সন্দেহই ধোপে টেঁকেনি।

ব্যারিমুরের রহস্যজনক গতিবিধির ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, আমি দেখলাম ব্যাপারটা চেপে রাখতে গিয়ে পুরো দায়িত্ব আমাকেই নিতে হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যাও আমার জানা নেই। তাই আর পারলাম না। প্রাতরাশ খাওয়ার পর স্যার হেনরির পড়ার ঘরে গিয়ে বললাম আমি কী দেখেছি! যতটা অবাক হবেন ভেবেছিলাম, দেখলাম ততটা হলেন না।

বললেন, ব্যারিমুর যে রাতবিয়েতে বাড়িতে টহল দেয়, আমি তা জানি। ওকে এ নিয়ে জিজ্ঞেসও করব ভাবছিলাম। আপনি যে সময়ের কথা বললেন, ঠিক ওই সময়ে বার দু-তিন ওর আসা যাওয়ার শব্দ আমি শুনেছি।

তাহলে বোধ হয় রোজ রাতে বিশেষ ওই জানলার সামনেই যায়। বললাম আমি।

বোধ হয় যায়। তাই যদি হয়, পেছন পেছন গিয়ে দেখব ও কী করে সেখানে। আপনার বন্ধু হোমস এখানে থাকলে কী করতেন বলুন দিকি?

আপনি যা বললেন, আমার মনে হয় ঠিক তাই করত। ব্যারিমুরের পেছন পেছন গিয়ে দেখত কী করে সে।

তাহলে আমরাও তাই করব।

কিন্তু ও তো পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলবে।

লোকটা কানে একটু কালা। সে যাই হোক, ঝুঁকি একটু নিতেই হবে। আজ রাতে আমার ঘরে বসব দু-জনে। পায়ের আওয়াজ পেলেই পেছন ধরব। আনন্দে দু-হাত ঘষলেন স্যার হেনরি। জলার শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য হিসেবে মনে মনে তিনি যে এখন অ্যাডভেঞ্চার চাইছেন, স্পষ্ট বুঝলাম তাঁর আনন্দ দেখে।

স্যার চার্লসের নির্দেশে নকশা যিনি এঁকেছিলেন সেই স্থপতির সঙ্গে পত্রালাপ করছিলেন স্যার হেনরি। লন্ডনের এক কনট্রাকটরের সঙ্গেও পত্র-বিনিময় চলছিল। শিগগিরই বিরাট পরিবর্তন দেখা যাবে এ-অঞ্চলে। প্লিমাউথ থেকে ডেকরেটর আর আসবাবপত্র নির্মাতা আসছে। বন্ধুটির মাথার ভেতরে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা ঘুরছে নিশ্চয়। ফ্যামিলির হৃত

গৌরব ফিরিয়ে আনতে অর্থ বা সামর্থ্যর কার্পণ্য করবেন না। মেরামতের পর বাড়ি নতুন চেহারা নিলে এবং ঘরে ঘরে হালফ্যাশানের আসবাবপত্র এসে গেলে বাকি থাকবে একজন স্ত্রী–তাহলেই সম্পূর্ণ হবে সব আয়োজন। শুধু তোমাকেই বলছি, গিন্নীর যে অভাব হবে না, তার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা শুধু রাজি হলেই হয়। সুন্দরী প্রতিবেশিনী মিস স্টেপলটনকে দেখে স্যার হেনরি যেমন মোহিত হয়েছেন, নারী সন্দর্শনে সেভাবে মোহিত হতে কোনো পুরুষকে খুব একটা এর আগে দেখিনি। তবে কী জানো, খাঁটি প্রেম কখনো মসৃণ পথে যায় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এঁদের ভালোবাসাও অনেক বাধা পাবে। যেমন ধরো, আজ সকালে একটা বাধা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে যে যুগপৎ বিষম বিরক্তি এবং পরে পড়েছেন আমাদের বন্ধু।

ব্যারিমুর সম্পর্কে কথাবার্তার পর মাথায় টুপি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি। যথারীতি আমিও উঠলাম।

বিচিত্র চাহনি নিক্ষেপ করলেন স্যার হেনরি। বললেন, ওয়াটসন, আপনি আসছেন নাকি?

জলার দিকে যদি যান, তাহলে আসব।

তাই তো যাচ্ছি।

জানেন তো কী নির্দেশ আছে আমার ওপর জোর করে যাচ্ছি বলে দুঃখিত। কিন্তু কী করব বলুন। আপনি নিজে শুনেছেন, পইপই করে হোমস আমাকে আপনার সঙ্গ ছাড়া হতে বারণ করেছে বিশেষ করে জলায় আপনাকে একা ছাড়া একেবারেই বারণ।

স্মিতমুখে আমার কাঁধে হাত রাখলেন স্যার হেনরি।

বললেন, ভায়া, হোমস কিন্তু আমি জলায় পা দেওয়ার পর কী কী ঘটবে সেটা কী করে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করবেন বলুন? বুঝেছেন কী বলছি? আমি জানি অন্য লোকের আনন্দ উপভোগে বাধা আর যেই দিক, আপনি অন্তত দেবেন না। একাই যাব আমি।

বিষম বিড়ম্বনায় পড়লাম। কী করা উচিত অথবা কী বলা উচিত, ভেবে পেলাম না। মনস্থির করার আগেই উনি বেতের ছড়ি আর টুপি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরে যখন ভাবতে বসলাম, বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে পড়লাম। কোনো ছলছুতোতেই তাকে আমার চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। তোমার নির্দেশ অমান্য করার ফলে যদি কোনো শোচনীয় ঘটনা ঘটে যায়, তখন কী মুখে তোমার সামনে ফিরব ভেবে গাল লাল হয়ে গেল আমার। খুব দেরি হয়নি যদিও, এখনও বেরিয়ে পড়লে নাগাল ধরে ফেলা যাবে। তাই তাড়াতাড়ি রওনা হলাম মেরিপিট হাউস অভিমুখে।

হন হন করে এলাম বটে, কিন্তু রাস্তায় কোথাও স্যার হেনরিকে দেখলাম না। জলার রাস্তা মূল রাস্তা থেকে যেখানে বেরিয়েছে, সেখানে পৌঁছে ভাবলাম হয়তো ভুল পথে

চলেছি। তাই একটা পাহাড় বেয়ে উঠলাম ওপর থেকে দেখে নেব বলে। এই সেই পাহাড় যেখানে পাথর খাদ খুঁড়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানবরা। এই পাহাড়ের ওপর থেকেই দেখতে পেলাম ওঁকে। প্রায় সিকি মাইল দূরে জলার রাস্তায় হাঁটছেন, পাশে একজন ভদ্রমহিলা মিস স্টেপলটন ছাড়া কেউ নন। স্পষ্ট বোঝা গেল, দু-জনের মধ্যে এর মধ্যেই একটা সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছে এবং দিন-ক্ষণ-স্থান ঠিক করেই তবে দু-জনে এসেছেন দেখা করতে। গভীর কথোপকথনে নিমগ্ন দু-জনে, হাঁটছেন ধীর চরণে। মিস স্টেপলটনের দ্রুত হাত নাড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাকুলভাবে কী বোঝাতে চাইছেন, তন্ময় হয়ে শুনছেন স্যার হেনরি, দু-একবার যেন কথা একেবারেই মনঃপূত না-হওয়ায় মাথা নাড়লেন। পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম দু-জনকে। আমার তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কী যে করব, ভেবে পাচ্ছি না। মূর্তিমান উৎপাতের মতন ওদের কথার মাঝে আবির্ভূত হওয়া যায় না, অথচ ওঁকে চোখের আড়াল হতে দিতে বিবেকের সায় নেই। মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির অন্তরাল হতে দেব না এই তত আমার সুস্পষ্ট কর্তব্য। বন্ধুর ওপর গুপ্তচরের মতন নজর রাখাটাও ঘৃণ্য ব্যাপার। শেষকালে দেখলাম, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁকে নজরবন্দি রাখা ছাড়া আর পথ নেই, পরে না হয় অকপটে সব স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিবেককে ঠান্ডা করা যাবে। এটাও ঠিক যে আচম্বিতে কোনো বিপদ এসে হাজির হলে এতদূর থেকে আমি কিসু করতে পারব না। তবে আমার অসুবিধেটা তুমি নিশ্চয় উপলব্ধি করবে। এ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার।

ভদ্রমহিলা এবং স্যার হেনরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়ে গভীর আলোচনায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন, সহসা আমি সচেতন হলাম আর একজনের উপস্থিতিতে। বিজনে দু-জনের

মিলনের সাক্ষী কেবল আমিই নই, আর একজন রয়েছেন। শূন্যে ভাসন্ত সবুজ আটির মতো কী যেন একটা চোখের কোণে ভেসে উঠল। ভালো করে তাকাতেই দেখি জিনিসটা উড়ছে একটা লাঠির ডগায় এবং লাঠিটা বয়ে নিয়ে ভাঙা জমির ওপর হাঁটছে একটা লোক। প্রজাপতির জাল নিয়ে চলেছেন স্টেপলটন। আমার চেয়ে উনি যুগলমূর্তির অনেক নিকটে এবং মনে হল হাঁটছেনও সেইদিকে। ঠিক সেই সময়ে আচমকা স্যার হেনরি মিস স্টেপলটনকে পাশে টেনে নিলেন এবং আলিঙ্গন বদ্ধ করলেন। মিস স্টেপলটনকে মনে হল মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন গায়ের জোরে। স্যার হেনরির মাথা ঝুঁকে পড়ল তাঁর মাথার ওপর, এক হাত তুলে যেন প্রতিবাদ জানালেন মিস স্টেপলটন। পরমুহূর্তেই দেখলাম প্রিংয়ের পুতুলের মতো দু-জন দু-দিকে ছিটকে গেলেন এবং বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন। বাধা পড়েছে স্টেপলটনের জন্যে। পাগলের মতো ভদ্রলোক দৌড়োচ্ছেন এঁদের দিকে–উদ্ভট জালটা দুলছে পেছনে। অঙ্গভঙ্গি করে বিষম উত্তেজনায় প্রায় নাচতে লাগলেন প্রেমিকযুগলের সামনে। দৃশ্যটার মানে কী হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। শুধু মনে হল, স্যার হেনরিকে গালাগাল দিচ্ছেন স্টেপলটন, বোঝাতে চেষ্টা করছেন স্যার হেনরি, স্টেপলটন বুঝতে চাইছে না, আর খেপে যাচ্ছেন স্যার হেনরি! পাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা উদ্ধত, নীরব। অবশেষে বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন স্টেপলটন, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে ডাকলেন বোনকে। স্যার হেনরির পানে দোনামোনা চোখে বারেক তাকিয়ে ভাইয়ের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন বোন। প্রকৃতিবিদের রাগত অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা গেল অসন্তোষের আওতায় ভদ্রমহিলাও রয়েছেন। মিনিটখানেক সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যারনেট। যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে ফিরে চললেন–মূর্তিমান বিষাদ যেন।

মানে কী এসবের, মাথায় এল না। তবে বন্ধুর অজ্ঞাতসারে এইরকম একটা ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে ফেলার জন্যে লজ্জা পেলাম। দৌড়ে নেমে এলাম পাহাড় থেকে, সানুদেশে। দেখা হয়ে গেল ব্যারনেটের সঙ্গে। মুখ ক্রোধারুণ, ললাটে কুটি–কী করা উচিত যেন ভেবে পাচ্ছে না।

বললে, আরে ওয়াটসন যে! আকাশ থেকে পড়লেন নাকি? বারণ করা সত্ত্বেও পেছন পেছন এসেছেন মনে হচ্ছে?

খুলে বললাম সব কিছু; ওঁকে একলা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে না-পেরে কীভাবে পেছন পেছন ছুটে এসেছিলাম এবং না-দেখতে পেয়ে পাহাড়ে উঠে কী কী দেখে ফেলেছি–সব বললাম। মুহূর্তের জন্য দপ করে জ্বলে উঠলেন বটে, কিন্তু আমার প্রাণখোলা স্বীকারোক্তিতে রাগ জল হয়ে গেল নিমেষে; হাসলেন–অন্তরের জ্বালা ফুটে উঠল সেই হাসিতে।

বললেন, মানুষমাত্রই আশা করে এ-রকম একটা খাঁ-খাঁ মাঠের মাঝে গিয়ে অন্তত কিছু প্রাইভেট কথা বলা যাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! গোটা অঞ্চলটা দেখছি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমার প্রেমনিবেদন দেখতে তার ওপর এইরকম একটা যাচ্ছেতাই প্রেম নিবেদন। কোন সিটে বসেছিলেন?

আমি ছিলাম ওই পাহাড়ে।

একেবারে পেছনের সিটে দেখছি! ভাইটা তো দেখলাম একেবারে সামনের সিটে! কীভাবে তেড়ে এল দেখেছেন?

হ্যাঁ দেখেছি।

মাথায় ছিট-টিট কখনো দেখেছিলেন? ভাইটার কথা বলছি।

আগে তো কখনো দেখিনি।

আমিও দেখিনি। সুস্থমস্তিষ্ক বলেই ভেবেছিলাম–আজকে দেখি মোটেই তা নয়–হয় আমার আর না হয় ওর পাগলা গারদে যাওয়া দরকার। আমার মধ্যে কোনো গোলমাল কি দেখেছেন? বেশ কয়েক সপ্তাহ একসঙ্গে তো কাটালেন। স্পষ্ট বলুন ওয়াটসন! যে-নারীকে ভালোবাসি, তার স্বামী হওয়ার মতো অযোগ্যতা কি আমার মধ্যে দেখেছেন?

না, একেবারেই না।

আমার পার্থিব সম্পদ নিয়ে নিশ্চয় আপত্তি ওঠে না–উঠেছে আমাকে নিয়েই। আমার দোষটা কী দেখেছে বলতে পারেন? চেনাজানা কাউকে ইহজীবনে আঘাত দিইনি। তা সত্ত্বেও বোনের আঙুল পর্যন্ত ছুঁতে দেবে না আমাকে!

তাই বললেন নাকি?

শুধু তাই নয়, আরও অনেক কথা। ওয়াটসন, ক-দিনই বা দেখেছি ভদ্রমহিলাকে কিন্তু প্রথম থেকেই মনে হয়েছে ওঁর সৃষ্টি হয়েছে আমার জন্যে উনি নিজেও তা বুঝেছেন, বুঝেছেন বলেই আমার সঙ্গসুখ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন আমি তা বুঝি। মেয়েদের চোখে এমন একটা স্ফুলিঙ্গ আছে যা মুখের কথার চেয়ে বেশি কথা বলে। কিন্তু কিছুতেই দু-জনকে কাছাকাছি হতে দেবেন না ভাই ভদ্রলোক। আজকেই কেবল একটা সুযোগ পেয়েছিলাম নিরালায় দুটো কথা বলবার: আমার সঙ্গ পেয়ে কী খুশিই-না হলেন উনি, কিন্তু আরম্ভ করলেন একেবারেই অন্য কথা–ভালোবাসার কথার ধার দিয়েও গেলেন না বরং আমি তা বলতে গেলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বার বার বলতে লাগলেন একটাই কথা। এ-জায়গা নাকি সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমি এখান থেকে না-যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাবেন না। আমি বললাম, তাকে দেখবার পর থেকে এত তাড়াতাড়ি এ-জায়গা ছেড়ে যাবার কোনো বাসনাই আমার নেই; তবে হ্যাঁ যেতে পারি যদি উনিও আমার সঙ্গে যান–এ ছাড়া স্থানত্যাগ কোনোমতেই সম্ভব নয়। এর পর যথাসম্ভব গুছিয়ে বললাম, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। উনি জবাব দেওয়ার আগেই পাগলের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে কোত্থেকে এসে গেলেন এই ভাইটা। মুখের চেহারাও দেখলাম বদ্ধ উন্মাদের মতন। রাগের চোটে বিলকুল সাদা, দাউ দাউ করে যেন আগুন জ্বলছে হালকা রঙের দু-চোখে। কী করেছি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে? আমার সাহস তো কম নয়? কার মন কাড়ার চেষ্টা আমি করেছি? আমার কি জানা নেই এ-জিনিস ভদ্রমহিলা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না? কী ভেবেছি আমি? ব্যারনেট বলে যা খুশি করব? সহোদর যদি না-হতেন, ভদ্রলোককে জবাব দিতে হয় কী করে, সেটা দেখিয়ে দেওয়া

যেত। যাই হোক, বললাম তার সহোদরার প্রতি আমার আবেগে অনুভূতির জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত আমি নই এবং আমি আশা করি আমার স্ত্রী হয়ে আমাকে উনি সম্মানিত করবেন। এই কথার পরেও যখন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল না, আমিও মেজাজ খারাপ করে ফেললাম, গরম গরম দু-চার কথা শুনিয়ে দিলাম–ভদ্রমহিলা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই চুপচাপ থাকাটা ঠিক মনে করলাম না। ফলটা হল কী আপনি দেখলেন। বোনকে নিয়ে বিদেয় হলেন ভাই। আর ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি চলেছি আমার পথে–এ-রকম শোচনীয় অবস্থা এ-তল্লাটে আর কারো হয়েছে বলে মনে হয় না। ওয়াটসন, বলুন দিকি এর মানে কী–বলুন চিরকাল ঋণী থাকব আপনার কাছে।

দু-একটা ব্যাখ্যা হাজির করবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সুবিধে করতে পারলাম না। কেননা আমি নিজেই রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছি। খেতাব, সম্পত্তি, বয়স, চরিত্র এবং আকৃতি–সবই বন্ধুটির পক্ষে। বিপক্ষে আছে এমন কিছুই আমার জানা নেই, বংশের দুর্ভাগ্যকে যদি ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। ভদ্রমহিলার ইচ্ছে অনিচ্ছের পরোয়া না-করেই বন্ধুর প্রস্তাব এইভাবে প্রত্যাখ্যান এবং বিনা প্রতিবাদে ভদ্রমহিলারও সব মেনে নেওয়া সত্যিই চরম বিস্ময়কর। যাই হোক, আন্দাজ আর অনুমানের অবসান ঘটালেন স্টেপলটন নিজেই এলেন সেইদিনই বিকেলে। রুক্ষ ব্যবহারের জন্য মাপ চাইতে এসেছেন উনি। স্যার হেনরির সঙ্গে পড়ার ঘরে প্রাইভেট কথাবার্তা বললেন দীর্ঘক্ষণ। বেরিয়ে আসার পর বোঝা গেল, ক্ষত নিরাময় হয়েছে। হৃদ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ পরের সপ্তাহে রাতের আহার করতে যাব মেরিপিট হাউসে।

স্যার হেনরি বললেন, স্টেপলটন ছিটগ্রস্ত নন, এখনও কিন্তু তা বলব না। আজ সকালেই যেভাবে তেড়ে এসেছিলেন এবং চোখের যে-চেহারা দেখিয়েছিলেন, কোনোদিন তা ভুলব না। তবে এটাও মানতে হবে, এমন সুন্দরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও কাউকে দেখিনি।

অভব্য আচরণের কারণ দর্শিয়েছেন।

বললেন, সহোদরাই ওঁর জীবনের সব কিছু। খুবই স্বাভাবিক, বোনের মূল্যায়ন করতে পেরেছেন দেখে খুশিই হলাম। চিরটাকাল একসাথে থেকেছেন দু-জনে। বোন না-থাকলে উনি বড়ো নিঃসঙ্গ। তাই বোনকে হারাতে হবে ভাবলেই মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। আমি যে তাঁর বোনের প্রতি অনুরক্ত হয়েছি, উনি বোঝেননি। তাই স্বচক্ষে তা দেখে যখন খেয়াল হল বোনকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবেই, এমন মারাত্মক মানসিক আঘাত পেলেন যে, কী বলেছেন অথবা করেছেন তার জন্যে তাকে সেই মুহূর্তের জন্যে দায়ী করা চলে না। যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। এটাও উপলব্ধি করেছেন যে ওঁর সহোদরার মতন পরমাসুন্দরীকে নিজের কাছে সারাজীবন ধরে রেখে দেওয়ার কল্পনাও কতখানি বোকামি বা স্বার্থপরতা। বোনকে যদি কাছছাড়া করতেই হয়, তবে আমার মতো প্রতিবেশীর জন্যেই তা করবেন আর কারো জন্যে নয়। কিন্তু ওঁকে সময় দিতে হবে। এই আঘাত সামলে নিতে, মনকে প্রস্তুত করতে বেশ কিছু সময় ওঁকে দিতে হবে। উনি কোনো বাধাই দেবেন না। যদি আমি কথা দিই তিন মাস আর এগোব না; এই তিন মাস কেবল ভদ্রমহিলার বন্ধু হয়ে থাকব, প্রেমের কথা একদম বলব না। আমি কথা দিয়েছি। কাজেই ঝামেলার নিষ্পত্তি ঘটেছে।

একটা ছোট্ট রহস্য তাহলে পরিষ্কার হল। আমরা যেন পাঁকের গর্তে হাতড়ে মরছি, তলদেশে হাত ঠেকল এইমাত্র। এখন বুঝছি, স্যার হেনরির মতো যোগ্য পাত্রও সহোদরার প্রতি আকৃষ্ট হলে কেন চটে যেতেন স্টেপলটন। জটপাকানো সুতো টেনে সোজা করছি, নিশীথ রাত্রে ফুঁপিয়ে কান্না, মিসেস ব্যারিমুরের অশ্রুকলঙ্কিত মুখ এবং পশ্চিমের জানলায় খাস ভৃত্যের গোপন অভিযানের রহস্য এবার ব্যাখ্যা করছি। ভায়া হোমস, অভিনন্দন জানাও আমাকে, প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে যে হতাশ করিনি, তা স্বীকার করে। আমাকে এখানে পাঠিয়ে যে-আস্থা আমার প্রতি দেখিয়েছ, তার জন্যে যে তোমাকে পরিতাপ করতে হচ্ছে না, তা এবার মুখ ফুটে বলো। এতগুলো রহস্য একরাতেই সাফ করে দিয়েছি।

এক রাতে বললাম বটে, আসলে দুটো রাত লেগেছে; কেননা, প্রথম রাতটা স্রেফ ফক্কা হাতে ফিরতে হয়েছে। স্যার হেনরির ঘরে রাত তিনটে পর্যন্ত বসেই রইলাম, কিন্তু সিঁড়ির ওপরকার টাইমিং ক্লকে একই সুরে মিলানো ঐকতান বাজনা ছাড়া আর কিছু শুনলাম না। বড়ো বিষণ্ণ এই জাগরণের অবসান ঘটল চেয়ারে বসেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায়। দু-জনেই ঘুমোলাম অকাতরে। কপাল ভালো, হতাশ হইনি কেউই। পণ করলাম, আবার রাত জাগব। পরের রাতে লক্ষ কমিয়ে রেখে নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চললাম। সময় যে এত মন্থরগতি, বিশ্বাস করাই যেন যায় না। তা সত্ত্বেও বসে রইলাম ঝানু শিকারির মতন ফাঁদে শিকার পড়তে চলেছে, এই প্রতীক্ষায় শিকারি যেভাবে উন্মুখ হয়ে থাকে, আমরাও বসে রইলাম সেইভাবে। একটা বাজল, দুটো বাজল, নিঃসীম হতাশায় দ্বিতীয়বারের মতোও হাল ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে দু-জনেই সটান

খাড়া হয়ে বসলাম চেয়ারে, ফের সজাগ হয়ে উঠল ক্লান্ত ইন্দ্রিয়গুলো। অলিন্দপথে পা ফেলার মচাৎ শব্দ শুনেছি দু-জনেই।

কান খাড়া করে শুনলাম, মার্জারের মতো লঘু চরণের পদধ্বনি দরজার সামনে দিয়ে গিয়ে বিলীন হল দূরে। উঠে দাঁড়ালেন ব্যারনেট, আলতোভাবে খুললেন দরজা, শুরু হল অনুসরণপর্ব গ্যালারি ঘুরে ছায়ামূর্তি ওদিককার অন্ধকার গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। পা টিপে টিপে এলাম ওদিককার মহলে। পলকের জন্য দেখলাম দীর্ঘকায়, কালো দাড়িওয়ালা একটা মূর্তি পা টিপে টিপে চলছে অলিন্দ বরাবর দু-কাঁধ গোল হয়ে গিয়েছে অতি সাবধানতার দরুন। পরমুহূর্তেই সেই বিশেষ দরজা দিয়ে ভেতরে অন্তর্হিত হল সে, ভেতরকার আলোয় আলোকিত দরজার ফ্রেমটা কেবল স্পষ্ট হয়ে রইল অন্ধকারের বুকে, একটিমাত্র হলুদ রশ্মি এলিয়ে রইল বিষণ্ণ করিডরের কালো বুকে। সতর্কভাবে এগিয়ে চললাম সেইদিকে, প্রতি পদক্ষেপে ভয় হল এই বুঝি আর্তনাদ করে উঠবে পায়ের তলার তক্তা। ভয়ের চোটে ভর দিতেও পারছি না তক্তায়–পা ফেলার আগে পা দিয়ে টিপে পরখ করে নিচ্ছি আওয়াজ হয় কিনা। যদিও বুট খুলে এসেছি, তবুও পুরোনো তক্তা মচ মচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে ছাড়ল না পায়ের তলায়। মাঝে মাঝে মনে হল, এত আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ব্যারিমুর, হতেই পারে না। সৌভাগ্যক্রমে লোকটা কানে বেশ খাটো, তার ওপরে নিজের কাজেই তন্ময়। অবশেষে পৌঁছোলাম দরজাটার সামনে। উঁকি মারলাম। দেখলাম, গত দু-রাতের মতো আজও সে জানলার সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ধরে সাগ্রহে সাদা মুখখানা চেপে রয়েছে শার্সির কাঁচে।

অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করা ছিল না, কিন্তু ব্যারনেটের স্বভাবই হল যা করবেন, একেবারে সোজাসুজি করবেন। সোজা পথের মানুষ বলতে যা বোঝায় আর কী, গটমট করে ঘরে ঢুকলেন উনি। ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে সশব্দে শ্বাস টেনে জানলার সামনে থেকে ছিটকে সরে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল ব্যারিমুর। মুখ তো নয়, যেন সাদা মুখোশ। জ্বলজ্বলে দুই কালো চোখে বিমূর্ত আতঙ্কে এবং বিস্ময় নিয়ে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টি বুলোতে লাগল আমার এবং স্যার হেনরির ওপর।

ব্যারিমুর, কী করছ এখানে?

কিছু না, স্যার, অপরিসীম উত্তেজনার দরুন ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। সে, কম্পিত মোমবাতির কম্পমান আলোয় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে নিজেরই ছায়া। এই জানলাটা, স্যার। রাতে ঘুরে ঘুরে দেখি সব জানলা বন্ধ আছে কিনা।

দোতলার জানলাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব জানলা।

কড়া গলায় বললেন স্যার ব্যারিমুর, আসল কথাটা আজ তোমার মুখ থেকে বার করব বলেই এসেছি। ঝামেলা বাড়িয়ো না। যত তাড়াতাড়ি পারে বলে ফেলল। বললা। একদম মিথ্যে বলবে না! কী করছিলে জানলায়?

অসহায় চোখে আমাদের পানে চেয়ে এমনভাবে দু-হাত মোচড়াতে লাগল লোকটা, যেন দ্বিধা আর দুর্দশার শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে।

কোনো অনিষ্ট করিনি, স্যার। জানলায় মোমবাতি ধরেছিলাম।

জানলায় কেন মোমবাতি ধরেছিলে?

আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যার হেনরি–আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না! বিশ্বাস করুন, গোপন এই রহস্যটা আমার নয়, কাজেই আমার মুখ দিয়ে তা ফাঁস হবে না। ব্যাপারটা যদি শুধু আমারই হত, আর কেউ যদি এতে জড়িয়ে না-থাকত, আপনার কাছে নিশ্চয় লুকোতাম না।

হঠাৎ একটা ব্যাপার মাথায় খেলে গেল। জানলার গোবরাটে মোমবাতি রেখেছিল ব্যারিমুর। আমি গিয়ে তুলে নিলাম।

বললাম, নিশ্চয় সংকেত করছিল কাউকে। দেখি জবাব পাওয়া যায় কিনা।

যেভাবে ও ধরেছিল মোমবাতি, আমিও ধরলাম সেইভাবে, দৃষ্টি প্রসারিত করলাম নিশীথ রাতের বুকে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে, তাই আবছামতো কালো গাছের রেখা আর তার চাইতে হালকা রঙের জলার আদিগন্ত বিস্তৃতি অস্পষ্টভাবে ভাসছে সামনে। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম সোল্লাসে। অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ফুটে সহসা জাগ্রত হয়েছে পিনের ডগার

মতো একটা হলুদ আলো–অনির্বাণভাবে জ্বলছে জানলার ফ্রেমের চৌকোনো কালো পটভূমিকায়।

ওই তো। বললাম চেঁচিয়ে।

না, না, স্যার, ও কিছু নয়–কিছু নয়, ভেঙে পড়ল খাসভৃত্য, বিশ্বাস করুন, স্যার—

ওয়াটসন, জানলার সামনে আলোটা নাড়ান। চিৎকার করে বললেন ব্যারনেট। দেখুন, ও-আলোটাও নড়ছে। বদমাশ কোথাকার, সংকেত ছাড়া এটা কী? আর অস্বীকার করতে পারবে? বলো, আর কেন? মুখ খোলো এবার! স্যাঙাতটা কে? কী ষড়যন্ত্র চলছে এখানে?

অবাধ্যতা এবার খোলাখুলিভাবে ফুটে উঠল ব্যারিমুরের মুখে। ব্যাপারটা আমার, আপনার নয়। আমি বলব না।

তাহলে আমার চাকরি তোমায় এখুনি ছাড়তে হবে।

খুব ভালো কথা, স্যার। একান্তই যদি ছাড়তে হয়, ছাড়ব বই কী।

এবং চরম অসম্মানের মধ্যে বরখাস্ত হবে। কী আশ্চর্য! লজ্জা হওয়া উচিত ছিল তোমার। এক-শো বছরেরও ওপর তোমার ফ্যামিলি এই বাড়িতে কাটিয়েছে, আর আজকে কিনা আমারই বিরুদ্ধে নোংরা চক্রান্ত করছ তুমি।

না, না, স্যার; আপনার বিরুদ্ধে নয়!

কথাগুলো নারীকণ্ঠের, স্বামীর চাইতেও আরও ফ্যাকাশে আরও ত্রাসকম্পিত মুখে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ব্যারিমুর। শাল আবৃত এবং স্কার্ট আচ্ছাদিত গুরুভার বপু দেখে অন্য সময় হলে হাসির উদ্রেক ঘটত, কিন্তু মুখাবয়বের আতীব্র আবেগ আর অনুভূতির দরুন হাসি এল না।

বাটলার বললে, এলিজা, চাকরি আর নেই। সব শেষ। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।

জন, জন, আমার জন্যেই তোমার এই হাল হল। স্যার হেনরি, এসব আমার কীর্তিআমার কাজ ও যা কিছু করেছে আমি বলেছি বলেই করেছে, আমার মুখ চেয়েই করেছে।

তাহলে তুমিই বলো! মানে কী এসবের?

আমার অভাগা ভাইটা না-খেয়ে জলায়। দরজার সামনেই অনাহারে তাকে মরতে দিতে পারি না। আলো জ্বালিয়ে সংকেতেবলি–খাবার তৈরি। সে আলো জ্বালিয়ে সংকেত জানায়–কোথায় খাবার নিয়ে যেতে হবে।

তোমার ভাই তাহলে—

পলাতক কয়েদি, স্যার–ক্রিমিন্যাল সেলডেন।

কথাটা সত্যি স্যার, বললে ব্যারিমুর। এইজন্যেই বলছিলাম, গোপন রহস্যটা আমার নয়, আমি বলতে পারব না। যার সিক্রেট, তার মুখেই সব শুনলেন। এখন বিচার করে দেখুন চক্রান্তটা আপনার বিরুদ্ধে কিনা।

নিশীথ রাতে চোরের মতো অভিযানে বেরিয়ে জানলায় আলো দেখানোর ব্যাখ্যা তাহলে এইটাই। সবিস্ময়ে আমি এবং স্যার হেনরি দু-জনেই চেয়ে রইলাম স্ত্রীলোকটির দিকে। বোকাসোকা সচ্চরিত্রা এই মেয়ের ধমনীতে এ-অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীর রক্তও বইছে, এও কি সম্ভব?

আজ্ঞে, হ্যাঁ, বিয়ের আগে আমার নামও সেলডেন ছিল। ও আমার ছোটো ভাই। ছোটো থেকেই আদর দিয়ে বাঁদর করেছি ওকে। যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। শেষকালে ওর ধারণা হয়ে গেল, গোটা দুনিয়াটাই সৃষ্টি হয়েছে কেবল ওর ফুর্তির জন্যে। যা খুশি করবে, যা খুশি চাইবে। বড়ো হওয়ার পর অনেক কুসঙ্গী জুটল, কাঁধে শয়তান ভর করল, মায়ের বুক ভেঙে দিলে, আমাদের নাম ডোবালো। একটার পর একটা জঘন্য অপরাধ করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে স্রেফ ভগবানের কৃপায় ফাঁসির দড়ি থেকে এযাত্রা বেঁচে গেছে; আমার কাছে কিন্তু সে এখনও সেই ছোট্ট দস্যি ছেলে, চুলগুলো কোঁকড়া। বড়ো বোন আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ছোট্ট ভাইটিকে। ও জানে আমরা এখানে আছি। আমাদের কাছে এলে ঠেলে ফেলে দেব না কোনোমতেই। তাই একদিন রাত্রিতে অনাহারে ক্লান্তিতে টলতে টলতে আশ্রয় নিতে এল, ওয়ার্ডাররা

প্রায় ধরে ফেলে আর কী, কী করব তখন বলতে পারেন? ঠাঁই দিলাম, খেতে দিলাম, শুশ্রুষা করলাম। তারপর, স্যার, আপনি এলেন। স্বামী বললে, জলায় থাকলেই বরং এখন নিরাপদে থাকবে। হইচই কমে গেলে অন্য কোথাও চলে যাবেখন। তাই লুকিয়ে আছে ওখানে। কিন্তু একরাত অন্তর জানলায় আলো জ্বেলে দেখি এখনও জলায় আছে কিনা। যদি জবাব আসে, স্বামী কিছু রুটি আর মাংস দিয়ে আসে। প্রতিদিনই ভাবি এবার বুঝি চলে গেছে। যদ্দিন না-যায়, তদ্দিন তো ওকে না-খাইয়ে রাখতে পারি না। স্যার, এই হল গিয়ে আসল ব্যাপার। এর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। আমি ধর্মভীরু খ্রিস্টান। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে, সে-দোষ আমি করেছি, আমার স্বামী করেনি।

প্রত্যেকটা কথার মধ্যে সুগভীর আন্তরিকতা ফুটে বেরোল–সেইসঙ্গে শ্রোতাদের কানে বয়ে নিয়ে এল দৃঢ় বিশ্বাস।

ব্যারিমুর, সব সত্যি?

হ্যাঁ, স্যার হেনরি, বর্ণে বর্ণে সত্যি।

স্ত্রীর জন্যে যা করেছ, তার জন্যে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। যা বলেছি ভুলে যাও। ঘরে যাও। কাল সকালে এ-প্রসঙ্গে আরও কথা হবেখন।

চলে গেল দু-জনে। জানলা দিয়ে ফের তাকালাম বাইরে। দু-হাট করে পাল্লা খুলে ধরেছেন স্যার হেনরি, মুখে আছড়ে পড়ছে জলার ঠান্ডা কনকনে বাতাস। অনেক দূরে নিবিড় অন্ধকারে টিমটিম করে জ্বলছে হলুদ আলোর ক্ষুদ্র বিন্দু।

সাহস আছে বটে, বললেন স্যার হেনরি।

হয়তো এমনভাবে রেখেছে যাতে কেবল এখান থেকেই দেখা যায়।

খুব সম্ভব তাই। কতদুরে হবে বলে মনে হয়?

ফাটল ধরা পাহাড়টার দিকে।

মাইলখানেক কি দুয়েক বড়ো জোর।

তাও নয়।

ব্যারিমুরকে খাবার নিয়ে যেতে হয়, কাজেই বেশিদূর হতেই পারে না। মোমবাতির পাশেই বসে পথ চেয়ে আছে শয়তান। ওয়াটসন, চললাম ওকে ধরতে!

একই বাসনা আমার মাথার মধ্যেও এসেছিল। ব্যারিমুর তো স্বেচ্ছায় কিছু বলেনি বিশ্বাস করে একটা কথাও ভাঙেনি। জোর করে পেট থেকে আদায় করতে হয়েছে গোপন

কথা। লোকটা সমাজ-শত্রু এবং বিপজ্জনক। বদমাইশির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং তাকে ক্ষমা বা দয়া করার কথাই ওঠে না। এমন জায়গায় এ-লোককে রাখা দরকার যেখান থেকে কারো অনিষ্ট সে করতে পারবে না। আমরা সেই চেষ্টাই করে দেখব। যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, মূল্য দিতে হবে অন্য লোককে পাশবিক, প্রচণ্ড ওই প্রকৃতির সামনে নিরাপদ কেউই নয়। যেকোনো রাতে যেকোনো প্রতিবেশীর ওপর হামলা জুড়তে পারে এই মহাশয়তান এবং হয়তো স্টেপলটন ভাইবোনও বাদ যাবে না। এই কথাটা মাথায় আসতেই বোধ হয় অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় চনমন করে উঠলেন স্যার হেনরি।

আমি আসছি, বললাম আমি।

তাহলে যান বুট পরে নিন, রিভলবার আনুন। যত তাড়াতাড়ি বেরোই, ততই মঙ্গল। নইলে আলো নিভিয়ে সরে পড়তে পারে।

পাঁচ মিনিটেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, শুরু হল অভিযান। কালো গুল্মর মাঝ দিয়ে পথ করে দ্রুত এগিয়ে চললাম আলোর দিকে। খস খস করে উড়তে লাগল ঝরাপাতা–শরতের হাওয়ার চাপা গোঙানির শব্দ আছড়ে পড়ছে মুখে! স্যাঁৎসেঁতে আর পচা গন্ধে ভারী রাতের হাওয়া। মাঝে মাঝে ছুটন্ত মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই লুকিয়ে পড়ছে চাঁদ। জলায় পা দিতে-না-দিতেই শুরু হল ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। আলোটা তখনও স্থিরভাবে জ্বলছে সামনে।

আপনি সশস্ত্র? জিজ্ঞেস করি আমি।

ঘোড়ার চাবুক এনেছি।

চক্ষের নিমেষে কাছে চলে যেতে হবে। শুনেছি, লোকটা দারুণ বেপরোয়া। আচমকা আঁপিয়ে কাবু করতে হবে বাধা দেওয়ার সুযোগ দেব না।

ব্যারনেট বললে, ওয়াটসন, হোমস শুনলে কী বলবেন? অশুভ শক্তিদের নরকগুলজার এই সময়েই শুরু হয় না?

প্রত্যুত্তর স্বরূপই যেন আচম্বিতে জলার বিশাল বিষণ্ণতার মধ্য থেকে জাগ্রত হল সেই ভয়াল গজরানি। সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির কিনারায় দাঁড়িয়ে এর আগে রক্ত জমানো এ-ডাক আমি একবার শুনেছি। তখন শুনেছিলাম দিনের আলোয়, এখন শুনলাম রাতের অন্ধকারে। নিশীথ রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে দিয়ে কনকনে হাওয়ায় ভর দিয়ে ডাকটা যেন ভেসে এল জলার বুক বিদীর্ণ করে বিরামবিহীন এক টানা গম্ভীর গজরানি, তারপর ধাপে ধাপে তা বেড়ে গেল রক্ত-হিম-করা হিংস্র গর্জনে যেন আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই ফের নেমে এল খাদে, করুণ কান্নার মতো গুঙিয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়ে। আবার জাগ্রত হল চাপা গর্জন। আবার ক্রুদ্ধ গর্জন, আবার বুকফাটা হাহাকার। তীক্ষ্ণ, কর্কশ, বন্য এবং লোমহর্ষক সেই অপার্থিব চিৎকার বারংবার ভেসে এল নিশীথ রাতের বুক বিদীর্ণ করে ফাটিয়ে দিল যেন কানের পর্দা। বাতাস পর্যন্ত

স্পন্দিত হল শব্দ-তরঙ্গে, শিউরে উঠল পাহাড়-পর্বত-গাছপালা। সভয়ে জামার আস্তিন খামচে ধরলেন ব্যারনেট। অন্ধকারেও দেখলাম মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে।

হে ভগবান! এ কীসের আওয়াজ, ওয়াটসন?

জানি না। জলায় এ-আওয়াজ শোনা যায়। আমি আগে একবার শুনেছি।

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে একেবারেই থেমে গেল দীর্ঘ বিলাপের ধ্বনি। অখণ্ড নীরবতা চেপে বসল কানের ওপর। উত্তীর্ণ হয়ে রইলাম, কিন্তু নিবিড় নৈঃশব্দ্য ফুড়ে আর কোনো আওয়াজ ভেসে এল না।

ওয়াটসন, বললেন ব্যারনেট, এ তো হাউন্ডের ডাক।

শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা বরফের স্রোত নেমে গেল কথাটা শুনে। গলা ভেঙে গিয়েছে ব্যারনেটের। আচমকা আতঙ্কে সাহস হারিয়ে ফেলেছেন।

আওয়াজটাকে ওরা কী বলে? শুধোলেন উনি।

কারা?

এ-অঞ্চলের লোকেরা।

ওরা মুখ–ওদের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

ওয়াটসন, বলুন আমাকে কী বলে ওরা?

ইতস্তত করলাম, কিন্তু প্রশ্নটা এড়াতে পারলাম না।

ওঁদের কথায় এই নাকি বাস্কারভিল কুকুরের ডাক।

গুঙিয়ে উঠলেন ব্যারনেট, চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

অবশেষে বলেন, কুকুরই বটে। ডাকটা কিন্তু বহু মাইল দূর থেকে ভেসে এল।

কোত্থেকে এল, তা বলা মুশকিল।

হাওয়ার ওঠানামার সঙ্গে আওয়াজটা উঠেছে নেমেছে। ওইদিকেই তো বিরাট সেই গ্রিমপেন পঙ্ক?

হ্যাঁ।

ওইখানেই রয়েছে। ওয়াটসন, কুকুরের ডাক ছাড়া একে আর কী বলে মনে হয় আপনার? আমি কচি খোকা নই। সত্যি বলতে ভয়টা কীসের?

গতবার যখন শুনি আওয়াজটা, স্টেপলটন ছিলেন সঙ্গে। উনি বললেন অদ্ভুত কোনো পাখির ডাক হতে পারে।

না, না, এ-ডাক হাউন্ডের। হে ভগবান, সত্যিই কি তাহলে এসব নিছক গল্প নয়? সব সত্যি? অলক্ষুণে এই ডাকের পেছনে কি ওত পেতে রয়েছে ভয়ানক বিপদ–পরিত্রাণ নেই আমার? আপনি নিশ্চয় এসব বিশ্বাস করেন না। ওয়াটসন, করেন কি?

আরে না, না।

তবুও দেখুন লন্ডনে বসে এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা এক জিনিস, জলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিকট এই ডাক শোনা আর এক জিনিস। তারপর ধরুন আমার কাকার মৃত্যু। মৃতদেহের পাশে হাউন্ডের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। সব মিলে যাচ্ছে। ওয়াটসন, আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু আওয়াজটা আমার রক্ত পর্যন্ত যেন জমিয়ে দিয়েছে। হাত ছুঁয়ে দেখুন।

মার্বেল পাথরের মতো হিমশীতল তার হাত।

কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবেন।

মাথার মধ্যে থেকে এ-ডাক তাড়াতে পারব বলে মনে হয় না। কী করা উচিত এখন বলুন তো? ফিরে যাব?

না কক্ষনো না। যাকে ধরতে এসেছি, তাকে ধরবই। কয়েদির পেছনে আমরাই ছুটেছি, আমাদের পেছনে পিশাচ-কুকুর ছুটছে না। আসুন। এ-জলার সমস্ত ভূতপ্রেত পিশাচ-দানো বেরিয়ে এসে তাণ্ডবনাচ আরম্ভ করলেও ওকে আমরা ধরবই।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম। এবড়োখেবড়ো পাহাড়গুলো অস্পষ্ট কালো বিরাট চেহারা নিয়ে ভয় দেখাতে লাগল সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। হলুদ আলোর বিন্দু সামনে জ্বলতে লাগল সমানে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বোঝা যায় না আলো কতদূরে আছে; মরীচিকার মতো কখনো মনে হয় এই বুঝি কয়েক গজ দূরে, আবার কখনো মনে হয় দিগন্তপারে; শেষকালে অবশ্য দেখা গেল কোথায় জ্বলছে আলোটা! বুঝলাম সত্যিই অনেক কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের খাঁজে আটকানো একটা মোমবাতি থেকে ফোঁটা ফোঁটা মোম গলে পড়ছে। দু-পাশে পাথরের আড়াল থাকায় দুটো কাজ হচ্ছে। হাওয়ায় নিভছে না এবং বাস্কারভিল হলের দিক ছাড়া অন্য দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। একটা গোলাকার গ্র্যানাইট পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সংকেত-বর্তিকার পানে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে। আশ্চর্য দৃশ্য সন্দেহ নেই। বিজন জলার বুকে জ্বলছে একটিমাত্র মোমবাতি ধারেকাছে নেই প্রাণের লক্ষণ–শুধু একটা সোজা, হলুদ শিখা–দু-পাশের পাথরের আড়াল চকচক করছে সেই আলোয়।

বলুন এখন কী করি? ফিসফিস করলেন স্যার হেনরি।

অপেক্ষা করা যাক। নিশ্চয় আলোর কাছেই আছে। চেহারাটা দেখা যায় কিনা দেখা যাক।

মুখ থেকে কথাটা বেরুতে-না-বেরুতে দু-জনেই দেখলাম তাকে। পাথরের যে-ফাটলে মোমবাতি জ্বলছে, সহসা সেই খাঁজের উপর থেকে আবির্ভূত হল একটা মুণ্ডু, কুটিল একটা হলদেটে ভয়ংকর জন্তুর মতো মুণ্ডু, মুখের পরতে পরতে অজস্র ক্ষতচিহ্নের মতো দগদগ করছে ভয়াল ইন্দ্রিয়াবেগ। জটপাকানো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মুখময় নোংরা পাঁকের দাগ যেন সে এ-যুগের মানুষ নয়–বহু যুগের ওপার হতে প্রস্তরযুগের বর্বর বুঝি আবার ফিরে এসেছে। আপন ডেরায়। নীচ থেকে আলো গিয়ে ঠিকরে যাচ্ছে ছোটো ছোটো ধূর্ত চোখজোড়া থেকে ডাইনে বাঁয়ে ভয়ংকরভাবে ঘুরছে চক্ষুগোলক উঁকি দিচ্ছে অন্ধকারের বুকে ঠিক যেন আগুয়ান শিকারি পদশব্দে সচকিত হয়েছে মহাধড়িবাজ গুহাবাসী কোনো শ্বাপদ।

নিশ্চয়, কোনো কারণে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছে লোকটার। হয়তো ব্যারিমুরের নিজস্ব কোনো সংকেত ছিল—আমরা যা জানি না। অথবা হয়তো কোনো কারণে সে বুঝেছে হাওয়া অনুকূল নয়। আমি কিন্তু তার শয়তান মুখে দেখলাম ভয়ের রেখা। যেকোনো মুহূর্তে আলোর বৃত্ত থেকে ছিটকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে নীর তমিস্রায়। সবেগে ধেয়ে গেলাম সামনে, দেখাদেখি স্যার হেনরিও লাফিয়ে এলেন পেছনে। সেই মুহূর্তে বিকট তীক্ষ্ণ গলায় গালাগাল দিয়ে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল কয়েদি–টুকরো টুকরো হয়ে গেল গোল গ্রানাইটে লেগে–যার আড়ালে লুকিয়েছিলাম এতক্ষণ। চকিতের জন্যে

দেখলাম বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা, মোটাসোটা, একটা মূর্তি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ছুটবার জন্যে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কপাল খুলে গেল আমাদের, মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল চন্দ্রদেব। খাড়া পাহাড়ের কিনারার উপর দিয়ে ঝড়ের মতো ধেয়ে গেলাম আমরা। দেখলাম অন্যদিকে দুর্দান্ত বেগে নেমে যাচ্ছে পলাতক, এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে নামছে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়–ঠিক যেন পাহাড়ি ছাগল। রিভলবার বার করে গুলি চালালে কপালজোরে একটা-না-একটা গুলি গায়ে লাগতই। পঙ্গু করে দিতে পারতাম কিন্তু হাতিয়ার এনেছি আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্যে, নিরস্ত্র অবস্থায় যে-পালাচ্ছে তাকে গুলি করবার জন্যে নয়।

আমরা দুজনেই মোটামুটি ভালো দৌড়বাজ, শরীরও মজবুত। তা সত্ত্বেও পলাতকের নাগাল ধরবার কোনো স্বভাবনাই নেই দেখলাম। চাদের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে অনেকদ্দূর পর্যন্ত দেখা গেল তাকে, তারপর বহুদূরের একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বড়ো বড়ো পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে লাফাতে লাফাতে বিন্দুর মতো ছোট্ট হয়ে এল তার পলায়মান আকৃতি। পুরোপুরি বেদম না-হওয়া পর্যন্ত দৌড়েই গেলাম দু-জনে, কিন্তু দেখলাম ক্রমশই ব্যবধান বাড়ছে আমাদের আর পলাতকের মাঝখানে। শেষকালে দাঁড়িয়ে গিয়ে দু-জনে দুটো পাথরে হাঁপাতে লাগলাম হাপরের মতন–চোখের সামনে দিয়ে দূর হতে দূরে ছোট্ট হয়ে গেল। একসময়ে কয়েদি। এবং ঠিক এই সময়ে একটা অত্যন্ত বিচিত্র, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখা গেল। পশ্চাদ্ধাবন নিষ্ফল জেনে পাথর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম বাড়ি ফিরব বলে। চাঁদ ঝুলে রয়েছে ডান দিকে, খোঁচা খোঁচা গ্রানাইট পাহাড়ের একটা এবড়োখেবড়ে চুড়ো রয়েছে। রুপোলি চাকতির তলার দিকে। উজ্জ্বল পটভূমিকায় আবলুস কাঠে তৈরি মূর্তির মতো মিশমিশে কালো একটা লোক

দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ায়। হোমস, চোখের ভ্রম ভেবো না। বিশ্বাস করো, জীবনে এর চাইতে স্পষ্ট কিছু দেখিনি। যদূর মনে হল, মুর্তিটা একজন দীর্ঘকায়, ছিপছিপে পুরুষ মানুষের। দু-পা ঈষৎ ফাঁক, বুকের ওপর দু-হাত ভঁজ করা, মাথা হেঁট। সামনের দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির পচা উদ্ভিজ পদার্থ আর গ্র্যানাইট রাশি নিয়ে ভাবছে যেন গুম হয়ে। ভয়াল ভয়ংকর এই অঞ্চলের অশরীরী আত্মা যেন সে স্বয়ং। না কয়েদি সে নয়। পলাতক অদৃশ্য হয়েছে যেখানে, এ-লোকটা দাঁড়িয়ে সেখান থেকে অনেক দূরে। তা ছাড়া, এ-লোক অনেক বেশি ঢ্যাঙা। সবিস্ময়ে চিৎকার করে আঙুল তুলে ব্যারনেটকে দেখালাম স্ট্যাচুমুর্তি–কিন্তু ওঁর হাত খামচে ধরতে গিয়ে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যেই নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হল সে। চাদের তলার দিকে গ্রানাইটের ধারালো চূড়া যেন কেটে বসেছে, কিন্তু শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান সেই নিস্পন্দ, নীরব মূর্তিটি কেবল নেই।

আমার ইচ্ছে ছিল ওদিকে গিয়ে পাহাড়টা খুঁজে আসি, কিন্তু দেখলাম বেশ খানিকটা যেতে হবে। অপার্থিব সেই ডাক শুনে ব্যারনেটের স্নায়ু তখনও কাঁপছে। বাস্কারভিল বংশের করাল অভিশাপ কাহিনি অণুতে পরমাণুতে বিভীষিকা জাগিয়েছে, নতুন অ্যাডভেঞ্চারের অভিলাষ খুব একটা দেখলাম না। পাহাড়চূড়ার নিঃসঙ্গ মূর্তি উনি দেখেননি। দেখেননি বলেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। লোকটার বিচিত্র উপস্থিতি এবং কর্তৃত্বময় ভঙ্গিমা কী ধরনের রোমাঞ্চ জাগিয়েছে আমার প্রতিটি লোমকুপে। বললেন, নিশ্চয় কোনো ওয়ার্ডার। কয়েদিটা পালানোর পর থেকে জলা ছেয়ে ফেলেছে এরা। হয়তো উনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আরও প্রমাণ পেলে আমি খুশি হব। আজ প্রিন্সটাউন কর্তাদের চিঠি লিখব ভাবছি। কোথায় খুঁজলে পলাতককে পাওয়া যাবে, জানিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের পাথরচাপা কপাল, হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে ধরে

আনতে পারলাম না বিজয়তিলক থেকে বঞ্চিত হলাম। এই হল গিয়ে আমাদের গত রাতের অ্যাডভেঞ্চার বৃত্তান্ত ভায়া হোমস। রিপোর্টের মতো রিপোর্ট আজ দিতে পেরেছি– নিশ্চয় তা মানবে। অনেক কথাই তোমার কাছে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমি দরকারি অদরকারি সব ঘটনাই বিবৃত করলাম, যাতে তুমি নিজের বিচারবুদ্ধি খাঁটিয়ে উচিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারো। সত্যিই অনেকটা এগোতে পেরেছি। ব্যারিমুরদের রহস্য অনেকাংশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, কেননা ওদের মোটিভ জানা গেছে। কিন্তু বিচিত্র বাসিন্দা এবং বিবিধ রহস্য সমেত জলা এখনও দুয়েই রয়ে গেল। পরের বারে হয়তো এ-ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোক নিক্ষেপ করতে পারব। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই চলে আসো।

ডক্টর ওয়াটসনের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃতি

শার্লক হোমসকে প্রথম দিকে যেসব রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, সেই থেকেই উদ্ধৃত করে এসেছি এই পর্যন্ত। বিবরণের এমন এক জায়গায় এখন পৌঁছেছি যে এই পদ্ধতি বর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। এখন থেকে ফের স্মৃতির ওপর নির্ভর করব, ডায়ারির সাহায্যও নেব। রোজ দিনপঞ্জি লিখতাম তখন। কয়েকটা পৃষ্ঠা হুবহু তুলে দিচ্ছি নীচে। স্মৃতিপটে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে গেছে যেসব দৃশ্য, ডায়ারিতে লেখা বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে ফিরে যাওয়া যাক তার মধ্যে। কয়েদির পেছনে নিষ্ফল ছুটোছুটি এবং জলার বুকে অন্যান্য বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরের সকাল থেকে শুরু করা যাক দিনপঞ্জির বর্ণনা।

অক্টোবর ১৬।–কুয়াশাচ্ছন্ন, অনুজ্জ্বল দিবস। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। ঝোড়ো হাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটছে রাশি রাশি মেঘ, ঢেকে ফেলেছে বাস্কারভিল। মাঝে মাঝে মেঘ সরে যাচ্ছে, জলার ধু-ধু দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের ধারে ধারে। শীর্ণ রুপোলি শিখা চোখে পড়ছে, বহু দূরের গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের জলে-ভেজা দিকগুলোয় আলো পড়ায় চকচক করছে। বিষণ্ণতা বাইরে এবং ভিতরে। কাল রাতের উত্তেজনার পর মুষড়ে পড়েছেন ব্যারনেট। আমারও বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর চেপে রয়েছে মনে হচ্ছে; একটা সদাজাগ্রত মহা বিপদ যে আসন্ন এইরকম একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে–বিপদটা যে কী, তা জানি না। সেইজন্যেই অনুভূতিটা এত ভয়ংকর।

এ-রকম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হওয়ার মতো কারণও কি ঘটেনি? একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে অমঙ্গলের সংকেত টের পাচ্ছি। ফ্যামিলি কিংবদন্তিতে। যা-যা বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই মারা গেলেন বাস্কারভিল হলের পূর্বতন বাসিন্দা। চাষিদের মুখে ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে একটা রিপোর্ট জলার বুকে অদ্ভুত একটা প্রাণীকে নাকি দেখা যাচ্ছে নতুন করে। দু-বার আমি নিজের কানে হাউন্ডের ঘেউ-ঘেউ ডাকের মতো আওয়াজ শুনেছি। অথচ তা অবিশ্বাস এবং অসম্ভব। কেননা এ-ব্যাপার প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। পায়ের ছাপ ফেলে যায় এবং দীর্ঘ বিলাপ-ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে, এমন প্রেত-কুকুরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। স্টেপলটন বিশ্বাস করতে পারেন কুসংস্কার, মর্টিমারও করতে পারেন; কিন্তু আমার ভেতরে কাণ্ডজ্ঞান বলে একটা বস্তু আছে। এসব ব্যাপার বিশ্বাস করার পাত্র আমি নই। করতে হলে চাষিদের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়। এরা শুধু পিচাশ কুকুরের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না–আরও একধাপ এগিয়েছে–নরক হাউন্ডের মুখ আর চোখ থেকে নরকাগ্নি বিচ্ছুরিত হতেও দেখেছে। এসব গালগল্প হোমস কান পেতেও শুনবে না। আমি তারই প্রতিনিধি। কিন্তু ঘটনাকেই-বা অস্বীকার করি কী করে। নিজের কানে জলার বুকে কুকুরটার ডাক আমি শুনেছি। এমনও হতে পারে সত্যিই হয়ত একটা বিশাল হাউন্ড ছাড়া আছে জলায়। সেক্ষেত্রে অনেক কিছুরই সংগত ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু হাউন্ডটা লুকিয়ে থাকে কোথায়? খাবার পায় কোত্থেকে? কোথা থেকে তার আবির্ভাব? দিনের বেলাই-বা তাকে কেউ দেখেনি কেন? অস্বাভাবিক ব্যাখ্যার মতো স্বাভাবিক ব্যাখ্যার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে বিস্তর অসংগতি থেকে যাচ্ছে। হাউন্ডের ব্যাপার ছাড়াও আরও কতকগুলো ঘটনা কিন্তু অহরহ জেগে রয়েছে মনের মধ্যে; যেমন, লন্ডনে মানুষ চোরের আবির্ভাব, ছ্যাকড়াগাড়ির মধ্যে সেই লোকটা, জলা সম্পর্কে স্যার হেনরিকে হুঁশিয়ার-পত্র। এগুলো

তো বাস্তব ঘটনা এবং হয়তো কোনো হিতৈষী বন্ধুর কীর্তি শত্রুর কীর্তিও হতে পারে। সেই সুহৃদ অথবা শত্রুটি এখন কোথায়? লন্ডনেই আছে, না আমাদের পেছন পেছন এখানেও জুটেছে? জলার পাহাড়চুড়োয় যে-আগন্তুককে আমি দেখেছি–এই কি সেই লোক?

লোকটাকে পলকের জন্য দেখেছি ঠিকই, কিন্তু কতকগুলো বৈশিষ্ট্য হলফ করে বলতে পারি। এখানে যাদের দেখেছি, যেসব প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাদের কারোর মতোই একে দেখতে নয়। বিচিত্র সেই মূর্তি স্টেপলটনের চেয়ে অনেক ঢ্যাঙা, ফ্রাঙ্কল্যান্ডের চেয়ে অনেক কৃশ। ব্যারিমুর হলেও হতে পারত, কিন্তু তাকে তো আমরা পেছনে ফেলে এসেছিলাম। সে যে আমার পেছন নেয়নি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। লন্ডনে যে অজ্ঞাত ব্যক্তিটি ফেউয়ের মতো লেগেছিল পেছনে, এখানেও সে ঘুরছে পেছন পেছন। মুহূর্তের জন্যেও তার নজরবন্দির বাইরে আমরা যেতে পারিনি। লোকটাকে ধরতে পারলে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সর্বশক্তি দিয়ে এখন আমি সেই চেষ্টাই করব।

প্রথমেই ভাবলাম, স্যার হেনরিকে বলি আমার পরিকল্পনার বৃত্তান্ত। তারপর ভেবে দেখলাম ওঁকে কিছু না-বলাই ভালো। নিজেই যা পারি করব। ঝিম মেরে রয়েছেন ভদ্রলোক। সদা অন্যমনস্ক। জলার বুকে অপার্থিব সেই চিৎকারে অদ্ভুতভাবে নাড়া খেয়েছে স্নায়ু। ওঁর উদবেগ আর বাড়াব না। নিজেই যা পারি করব।

আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর ছোট্ট একটা নাটক হয়ে গেল। স্যার হেনরির সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাইল ব্যারিমুর। পড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন দু-জনে। বেশ কিছুক্ষণ একলা বসে রইলাম বিলিয়ার্ড-রুমে। চড়া গলায় কথা কাটাকাটি শুনলাম কয়েকবার। বেশ বুঝলাম কোন খাতে বইছে আলোচনা। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে ধরে আমাকে ডাকলেন ব্যারনেট।

বললেন, ব্যারিমুরের ধারণা ওকে আঘাত দেওয়া হয়েছে। স্ব-ইচ্ছায় গুপ্ত কথা ফাঁস করার পর শ্যালককে তাড়া করাটা আমাদের ঠিক হয়নি।

অত্যন্ত ফ্যাকাশে, কিন্তু অত্যন্ত সংযতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম বাটলারকে।

বললে, কথাটা হয়তো একটু গরমভাবেই বলেছি। তার জন্যে ক্ষমা করবেন, স্যার। কিন্তু আজ সকালে যখন শুনলাম সারারাত সেলডেনকে তাড়া করে বাড়ি ফিরেছেন, খুব অবাক হয়ে গেলাম। এমনিতেই অনেক দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হচ্ছে আমাদের দ্বারা সে-দুর্ভোগ বাড়ুক, এটা আমি চাইনি।

ব্যারনেট বললেন, স্ব-ইচ্ছায় যদি বলতে, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু কথাটা আমাদের টেনে বার করতে হয়েছে–এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছিলাম যে তুমি, মানে, তোমার স্ত্রী না-বলে পারেনি।

আমি ভাবতেও পারিনি সেই সুযোগ আপনি নেবেন–স্যার হেনরি, সত্যিই আমি ভাবিনি?

লোকটা সমাজ-শত্রু। সাধারণের কাছে বিপজ্জনক। বহু বাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে জলার নির্জন জায়গায়। এ-লোকের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই। মুখখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। যেমন ধরো, মি. স্টেপলটনের বাড়ি। রুখে দাঁড়ানোর মতো উনি ছাড়া সেখানে কেউ নেই। এ-লোককে তালাচাবি দিয়ে না-রাখা পর্যন্ত এ-তল্লাটের কেউ নিরাপদ নয়।

স্যার, কারো বাড়িতে ও ঢুকবে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এদেশের আর কারো অনিষ্ট ওর দ্বারা হবে না। স্যার হেনরি, বিশ্বাস করুন, আর ক-দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ও দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হবে। ভগবানের দোহাই স্যার, সেলডেন এখনও যে জলায় আছে, পুলিশকে জানাবেন না। হয়রান হয়ে জলার দিকে যাওয়া ওরা বন্ধ করেছে। জাহাজ না-আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ওখানে এই কটা দিন ও থাকতে পারবে। পুলিশকে এ-খবর দেওয়া মানে আমাকে আর আমার স্ত্রীকেও ঝামেলায় ফেলা। স্যার, আমার বিশেষ অনুরোধ, পুলিশকে কিছু জানাবেন না।

ওয়াটসন কী বলে?

কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বললাম, দেশছাড়াই যদি হয়, করদাতাদের ঘাড় থেকে একটা বোঝ নেমে যাবে।

যাওয়ার আগে যদি কারো ওপর চড়াও হয়?

স্যার, ও-ধরনের পাগলামির ধার দিয়ে ও এখন যাবেন না। ও যা চায়, সব দিয়েছি। এখন নতুন অপরাধ করা মানেই লুকিয়ে থাকার জায়গার খবর পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া।

তা সত্যি, বললেন স্যার হেনরি। ঠিক আছে, ব্যারিমুর।

ভগবান আপনার ভালো করবেন, স্যার, অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেলডেন ফের ধরা পড়লে আমার স্ত্রী সে-ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারবে না।

আমার যেন মনে হচ্ছে গুরুতর অপরাধে প্ররোচনা জোগাচ্ছিল, অসৎ কাজে সাহায্য করছি, তাই না ওয়াটসন? কিন্তু সব কথা শোনার পর ওকে ধরিয়ে দিতেও ইচ্ছে করছে না। ব্যাপারটা তাহলে এইখানেই চুকে গেল, ব্যারিমুর। ঠিক আছে, এখন আসতে পারো।

ভাঙা ভাঙা দু-চারটে কৃতজ্ঞতার কথা শুনিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারিমুর, কিন্তু গেল না। দ্বিধায় পড়ল যেন। তারপর ফিরে এল।

স্যার, অনেক দয়া করলেন আপনি। প্রতিদানে আমার কিছু করা উচিত। একটা ব্যাপার আমি জানি। আগেই হয়তো বলা উচিত ছিল, কিন্তু জেনেছি তদন্ত শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে। মরজগতের কোনো নশ্বর মানুষকে এ-কথা আজও বলিনি। ব্যাপারটা ভাগ্যহীন স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপারে।

তড়াক করে একই সাথে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি এবং ব্যারনেট। তুমি জানো কীভাবে মারা গেছেন উনি?

না, স্যার; তা জানি না। তাহলে?

ওইরকম একটা সময়ে গেটে দাঁড়িয়েছিলেন কেন, তা জানি। একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন! উনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিলাটির নাম?

নামটা বলতে পারব না, তবে নামের আদ্যক্ষর বলতে পারব। এল এল (L. L.)–এই তাঁর নামের প্রথম দুটো অক্ষর।

ব্যারিমুর, কী করে জানলে তুমি?

স্যার হেনরি, সকালবেলা আপনার কাকা একটা চিঠি পেয়েছিলেন। রোজই অনেক চিঠি আসত ওঁর নামে। পাঁচজনের দুঃখদুর্দশায় বুক দিয়ে পড়তেন বলে, কেউ বিপদে পড়লেই ছুটে আসত। দিলখোলা দরাজ ছিলেন বলে সবাই শ্রদ্ধাভক্তি করত। সেদিন সকালে কিন্তু ঘটনাক্রমে এসেছিল একটাই চিঠি। তাই আমার নজরে এসেছিল খামটা। ঠিকানা লিখেছে একজন মহিলা, পাঠিয়েছে কুমবে ট্রেসি থেকে।

তারপর?

এ নিয়ে আর ভাবিনি। ভাবতামও না। কিন্তু ভাবতে হল স্ত্রীর জন্যে। স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর থেকে ওঁর পড়ার ঘর একদম সাফ করা হয়নি। হপ্তাকয়েক আগে আমার স্ত্রী গিয়েছিল পরিষ্কার করতে। আগুনের চুল্লির পেছন দিকে দেখতে পায় একটা পোড়া চিঠির ছাই পড়ে আছে। চিঠির বেশির ভাগই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু একটা কোণে শেষ পর্যন্ত আগুন পৌঁছোয়নি। কালো হয়ে গেলেও ধূসর লেখাটা কোনোমতে পড়া যায়। একটা চিঠির পুনশ্চ বলেই মনে হল। লেখাটা এই : আপনি প্রকৃত ভদ্রলোক বলেই মিনতি করছি দয়া করে এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলবেন এবং ঠিক দশটার সময়ে গেটে হাজির থাকবেন। তলায় সই করা হয়েছে নামের আদ্যক্ষর দিয়ে এল. এল (L. L.)।

চিঠির কোণটা কাছে আছে?

আজ্ঞে না। পড়বার পরেই গুঁড়িয়ে গেছে।

একই হাতের লেখায় লেখা কোনো চিঠি আগে পেয়েছিলেন স্যার চার্লস?

আমি তো স্যার চিঠিটা তেমনভাবে দেখে রাখিনি। একখানা চিঠি এসেছিল বলেই চোখে পড়েছিল।

এল. এল. (L. L.) বলতে কাকে বোঝায় বলতে পারো?

আজ্ঞে, না। ও-ব্যাপারে আপনার মতো আমিও অজ্ঞ। তবে আমার বিশ্বাস মহিলাটিকে যদি পাওয়া যায়, স্যার চার্লস মারা গেছেন কীভাবে, তাও জানা যাবে।

ব্যারিমুর, এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য তুমি এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন বুঝতে পারছি না।

স্যার, এর ঠিক পরেই শুরু হল আমাদের নিজেদের দুর্দৈব। তা ছাড়াও ধরুন, স্যার চার্লসকে আমরা দুজনে আন্তরিক ভালোবাসতাম আমাদের জন্যে কম করেননি উনি ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তুললে ওঁর মঙ্গল কি কিছু হবে? তা ছাড়া একজন মহিলা জড়িয়ে রয়েছে এর মধ্যে। যতই ভলো হই না কেন আমরা—

ওঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ হত, এই তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। লাভ কিছুই হত না। কিন্তু আপনারা আজ অশেষ দয়া দেখিয়েছেন। তাই ভাবলাম ব্যাপারটা আপনাদের না-বললে অন্যায় হবে।

বেশ করেছ ব্যারিমুর, এবার এসো।

বাটলার বিদেয় হতেই আমার দিকে ফিরলেন স্যার হেনরি।

ওয়াটসন, অন্ধকারে নতুন আলো দেখা যাচ্ছে। কীরকম বুঝেছেন?

অন্ধকার ফর্সা না হয়ে আরও ঘন হল মনে হচ্ছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই এল. এল. (L. L.) নামধারী মহিলাটিকে খুঁজে বার করতে পারলে অন্ধকার বেশ খানিকটা পরিষ্কার হত। এইটুকুই লাভ। জানা গেল, অনেক ঘটনাই জেনে বসে আছে একজন তাকে এখন পেলে হয়। কী করা উচিত বলুন তো?

এক্ষুনি হোমসকে সব জানানো উচিত। ও যে-সূত্র খুঁজছে, হয়তো এর মধ্যেই তা রয়েছে। এ-খবর পেলে হয়তো চলেও আসতে পারে।

তৎক্ষণাৎ ঘরে গেলাম। সকালের কথাবার্তা লিখে হোমসের জন্যে রিপোর্ট তৈরি করলাম। নিশ্চয় ইদানীং খুব ব্যস্ত রয়েছে সে। কেননা বেকার স্ট্রিট থেকে ওর যে চিরকুট পাচ্ছি, তা

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আমার রিপোর্ট নিয়ে কোনো মন্তব্য নেই, এমনকী যে দৌত্যকার্য নিয়ে হেথায় আগমন–সে-ব্যাপারেও কোনো উল্লেখ নেই। নিশ্চয় সেই ব্ল্যাকমেলিং কেস নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে। কিন্তু সর্বশেষ এই সংবাদ অবশ্যই তার মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং নতুন করে এ-কেসে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এ সময়ে ওকে এখানে পেলে বাঁচতাম।

অক্টোবর ১৭। —আজ সারাদিন ধরেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খসখস আওয়াজ উঠছে আইভিলতায়, ছর ছর করে জল পড়ছে ঘরের ছাদ বেয়ে। ভাবছিলাম বিষাদমাখা জলার কনকনে ঠান্ডায় কীভাবে মাথা গুঁজে আছে কয়েদি বেচারা। ছাউনি বলতে কিছুই তো নেই ওখানে। সত্যিই বেচারা অপরাধ যাই করুক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভোগান্তিও কম হচ্ছে না। তারপর অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির কথা মনে পড়ল–লন্ডনের ছ্যাকড়াগাড়ির জানলায় যার মুখ দেখেছি, জলার পাহাড়ের চুড়োয় চাঁদের পটভূমিকায় যার মূর্তি দেখেছি। এও কি পলাতকের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে জলায়? অন্ধকারের মানব সেজে অতন্দ্র প্রহরা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেকে অদৃশ্য রেখে? সন্ধে হলে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাদা প্যাঁচপেচে জলার বুকে। অজস্র কালো কল্পনা উঁকি দিতে লাগল মনে। বুক চাপড়ানো শব্দে হাহাকার তুলে শিস দিয়ে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল দামাল বাতাস, ঝমাঝম শব্দে বৃষ্টি আছড়ে পড়তে লাগল মুখে। সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কে এখন যে যাবে, স্বয়ং বিধাতা ছাড়া তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না–কেননা উঁচু উঁচু চাষের জমি পর্যন্ত এখন বাদা হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণকালো যে পাহাড়-চুড়োয় সন্ধানী প্রহরীকে একাকী দেখেছিলাম, গিয়ে উঠলাম সেই পাহাড়ে–কর্কশ দংষ্ট্রার

শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম বিষাদ-ছাওয়া ধু-ধু প্রান্তরের ওপর। বাদার অমসৃণ উত্তাল বুকের ওপর মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে দুরন্ত বৃষ্টি এবং অত্যাশ্চর্য পাহাড়শ্রেণির আড়াল থেকে সার দিয়ে প্রকাণ্ড পুষ্পমালার মতো বেরিয়ে আসছে শ্লেটরঙা মেঘের পর মেঘ–আপন ভারে যেন ঝুলে পড়েছে তরঙ্গায়িত নিসর্গদৃশ্যের মাথার ওপর। অনেক দূরে বাঁ-দিকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাস্কারভিল হলের যমজ টাওয়ার সরু সরু হয়ে উঠে রয়েছে গাছপালার মাথায়। পাহাড়ের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক কুটিরগুলো ছাড়া মানুষের চিহ্ন বলতে কেবল ওই যমজ টাওয়ার। দু-রাত আগে এ-জায়গায় নিঃসঙ্গ যে-মানুষটিকে দেখেছি, কোথাও তার টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল ডক্টর মর্টিমারের সাথে। উনি আসছেন ওঁর এক ঘোড়ার হালকা গাড়ি করে ফিরছেন ফাউল মায়ারের একটা চাষিবাড়ি থেকে। নিত্য আমাদের খোঁজখবর নেন উনি, একদিনও বাদ যায় না। গাড়িতে টেনে তুললেন আমাকে এগিয়ে দিলেন বাড়ির দিকে। ভদ্রলোক খুব বিচলিত রয়েছেন দেখলাম। ওঁর খুদে স্প্যানিয়েল কুকুরটা নিখোঁজ হয়েছে। বাদায় গিয়েছিল, আর ফেরেনি। যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিলাম বটে, কিন্তু চোখের সামনে ভাসতে লাগল গ্রিমপেন পঙ্কের সেই দৃশ্য–তলিয়ে যাচ্ছে আস্ত একটা ঘোড়া। বেশ বুঝলাম, পুঁচকে কুকুরকে ইহজীবনে আর দেখতে পাবেন না ডক্টর মর্টিমার।

এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে গাড়ি ছুটছে। আমি বললাম, ভালো কথা, মর্টিমার, গাড়ি হাঁকিয়ে অনেক জায়গাতেই তো যেতে হয় আপনাকে। যেখানে যেখানে যান, সেখানকার সবাইকে চেনেন?

প্রায়।

নামের আদ্যক্ষর এল. এল. (L...L.)–এমনি কোনো মহিলাকে জানেন?

মিনিট কয়েক ভাবলেন মর্টিমার। বললেন, না। জিপসি আর কুলিকামিনদের খবর আমি দিতে পারব না। তবে চাষি আর ভদ্র গেরস্তদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নামের আদ্যক্ষর এল. এল. (L. L.)। আচ্ছা, দাঁড়ান তো দেখি, বলে একটু ভেবে নিলেন। লরা লায়ন্সের নামের আদ্যক্ষর এল. এল. (L. L.) কিন্তু সে তত থাকে কুমবে ট্রেসিতে।

কে সে?

ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের মেয়ে।

সে কী? ছিটিয়াল ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড?

হ্যাঁ। বাদায় স্কেচ করতে আসত একজন আর্টিস্ট। নাম, লায়ন্স। তাকেই বিয়ে করে মেয়েটি। শেষকালে দেখা গেল লোকটা অত্যন্ত অসাধু এবং বড়ো গালাগাল দেয় বউকে ফেলে পালায় একদিন। যদূর শুনেছি দোষটা তার একার নয়। অমতে বিয়ে করার দরুন এবং আরও দু-একটা কারণে মেয়ের ওপর খঙ্গহস্ত হয়ে ওঠে বাবা কোনো সম্পর্কই রাখতে চায়নি। বাপ আর স্বামী দুই-ই সমান–মাঝখান থেকে কপাল পুড়ল মেয়েটির।

আছে কীভাবে?

মনে হয় নামমাত্র একটা ভাতা দেয় বুড়ো ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড। টাকার পরিমাণটা খুব বেশি নয়, কেননা, নিজের খরচ তত কম নয়। অপরাধ যাই করে থাকুক না কেন, এভাবে মেয়েটা কষ্ট পাক কেউ চায় না। খবরটা ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই তাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল। সভাবে যাতে দু-পয়সা রোজগার করতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা পাঁচজনে করে দেয়। এই পাঁচজনের মধ্যে স্টেপলটন আছেন, স্যার চার্লস ছিলেন, আমি নিজেও যা পেরেছি দিয়েছি। টাইপরাইটিং কারবারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়েটিকে।

এত প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলেন ডাক্তার, কিন্তু আমি অন্য কথায় কৌতূহল চরিতার্থ করলাম–আসল কথা ভাঙলাম না। গোপন কথা পাঁচকান করে লাভ নেই। কাল সকালেই আমি কুমবে-ট্রেসি কোথায় খুঁজে বার করব। যদি দেখি মিসেস লরা লায়ন্স ভদ্রমহিলা সন্দেহজনক চরিত্রের, রহস্য শৃঙ্খলের একটা ব্যাপার অন্তত ভালোভাবেই পরিষ্কার করা যাবে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমায় বিব্রত করে তুলতেই খুব সহজভাবে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের করোটি কোন শ্রেণির। ব্যস, বাকি রাস্তাটা করোটি-বিজ্ঞান ছাড়া আর কোনো কথাই শুনলাম না। শার্লক হোমসের সঙ্গে বৃথাই এতদিন কাটাইনি।

বাত্যবিক্ষুব্ধ এবং বিষণ্ণ এই দিনটিতে আর একটি ঘটনা ঘটেছে। এইমাত্র ব্যারিমুরের সঙ্গে আমার কিছু কথা হল। হাতে আর একটা জোরালো তাস পেলাম, ঝোপ বুঝে কোপ মারব।

ডিনার খেয়ে গেলেন ডক্টর মর্টিমার। খাওয়ার পর স্যার হেনরির সঙ্গে তাস নিয়ে একহাত একাটে খেললেন। লাইব্রেরিতে আমার কফি নিয়ে এল বাটলার। সেই সুযোগে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলাম।

বললাম, ওহে তোমার সম্বন্ধী রত্নটি বিদায় নিয়েছে, না এখনও বাদায় ওত পেতে আছে?

জানি না, স্যার। ভগবান করুন যেন এবার বিদেয় হয়–যত রাজ্যের ঝামেলা ল্যাজে বেঁধে এনেছে! তিন দিন আগে খাবার রেখে এসেছিলাম, তারপর থেকে আর খবর পাইনি।

দেখা হয়নি?

আজ্ঞে না। তারপর ওদিকে গিয়ে দেখেছি খাবার নেই।

তাহলে নিশ্চয় এখানেই এখনও আছে?

সেইরকম মনে হবে স্যার, যদি না অন্য লোকটা নিয়ে গিয়ে থাকে।

ঠোঁটের কাছে এসে থমকে গেল হাতের কফি-কাপ, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম ব্যারিমুরের দিকে।

তুমি জানো এখানে অন্য একটা লোক আছে?

আজ্ঞে, হ্যাঁ; বাদায় আরেকটা লোক আছে।

দেখেছ তাকে?

আজ্ঞে , না।

তাহলে জানলে কী করে?

দিনসাতেক কি তারও আগে সেলডেন বলছিল। এ-লোকটাও লুকিয়ে আছে কিন্তু সে কয়েদি নয়, আমার যদ্দূর মনে হয়। এসব আমার মোটেই ভালো লাগছে না, ডক্টর ওয়াটসন একদম ভালো লাগছে না। আচমকা আতীব্র আবেগে যেন ফেটে পড়ে বাটলার।

ব্যারিমুর কথা শোনো আমার! এ-ব্যাপারে তোমার মনিবের স্বার্থ দেখা ছাড়া আমার কোনো গরজ নেই। এসেছি শুধু তাকে সাহায্য করতে কোনো উদ্দেশ্য নেই। খুলে বললা—

কী তোমার ভালো লাগছে না।

দ্বিধায় পড়ল ব্যারিমুর। আবেগ চেপে রাখতে না-পারার জন্যে পস্তাচ্ছে মনে হল, অথবা হয়তো মনোভাব ব্যক্ত করার ভাষাই খুঁজে পাচ্ছে না।

অবশেষে বাদার দিকের বৃষ্টি-বিধৌত জানলার পানে হাত তুলে বললে উত্তেজিত কণ্ঠে নোংরা একটা ষড়যন্ত্র চলছে কোথাও, শয়তানের কারসাজি চলছে তলায় তলায় হলপ করে বলছি স্যার! স্যার হেনরি ফের লন্ডনে গিয়ে থাকলে সত্যিই খুব খুশি হতাম!

কিন্তু ভয়টা কীসের?

স্যার চার্লস কীভাবে মরেছেন দেখুন! করোনার যাই বলুক না, জিনিসটা খুবই খারাপ! বাদার বুকে গভীর রাতে কীরকম আওয়াজ হয় নিশ্চয় শুনেছেন। টাকা দিয়েও সন্ধের পর ওখানে কাউকে পাঠাতে পারবেন না। তারপর ধরুন অদ্ভুত সেই লোকটা কেউ তাকে চেনে না, কিন্তু ঘাপটি মেরে আছে বাদায়, নজর রাখছে সবদিকে। ওত পেতে আছে দিনের পর দিন! কীসের জন্যে ওত পেতে আছে বলতে পারেন? জানেন এর কী মানে? মানে একটাই বাস্কারভিল নামধারী কারুর রক্ষে নেই! তাই বলছিলাম, স্যার হেনরির নতুন চাকরবাকর এলে বাঁচি। যেদিন আসবে, সেদিনই এ-বাড়ি ছেড়ে পালাব।

আমি বললাম, অদ্ভুত সেই লোকটা সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারবে? সেলডেনের মুখে কিছু শুনেছ? ও দেখেছে কী করে লোকটা? থাকে কোথায়?

দু-একবার দেখেছে তাকে কিন্তু সে বড়ো গভীর জলের মাছ, ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে নেই। প্রথমে ভেবেছিল পুলিশের লোক, তারপর দেখল নিজেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। যদ্র বুঝেছে, লোকটা ভদ্দরলোক। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে করে, ধরতে পারেনি।

কোথায় লুকিয়ে আছে?

পাহাড়ের গায়ে ওই যে পাথরের কুটিরগুলো, যেখানে সেকালে লোক থাকত ওইখানে!

খাবার পায় কোত্থেকে?

সেলডেন নিজের চোখে দেখেছে লোকটার ফাইফরমাশ খাটে একটা ছোকরা। জিনিসপত্র এনে দেয়। কুমবে ট্রেসিতেই যায় নিশ্চয় দরকার মতো জিনিস আনতে।

ঠিক আছে, ব্যারিমুর! এ নিয়ে পরে আরও কথা বলা যাবেখন।

বিদেয় হল বাটলার। অন্ধকার জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ঝাঁপসা কাচের মধ্যে দিয়ে তাকালাম দূরের ঝড়ে-নুয়ে-পড়া গাছপালা আর ছুটন্ত মেঘমালার পানে। ঘরের ভেতর থেকেই রাতের চেহারা যদি এমনি দুর্দান্ত হয়, বাদার মধ্যে খোলা আকাশের তলায় প্রস্তর-কুটিরের হাল এখন কী? প্রবৃত্তির তাড়না কতখানি প্রচণ্ড হলে মানুষ প্রকৃতির এই রুদ্রলীলাকেও উপেক্ষা করে অমন জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকতে পারে? কী সেই প্রবৃত্তি? কী উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই অগ্নিপরীক্ষা

দিয়ে যাচ্ছে রহস্যময় আগন্তুক? এমনকী সেই গোপন অভীপ্সা যার জন্যে এত কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে বিরামহীনভাবে? যে-হেঁয়ালি আমার অণুতে পরমাণুতে মিশে গিয়ে নিরন্তর ছটফটিয়ে মারছে আমাকে, তার কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে কিন্তু বাদার ওই প্রস্তর কুটিরে। পণ করছি, রহস্য-জালের কেন্দ্রে পৌঁছাব আর ঠিক চব্বিশঘণ্টার মধ্যে!

পাহাড়চুড়োর মানব

আমার প্রাইভেট ডায়ারির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে গত পরিচ্ছেদ শেষ করেছি। কাহিনি ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই সময় থেকেই ভয়ংকর পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বিচিত্র ঘটনার পর ঘটনা। পরের কয়েকদিনের ব্যাপার অবিশ্বাস্যভাবে স্মৃতিপটে দাগ কেটে বসে গেছে। ডায়ারির সাহায্য না-নিয়েই লিখতে পারব। দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেদিন আবিষ্কার করলাম, কাহিনির জের তুলে নেওয়া যাক তার পরের দিন থেকে। প্রথম ঘটনা হল, যে-জায়গায় এবং যে-সময়ে স্যার চার্লস মারা গেছেন, ঠিক সেই জায়গায় এবং সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন কুমবে ট্রেসি নিবাসিনী মিসেস লরা লায়ন্স। দ্বিতীয় ঘটনাটা, পাহাড়ের গায়ে যে প্রস্তর-কুটির, বাদার রহস্যজনক আততায়ী ওত পেতে আছে তার মধ্যে। এহেন দুটো ঘটনা জানবার পর ভেবে দেখলাম অন্ধকারাচ্ছন্ন এই দুই ক্ষেত্রে যদি আলোকপাত করতে না-পারি, তাহলে বুঝতে হবে, হয় বুদ্ধি অথবা সাহস এই দুটোর একটায় ঘাটতি আছে আমার মধ্যে।

মিসেস লায়ন্স সম্বন্ধে আগের দিন সন্ধ্যায় কী খবর সংগ্রহ করেছি, স্যার হেনরিকে তা বলবার সুযোগ পাইনি। কেননা, অনেক রাত পর্যন্ত তাসের আড্ডায় মেতে ছিলেন উনি ডক্টর মর্টিমারের সঙ্গে। প্রাতরাশ খেতে বসে বললাম আমার আবিষ্কার কাহিনি। জিজ্ঞেস করলাম, কুমবে-ট্রেসিতে আমার সঙ্গে আসতে পারবেন কি না। প্রথমে দারুণ উৎসাহ দেখালেন। পরে দু-জনেই ভেবে দেখলাম, আমি একা গেলেই বরং ফলটা ভালো হতে

পারে। সাক্ষাৎকার যত শিষ্টাচারসংগত হবে, খবর ততই কম পাব। স্যার হেনরিকে তাই বাড়িতে রেখে একাই রওনা হলাম তদন্তে। একলা রেখে যাওয়ার জন্যে বিবেকের দংশন অনুভব করলাম অবশ্য, কিন্তু উপায় কী।

কুমবে-ট্রেসিতে পৌঁছে পার্কিন্সকে বললাম ঘোড়া খুলে রাখতে। তারপর বেরোলাম যাকে জেরা করব বলে এসেছি, সেই মহিলাটির খোঁজখবর নিতে। অনায়াসেই খুঁজে পেলাম মিসেস লায়ন্সের সাজানো গোজানো আস্তানা। বিনা ভূমিকায় একজন পরিচারিকা ভেতরে নিয়ে গেল আমাকে। বসবার ঘরে একটা রেমিংটন টাইপ রাইটারের সামনে বসে ছিল এক মহিলা। আমি ঢুকতেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল স্মিত স্বাগত মুখে। আমার অচেনা মুখ দেখে অবশ্য হাসি মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। ফের বসল চেয়ারে। জিজ্ঞেস করল কী অভিপ্রায় আমার।

মিসেস লায়ন্স সম্পর্কে প্রথমেই যে-ছাপটা আমার মনে দাগ কেটে বসে গেল, তা হল তার অসামান্য সৌন্দর্য। চুল আর চোখ দুটোই হ্যাজেল বাদামের মতন উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ। গালে যদিও অজস্র ফুট ফুট দাগ, কিন্তু শ্যামা সুন্দরীর অতুলনীয় গণ্ডরাগের মতোই তা রক্তিমাভগন্ধক-গোলাপের মাঝে সূক্ষ্ম গোলাপের আভার মতন। আবার বলছি, এ-রূপ দেখলেই রূপের তারিফটাই আগে জেগে ওঠে মনের মধ্যে। তারপরেই জাগ্রত হয় সমালোচনার ইচ্ছে। মুখটার মধ্যে কোথায় যেন একটা ত্রুটি থেকে গিয়েছে যার ফলে অমন সৌন্দর্যও মাঠে মারা গিয়েছে। খুটা সূক্ষ্মভাবে লুকিয়েই আছে মুখের কোথাও, হয়তো স্থূল মুখভাবের মধ্যে, অথবা হয়তো চোখের কাঠিন্যের মধ্যে, অথবা শিথিল ঠোঁটের মধ্যে। এসব চিন্তা অবশ্য পরে মাথায় এসেছিল। সেই মুহূর্তে সচেতন ছিলাম

শুধু একটা ব্যাপারে অত্যন্ত রূপসী এক মহিলার সামনে এসেছি আমি এবং আমার আসার কারণটা সে জানতে চাইছে। কী কঠিন কাজ নিয়ে যে এসেছি, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

বললাম, আপনার বাবাকে আমি চিনি।

খুবই কৌশলহীন পরিচয়-পর্ব। ভদ্রমহিলা অচিরাৎ তা সমঝে দিল আমাকে।

বললে, বাবা আর আমার মধ্যে তিলমাত্র মিল কোথাও নেই। আমি তার ধার ধারি না। বাবার বন্ধুরাও আমার বন্ধু নয়। স্যার চার্লস বাস্কারভিল এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া না-করলে অনাহারে মরতে হত আমাকে বাবার ইচ্ছেও ছিল তাই।

স্যার চার্লস বাস্কারভিলের ব্যাপারেই আপনার কাছে আমি এসেছি।

ফুট ফুট দাগগুলো প্রকট হয়ে ওঠে ভদ্রমহিলার গালে।

টাইপরাইটারের উপর স্নায়ুদুর্বল আঙুল কেঁপে ওঠে ভদ্রমহিলার। নার্ভাস হয়েছে। বললে, ওঁর সম্বন্ধে আমি কী বলব বলুন?

ওঁকে আপনি চিনতেন, নয় কি?

আগেই বলেছি তার ঋণ শোধ করতে পারব না। তিনি কৃপা না-করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম না।

চিঠি লিখতেন ওঁকে?

চকিতে চোখ তোলেন ভদ্রমহিলা, পিঙ্গল চোখে জাগে ক্রুদ্ধ চাহনি।

শুধোয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী?

উদ্দেশ্য প্রকাশ্য কেলেঙ্কারি এড়ানো। বিষয়টা হাতের বাইরে যাওয়ার আগে তাই এখানে জিজ্ঞেস করে নেওয়াই মঙ্গল।

চুপ করে রইল মিসেস লায়ন্স। দারুণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। তারপর কিছুটা মরিয়া এবং উদ্ধতভাবে তাকাল আমার পানে।

বললে, ঠিক আছে, জবাব দেব। বলুন, কী জিজ্ঞেস করবেন?

স্যার চার্লসকে চিঠি লিখতেন?

ওঁর বদান্যতা, অন্যের প্রতি দরদ যে আমাকে কতখানি স্পর্শ করেছে, তা বোঝানোর জন্যে দু-একবার লিখেছি।

চিঠিগুলোর তারিখ মনে আছে?

না। দেখাসাক্ষাৎ কখনো হয়েছে?

দু-একবার হয়েছে। কুমবে-ট্রেসিতে যখন এসেছিলেন, তখন। উনি অবসর জীবন যাপন করতেন। যা করতেন, গোপনে করতেন ঢাকঢোল পিটিয়ে লোকের উপকার করা পছন্দ করতেন না।

দেখাসাক্ষাৎ আর চিঠি লেখালেখি যদি এতই কম হত তো আপনার সম্বন্ধে এত খবর উনি পেলেন কী করে যে এতখানি উপকার করে বসলেন?

কঠিন পরিস্থিতি। কিন্তু জবাব যেন তৈরি ছিল।

আমার খারাপ অবস্থার খবর কয়েকজন ভদ্রলোক রাখতেন। এঁদের একজন মি. স্টেপলটন। আমার প্রতিবেশী এবং স্যার চার্লসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। স্যার চার্লস এঁর মুখেই আমার দুঃখের ইতিহাস শুনেছিলেন।

বেশ কয়েক ক্ষেত্রে দান-খয়রাতটা স্টেপলটনের হাত দিয়েই সারতেন স্যার চার্লস, সে-খবর আমি পেয়েছিলাম। তাই ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে সত্যের ছোঁয়াচ পেলাম।

প্রশ্নবর্ষণ কিন্তু চালিয়ে গেলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে স্যার চার্লসকে কখনো লিখেছিলেন?

আবার জ্বলে উঠল মিসেস লায়ন্স।

দেখুন মশায়, এ তো বড়ো অস্বাভাবিক প্রশ্ন করছেন।

দুঃখিত, ম্যাডাম, কিন্তু আবার একই প্রশ্ন করছি।

তাহলে জবাব দিচ্ছি–নিশ্চয় না। স্যার চার্লস যেদিন মারা যান সেদিনও না?

মুহূর্তের মধ্যে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল ক্রোধারুণ মুখখানা। শুষ্ক ঠোঁট নেড়ে বলল কোনোমতে, না। শুধু ঠোঁটই নড়ল শব্দ বেরুলো না। চোখ দিয়ে দেখলাম না বলাটা কান দিয়ে শুনলাম না।

বললাম, নিশ্চয় স্মৃতি প্রতারণা করছে আপনাকে। আপনার লেখা চিঠির একটা লাইন পর্যন্ত শুনিয়ে দিতে পারি জানবেন। শুনবেন? আপনি প্রকৃত ভদ্রলোক বলেই মিনতি করছি দয়া করে এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলবেন এবং ঠিক দশটার সময়ে গেটে হাজির থাকবেন।

ভাবলাম বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেল মিসেস লায়ন্স। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় সামলে নিল নিজেকে।

বললে সঘন নিশ্বাসে, ভদ্রতা বস্তুটা কি একেবারেই নেই?

অবিচার করছেন স্যার চার্লসের ওপর। চিঠিটা উনি পুড়িয়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু পোড়া চিঠি কখনো পড়া যায়। চিঠি লিখেছিলেন তাহলে মানছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিখেছিলাম, অন্তরাত্মাকে যেন বাক্য প্রপাতের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললে মিসেস লায়ন্স, হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলাম। অস্বীকার করব কোন দুঃখে? লিখেছি বলে লজ্জাই-বা কীসের? ওঁর সাহায্য আমি চেয়েছিলাম। দেখা করতে চেয়েছিলাম সেই কারণে। সাক্ষাতে বুঝিয়ে বলতাম–সাহায্য ঠিক পেতাম।

কিন্তু ওইরকম সময়ে কেন?

কেননা পরের দিন সকালেই উনি লন্ডন যাচ্ছিলেন শুনেছিলাম–মাস-কয়েকের আগে ফিরবেনও না। কারণ ছিল বলেই আগেভাগে দেখা করে উঠতে পারিনি।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে দেখা না-করে বাগানের মধ্যে কেন?

ব্যাচেলারের বাড়িতে ওই সময়ে কোনো মহিলা একা যেতে পারে?

আপনি যাওয়ার পর কী হল?

আমি যাই-ই নি।

মিসেস লায়ন্স! হলপ করে বলছি, আমি যাইনি। বাইবেল-টাইবেল যা পারেন নিয়ে আসুন–ছুঁয়ে বলব আমি যাইনি। হঠাৎ একটা বাধা পড়েছিল বলে যাইনি।

কী বাধা?

ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলতে পারব না।

আপনি তাহলে স্বীকার করছেন, স্যার চার্লস যে-জায়গায় সে সময়ে মারা যান, আপনি সেই সময়ে সেই জায়গায় তার সঙ্গে দেখা করব বলেছিলাম–কিন্তু যাননি?

কথাটা সত্যি।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক জেরা করলাম, কিন্তু এর বেশি এগোতে পারলাম না।

শেষকালে সুদীর্ঘ কিন্তু অসম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার স্থগিত রেখে উঠে পড়লাম আমি। বললাম, মিসেস লায়ন্স, যা জানেন তা খুলে না-বলে আপনি বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছেন এবং নিজের

অবস্থা সঙিন করে তুলছেন। পুলিশের শরণ নিলে কিন্তু মহা ফাঁপরে পড়বেন। নিরাপদ বলে যদিই মনে করেন নিজেকে তো ওই তারিখেই স্যার চার্লসের সঙ্গে চিঠি লেখার কথা প্রথমে অস্বীকার করলেন কেন?

পাছে এ থেকে যা নয় তা ভেবে নেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো কেলেঙ্কারিতে ফাঁসিয়ে দেওয়া হতে পারে আমাকে এই ভয়ে বলিনি।

চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলার জন্যে স্যার চার্লসের ওপর এত চাপ দিয়েছিলেন কেন?

চিঠিখানা পড়া থাকলে বুঝতেন, কেন।

পুরো চিঠি পড়েছি তো বলিনি।

কিছুটা অংশ তো বললেন।

শুধু পুনশ্চটুকু বললাম। চিঠি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল বলেই সব জায়গা পড়া যায়নি। প্রশ্নটা আবার করছি। যেদিন মারা যান স্যার চার্লস, সেইদিনই যে চিঠি উনি হাতে পেয়েছিলেন–তা পুড়িয়ে ফেলার জন্যে কেন এত জেদ ধরেছিলেন?

ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত।

প্রকাশ্য তদন্ত দেখছি এড়াতে পারবেন না।

তাহলে বলছি শুনুন। আমার দুঃখের ইতিহাস যদি শুনে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় জানেন হুট করে বিয়ে করে ফেলে পরে আমাকে পস্তাতে হয়েছে?

ওইটুকুই শুনেছি।

এ-জীবনে ক্রমাগত নিগ্রহই পেয়ে আসছি স্বামীর কাছ থেকে যে-স্বামীকে আমি ঘৃণা করি মনেপ্রাণে। আইন তার পক্ষে, যেকোনো দিন জোর করে তার সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য করতে পারে আমাকে। স্যার চার্লসকে চিঠিখানা যখন লিখি, তখন একটা খবর কানে এসেছিল। একটু টাকাপয়সা খরচা করলে এ-জীবনের মতো ওর হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে যাব। আমার কাছে এর চাইতে বড়ো কাম্য আর নেই–স্বাধীনতা পেলেই পাব সুখ, শান্তি, আত্মসম্মান—সমস্ত। স্যার চার্লসের বদান্যতার খবর কে না-জানে বলুন। আমার মুখের এ-কাহিনি যদি শোনেন, সাহায্য না-করে পারবেন না। তাই চিঠি লিখে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলাম।

তবে গেলেন না কেন?

তার আগেই হঠাৎ এক জায়গা থেকে সাহায্য পেয়ে গেলাম বলে।

সঙ্গেসঙ্গে স্যার চার্লসকে লিখে জানালেন না কেন?

তাই জানাতাম। কিন্তু পরের দিন সকালে পড়লাম ওঁর মৃত্যুসংবাদ।

ভদ্রমহিলার গল্পে বাঁধুনি আছে। এত জেরা করেও আলগা করতে পারলাম না। যাচাই করার রাস্তা এখন একটাই। স্যার চার্লস যখন মারা যান, সেই সময়ে কি তার আগে পরে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা সত্যিই রুজু করা হয়েছে কিনা, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

সত্যিই যদি বাস্কারভিল হলে গিয়ে থাকত, অস্বীকার করার সাহস হত না। কেননা, দু-চাকায় টানা হালকা ঘোড়ার গাড়ি না-নিলে যাওয়া সম্ভব হত না এবং রাত একটা দুটো বেজে যেত কুমবে-ট্রেসি ফিরতে। এহেন অভিযান গোপন রাখা যায় না। তাহলে ভদ্রমহিলা হয় পুরো সত্যি বলছে, না হয় আংশিক সত্য বলছে। যুগপৎ হতাশ এবং হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এলাম। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর সব রাস্তাই আবার যেন রুদ্ধ মনে হল–যে-পথ ধরেছি, সেই পথই দেখছি পাঁচিল তুলে বন্ধ করা। অথচ ভদ্রমহিলার মুখ আর কথার ধরন যেন কেমনতরো। যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে, কী যেন লুকিয়ে গেল আমার সামনে। এত ফ্যাকাশেই-বা হল কেন? জোর করে স্বীকারোক্তি বার করতে হয়েছে পেট থেকে তার আগে সব কথাই-বা অস্বীকার করতে গেল কেন? মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল স্যার চার্লসের জীবনে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ তার না-যাওয়ার অনীহা জাগ্রত হল কেন? কারণগুলো নির্দোষ, এইটাই সে বিশ্বাস করাতে চায় আমাকে আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হয় না। আপাতত এই নিয়ে আর এগোতে পারছি না ঠিকই, কিন্তু আর একটা সূত্র হাতে রয়েছে। এইবার তাই নিয়ে পড়া যাক। বাদার বুকে প্রস্তর-কুটিরে হানা দিয়ে দেখা যাক।

সেটাও একটা অতীব অস্পষ্ট ব্যাপার। গাড়িতে চেপে ফেরবার পথে তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। দেখলাম সারি সারি অগুনতি পাথরের কুটির সুদূর অতীতে প্রাচীন মানবরা একদা এখানেই বসবাস করেছে। ব্যারিমুর কেবল বলেছে, এইরকমই একটা কুটিরে সেই আগন্তুক থাকে। কিন্তু কুটির তত রয়েছে শয়ে শয়ে–সমস্ত বাদার বুকে ছড়ানো। অবশ্য পথের নির্দেশ সংগ্রহ করব আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। লোকটাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কালো পাহাড়ের চূড়ায়। সেই জায়গাকে কেন্দ্র করেই তল্লাশি চালাতে হবে। এখান থেকে আরম্ভ করে জলার প্রত্যেকটা কুটিরে আমি অভিযান চালাব–সঠিক কুটির না-পাওয়া পর্যন্ত। যদি তাকে দেখতে পাই, দরকার হলে রিভলবার সামনে ধরে সোজা জিজ্ঞেস করব, কে সে, কেনই-বা এতদিন ফেউয়ের মতন লেগে আছে পেছনে। রিজেন্ট স্ট্রিটের ভিড়ে চোখে ধুলো দিতে পারে, কিন্তু জনহীন বাদায় ঘাবড়ে যাবে। যদি কুটিরের সন্ধান পাওয়ার পরেও দেখি লোকটা ভিতরে নেই–ওত পেতে বসে থাকব যতক্ষণ না সে ফেরে। হোমস তাকে লন্ডনে ধরতে পারেনি। গুরু যা পারেনি, আমি যদি তা পারি এখানে, তাহলে বিজয় গর্বে বুক দশ হাত হবে।

এ-তদন্তে গোড়া থেকেই ভাগ্য বিরূপ হয়েছে আমাদের প্রতি, এবার কিন্তু তা সহায় হল। সাহায্যটা এল মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ডের মাধ্যমে। হাইরোডের ওপরেই ওঁর বাগানের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখ লাল, গালপাট্টা সাদা।

গাড়ির মধ্যে আমাকে দেখেই অনভ্যস্ত উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, শুভদিন ডক্টর ওয়াটসন। ঘোড়াটাকে একটু জিরেন দিন। ভেতরে আসুন। এক গেলাস সুরাপান করুন এবং আমাকে

অভিনন্দন জানিয়ে যান।

নিজের মেয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের ওইরকম দুর্ব্যবহারের বৃত্তান্ত শোনবার পর থেকেই ভদ্রলোকের উপর মেজাজ খিচড়ে ছিল আমার। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি সমেত পার্কিন্সকে বললাম, স্যার, হেনরিকে যেন বলে আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব ডিনার খাওয়ার আগেই! তারপর ফ্রাঙ্কল্যান্ডের পেছন পেছন গেলাম তার খাওয়ার ঘরে।

অকারণে খিকখিক করে বেশ কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে বললেন বুড়ো, মশাই, আজকের দিনটা আমার কাছে স্মরণীয়! বিরাট কাণ্ড করেছি আজকে। একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছি। এ-তল্লাটের লোকগুলোকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব আইন কাকে বলে এবং টের পাইয়ে দেব অন্তত একজন এখনও আছে যে আইনের শরণ নিতে ডরায় না। বুড়ো মিডলটনের বাগানের মধ্যে দিয়ে রাস্তার অধিকার আজ বার করছি–ওরই সদর দরজার এক-শো গজের মধ্য দিয়ে যাবে রাস্তাটা। দারুণ ব্যাপার, নয় কি? সাধারণের অধিকার কেড়ে নেওয়া যে মুখের কথা নয়, তালেবর লোকগুলো বুঝুক! আরও শুনবেন? ফার্নওয়ার্দি থেকে লোকে পিকনিক করতে যেত একটা বনে। আমি ওদের যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি ওখানে আর পিকনিক চলবে না। জঘন্য লোক মশাই। অন্যের সম্পত্তির তোয়াক্কা রাখে না। বোতল আর ছেড়া কাগজ ফেলে এলেই হল? কাতারে কাতারে অন্য

লোকের জায়গায় ঢুকে পড়লেই হল? দুটো মামলাতেই আমি জিতেছি, ডক্টর ওয়াটসন। এ-রকম শুভদিন অনেকদিন আমার জীবনে আসেনি। স্যার জন মরল্যান্ড গুলি চালাতেন নিজেরই এক্তিয়ারে–খরগোশ মারতেন, আমি তাকে অপরের জমিতে অবৈধ প্রবেশের মামলায় ফেলে দিয়েছিলাম। সেই মামলায় জেতবার পর এই প্রথম একটা সত্যিকারের বিরাট কাজ করলাম।

করলেন কীভাবে?

বই খুলেই দেখুন না মশাই। পড়ে লাভ বই ক্ষতি নেই। ফ্রাঙ্কল্যান্ড বনাম মরল্যান্ড কোর্ট কুইন্স বেঞ্চ। দুই পাউন্ড খরচ হয়ে গেছিল বটে, কিন্তু জিতে তত গেলাম।

তাতে কি আপনার লাভ কিছু হয়েছে?

কিস্‌সু না মশায়, কিচ্ছু না। অহংকার করে বলতে পারি তিলমাত্র স্বার্থ নেই এসব কেসে। জনসাধারণেরও একটা কর্তব্য আছে! যা কিছু করেছি জানবেন সেই কর্তব্যের তাড়নাতেই করেছি। আমি জানি আজ রাতেই ফার্নওয়ার্দির লোকেরা আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করবে। গতবার এ-কাণ্ড ওরা করেছিল, পুলিশকে বলেছিলাম এসব প্রকাশ্য নোংরামি যেন বন্ধ করা হয়। দেশের কলঙ্ক এ-অঞ্চলের পুলিশবাহিনী পুলিশ সাহায্য আমার প্রাপ্য অথচ আমাকে তা দেয়নি। ফ্রাঙ্কল্যান্ড বনাম রেজিনা মামলা এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে জনসাধারণের। তখনই বলেছিলাম, আমার ওপর এ-ব্যবহার করা হলে তার জন্যে পস্তাতে হবে কিন্তু কথাটা ফলতে আরম্ভ করেছে।

কীভাবে? শুধোই আমি।

এমন একটা ভান করল বুড়ো যেন অনেক খবরই জেনে বসে আছে।

যা জানবার জন্যে ওরা ছটফটিয়ে মরছে, আমি তা ওদের জানাতে পারি। কিন্তু হাজার লোভ দেখালেও বলব না রাসকেলদের।

ছলছুতো করে সরে পড়বার তালে ছিলাম, এই কথা শুনে কিন্তু ইচ্ছে হল গোপন খবরটা শুনে যাই। বুড়োর মতিগতি জানা হয়ে গিয়েছে বলেই ঠিক করলাম বেশি আগ্রহ দেখাব না–দেখালেই আর মুখ আলগা করবেন না।

উদাসীনভাবে তাই বললাম, গোরু ভেড়া চুরির কেস বোধ হয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরে তার চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? বাদার সেই কয়েদির কথা খেয়াল আছে?

চমকে উঠলাম। বললাম, জানেন সে কোথায়?

ঠিক কোথায় আছে জানি না বটে, কিন্তু পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার মতো খবর রাখি। খাবারটা জোগাড় করে কোত্থেকে, সেটা বার করতে পারলেই কিন্তু খাবারের পেছন পেছন গিয়ে আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাবে–সোজা এই ব্যাপারটা কখনো ভেবেছেন?

বুড়ো দেখছি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চলেছে! মহা অস্বস্তিতে পড়লাম আমি। বললাম, তা ঠিক। কিন্তু সে বাদার মধ্যেই আছে জানছেন কী করে?

খাবার যে নিয়ে যায়, নিজের চোখে তাকে দেখেছি বলেই জানি।

ব্যারিমুরের কথা ভেবে বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। অনধিকার চর্চাকারী মহাকুচুটে এই বুড়ো যদি সব জেনে বসে থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে! বুড়োর পরের মন্তব্যটা শুনেই কিন্তু বুকটা হালকা হয়ে গেল আমার।

শুনলে অবাক হবেন, লোকটার কাছে খাবার নিয়ে যায় একটা বাচ্চাছেলে। প্রত্যেক দিন ছাদে বসে টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখি তাকে। একই রাস্তা দিয়ে একই সময়ে যায় রোজ। কয়েদি ছাড়া আর কার কাছে যায় বলতে পারেন?

কী কপাল আমার! প্রাণপণ চেষ্টায় মুখখানা নির্বিকার রাখলাম ভিতরের প্রচণ্ড কৌতূহলকে বাইরে আসতে দিলাম না। বাচ্চা ছেলে। ব্যারিমুরও বলেছিল, বাদায় আগন্তুকের খাবার জোগান দেয় একটা ছেলে! ফ্রাঙ্কল্যান্ড তাহলে এর পেছনে চোখ দিয়ে বসে আছেন, কয়েদির পেছনে নয়। বুড়োর পেট থেকে আরও খবর বার করতে পারলে

অনেক সহজ হয়ে আসে আমার কাজ–টো টো করে আর খুঁজতে হয় না বাদায়। তবে অবিশ্বাস আর ঔদাসীন্য–দুটো জব্বর অস্ত্র দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে আমায়।

আমার তো মনে হয় বাদার কোনো মেষপালকের ছেলে বাপের কাছে খানা নিয়ে যায়।

এতটুকু প্রতিবন্ধক সইতে পারেন না বুড়ো স্বেচ্ছাচারী আগুন ছিটকে আসে ভেতরে থেকে। বিষাক্ত চোখে চাইলেন আমার পানে–ক্রুদ্ধ বেড়ালের গোঁফের মতন খাড়া হয়ে গেল ধূসর জুলপি।

তাই নাকি মশাই? ধু-ধু বিস্তৃত জলাভূমির দিকে আঙুল তুলে বলেন বৃদ্ধ। দূরে ওই কালো পাহাড়টা চোখে পড়ছে? তার ওদিকে নীচু পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন?–ওপরে কাটাঝোপ? সারা বাদায় এর চাইতে পাথুরে জায়গা আর নেই। মেষপালক কি ও-জায়গায় থাকে? আপনার ধারণাটা একেবারে উদ্ভট।

মিন মিন করে বললাম, তা হতে পারে। না-জেনে বলেছি তো। নতিস্বীকারে কাজ হল। খুশি হয়ে বুড়ো বিশ্বাস করে বলল আরও কথা।

মশায়, যথেষ্ট কারণ না-থাকলে কোনো কথা আমি বলি না জানবেন। বোঝা নিয়ে হাঁটতে ছোঁড়াটাকে একবার নয়–বহুবার দেখেছি। রোজ–এমনকী মাঝে মাঝে দিনে দু-বার–দাঁড়ান, দাঁড়ান, ডক্টর ওয়াটসন। চোখের ভুল, না, সত্যিই এই মুহূর্তে কী যেন পাহাড়ের ধারে নড়ছে না?

মাইল কয়েক দূরে হলেও ম্যাড়মেড়ে সবুজ এবং ধূসর পটভূমিকায় কালচে বিন্দুর মতো কী যেন একটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো উঠতে উঠতে চেঁচাতে লাগলেন ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড চলে আসুন মশায়, চলে আসুন। নিজের চোখেই দেখুন ঠিক বলছি কিনা।

চ্যাটালো ছাদে তিনপায়ার উপর বসানো টেলিস্কোপটা দেখলে ভয় লাগে। হাতের তেলো দিয়ে চোখের ওপর ঠুলি ধরে যন্ত্রে চোখ রাখলেন ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড এবং চেচিঁয়ে উঠলেন হৃষ্টকণ্ঠে।

চটপট, ডক্টর ওয়াটসন, চটপট পাহাড় পেরিয়ে গেলে আর দেখতে পাবেন না!

সত্যিই উঞ্ছ চেহারার একটা ছোঁড়াকে দেখা যাচ্ছে, কাঁধের ওপর একটা ছোটো বান্ডিল নিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড় ভেঙে ওপর উঠছে। কিনারায় পৌঁছানোর পর মুহূর্তের জন্যে সুনীল শীতল আকাশের বুকে দেখলাম তার ছেড়া পোশাক পরা কদাকার মূর্তি। চোরের মতো আশপাশে এমনভাবে তাকিয়ে নিল যেন ফেউ লেগেছে পেছনে। পরক্ষণেই অদৃশ্য হল পাহাড়ের ওদিকে।

কী! ঠিক বলিনি?

সত্যি একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে! চুপিসারে যাচ্ছে কোনো গোপন উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যটা কী, তা যেকোনো গাঁইয়া পুলিশও বলে দেবে। কিন্তু আমার পেট থেকে একটা কথাও বেরোবে না। ডক্টর ওয়াটসন, কথা দিন, আপনিও বলবেন না। একটা কথাও নয়! বুঝেছেন?

আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

খুব যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছে ওরা আমার সঙ্গে, ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বনাম রেজিনা মামলা সংক্রান্ত ঘটনা যখন ফাঁস হতে থাকবে, টি-টি পড়ে যাবে দেশে, ধিক্কারের শেষ থাকবে না। পুলিশকে কোনোভাবেই সাহায্য করব না–শত প্রলোভনেও নয়। ওরা চায় আমার কুশপুত্তলিকা নয়–আমাকেই দাহ করতে। যাচ্ছেন নাকি! এমন একটা শুভদিনে মদের পাত্রটা খালি করতে যদি দয়া করে সাহায্য করতেন।

অনুরোধে টললাম না। শেষকালে আমার সঙ্গে হেঁটে বাড়ি পর্যন্ত আসতে চাইলেন বৃদ্ধ। অতিকষ্টে নিবৃত্ত করলাম। যতক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে, ততক্ষণ রাস্তা ধরেই হাঁটলাম। তারপরেই নেমে এলাম বাদায় ছোঁড়াকে যে-পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হতে দেখেছি, চললাম সেই পাহাড় অভিমুখে। অদৃষ্ট এখন আমার সহায়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা বা উদ্যমের অভাবে দৈব-প্রদত্ত এই সুযোগ যাতে হেলায় না-হারাই, খর-নজর রাখলাম সেদিকে।

চুড়োয় যখন পৌঁছালাম, সুর্য তখন ডুবু-ডুবু। আমার পেছনে টানা লম্বা গড়ানের একদিকে পড়েছে সোনালি-সবুজ ছায়া, আর একদিকে ধূসর ছায়া। বহুদূরে আকাশ যেখানে মর্তে মিশেছে, সেইখানে ঝাঁপসাভাবে দেখা যাচ্ছে বেলিভার আর ভিক্সেন পাহাড়ের অত্যাশ্চর্য খোঁচা খোঁচা চেহারা। দিগন্তব্যাপী ধু-ধু বিস্তৃতির কোথাও কিছু নড়ছে না, কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। অনেক উঁচুতে নীল স্বর্গের দিকে উড়ছে গাংচিল বা কার্লিউ পাখি জাতীয় একটা জলচর বিহঙ্গ। নীচের মরুভূমি আর ওপরকার বিশাল খিলেনের মাঝে জীবিত প্রাণী বলতে যেন শুধু সে আর আমি, অনুর্বর এই দৃশ্য নিঃসঙ্গতার অনুভূতি এবং আরব্ধ কর্মের রহস্য ও জরুরি প্রয়োজনীয়তা বুকের মধ্যে দুরুদুরু কাঁপন জাগাল। ছেলেটাকে কোনোদিকেই দেখা যাচ্ছে না। আমার পায়ের নীচে কিন্তু পাহাড়ের খাঁজে বৃত্তাকারে সাজানো কতকগুলো পাথরের কুটির ঠিক মাঝখানেরটির মাথায় এখনও অটুট রয়েছে ছাদ–আবহাওয়ার দাপট থেকে মাথা বাঁচাননার পক্ষে যথেষ্ট। দেখেই তুরুক নাচ নেচে উঠল আমার হৃদয়। এই সেই বিবর—এইখানেই ঘাপটি মেরে রয়েছে নতুন আগন্তুক। গুপ্ত আস্তানার চৌকাঠে পা দিয়েছি, ওর গুপ্তরহস্য এখন আমার হাতের মুঠোয়।

প্রজাপতির জাল দুলিয়ে স্টেপলটন যেমন আস্তে আস্তে হাঁটেন, আমিও তেমনি ধীরেসুস্থে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। বসবাসের অনেক নিদর্শন চোখে পড়ল। গোলাকার মসৃণ বিরাট বিরাট পাথরের চাইয়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা একটা সরু রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে দরজার মতো হাঁ-করা একটা ভাঙাচোরা প্রবেশপথের সামনে। ভেতরে সব নিস্তব্ধ। অজ্ঞাত ব্যক্তিটি হয় ভেতরে ওত পেতে বসে রয়েছে নয়তে টহল দিচ্ছে বাদায়। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় টান-টান হয়ে ওঠে আমার স্নায়ু! সিগারেট ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলাম রিভলবারের কুঁদো এবং দ্রুতপদে হেঁটে ঝুঁকে পড়লাম ভেতরে। তাকিয়ে দেখি কুটির শূন্য।

কিন্তু আমি যে ভুল করিনি, মিছে ছুটে আসিনি, তার বহু চিহ্ন রয়েছে ঘরের সর্বত্র। এইটেই তার ডেরা বটে। একদা যে প্রস্তরবেদিতে প্রস্তরযুগের মানব নিদ্রা গিয়েছে, কতকগুলো কম্বল একটা বর্ষাতি মুড়ে গোল পাকিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর। বদখত একটা অগ্নিচুল্লিতে স্তূপীকৃত ছাই। পাশে রান্নার বাসন আর আধ বালতি জল। আলো-আধারিতে চোখ সয়ে যাওয়ার পর দেখলাম কোণে কোণে জড়ো করা বেশ কিছু খালি টিন–যেন বেশ কিছুদিন ধরেই মানুষ আছে এখানে। ধাতুর তৈরি একটা পানপাত্রর পাশে আধ বোতল সুরাও চোখে পড়ল। মাঝখানে একটা চ্যাটালো পাথরকে ব্যবহার করা হয়েছে টেবিলের মতো। ওপরে একটা কাপড় বাঁধা ছোটো পুটলি টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে ছোকরার কাঁধে দেখেছিলাম। পুঁটলির ভেতরে একটা পাঁউরুটি, এক-টিন মাংস এবং দুটিন পিচফলের মোরব্বা। দেখেশুনে নামিয়ে রাখবার পর বুকটা নেচে উঠল পুঁটলি-চাপা-দেওয়া একটা কাগজ দেখে। কী যেন লেখা রয়েছে কাগজে। তুলে দেখলাম পেনসিল দিয়ে মোটা মোটা হরফে লেখা একটা পঙক্তি :

ডক্টর ওয়াটসন কুমবে-ট্রেসি গেছেন।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কাগজটা হাতে নিয়ে ছোট খবরটার মানে বুঝতেই গেল ঝাড়া একটা মিনিট। লোকটা তাহলে স্যার হেনরির পেছনে নয়, লেগেছে আমার পেছনে। নিজে পিছু নেয়নি, লেলিয়ে দিয়েছে এই ছোকরাকে–খবরটা তারই আনা। জলায় আমি

যা কিছু করেছি, কিছুই হয়তো এদের চোখ এড়ায়নি। প্রতিমুহূর্তেই তো টের পেয়েছি একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ঘিরে রয়েছে আমাকে, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছি একটা অতি-সূক্ষ্ম জাল সুকৌশলে ও সুনিপুণভাবে গুটিয়ে আনা হচ্ছে আমার চারধারে–এত আলতোভাবে চেপে বসছে যে জালে জড়িয়ে যাওয়ার পর চরম মুহূর্তেই কেবল বোঝা যায় তার অস্তিত্ব।

একটা রিপোর্ট যখন পাওয়া গেছে, তখন খুঁজলে নিশ্চয় আরও রিপোর্ট পাবো। সেই আশায় তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কুটিরের অভ্যন্তরে, কিন্তু কোনো চিহ্নই পেলাম না। অসাধারণ এই জায়গায় এভাবে যে লোক বসবাস করতে পারে, তার স্বভাব চরিত্র বা মতিগতিরও কোনো নিদর্শন পেলাম না। শুধু বুঝলাম, লোকটা গ্রিসদেশের স্পার্টানদের মতো কষ্টসহিষ্ণু। আরাম-টারামের ধার ধারে না। ফুটো ছাদের পানে তাকিয়ে তুমুল বর্ষার কথা ভাবতেই উপলব্ধি করলাম কী প্রচণ্ড এবং অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এহেন নিরানন্দ আশ্রমে সে থেকেছে অহোরাত্র। কে সে? বিষধর শত্রু? দেবদূত? পণ করলাম, না-জানা পর্যন্ত কুটির ছেড়ে বেরোব না।

বাইরে সূর্য ডুবছে। পশ্চিম আকাশ লাল আর সোনা রঙে যেন জ্বলছে। অনেক দূরে সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির মাঝে বিক্ষিপ্ত জলাশয়গুলোর ছোপছোপ লালচে আভা ঠিকরে যাচ্ছে। বাস্কারভিল হলের জোড়া টাওয়ার আর অনেকদূরে গ্রিমপেন গ্রামের মাথায় ঝাঁপসা ধোঁয়া ভাসতে দেখা যাচ্ছে। এই দুইয়ের মাঝে পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে স্টেপলটন ভাইবোনের বাড়ি। গোধুলির সোনালি প্রভায় সবই আশ্চর্য কোমল শান্ত ও স্নিগ্ধ; তা সত্ত্বেও প্রকৃতির এই অনাবিল শান্তিতে ভাগ বসাতে পারছে না আমার

অন্তরাত্মা–প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠছে আসন্ন সাক্ষাৎকারের নামহীন আতঙ্কে। বুক ধড়াস ধড়াস করা সত্ত্বেও অবিচল সংকল্পে বসে রইলাম কুটিরের অন্ধকার কোণে চনমনে হয়ে রইল প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র, অশুভ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল প্রতিটি কোণ–এ-প্রতীক্ষা এই কুটিরের অস্থায়ী বাসিন্দার জন্যে।

অবশেষে শুনলাম তার পদশব্দ। অনেকদূরে পাথরের ওপর বুট জুতোর তীক্ষ্ণ কটাৎ কটাৎ আওয়াজ হল। ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল বুটের শব্দ। সবচেয়ে অন্ধকার কোণে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, পকেটের মধ্যে তৈরি রাখলাম পিস্তল। লোকটার চেহারা ভালোভাবে দেখার আগে কিছুতেই তাকে জানতে দেব না আমি লুকিয়ে আছি এখানে। বেশ কিছুক্ষণ বিরতি গেল–থেমে গিয়েছে আগন্তুক। তারপর আবার এগিয়ে এল পদশব্দ। একটা ছায়া পড়ল কুটিরের সামনে খোলা জায়গায়।

শুনলাম একটা অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর, অপূর্ব সন্ধে, ভায়া ওয়াটসন। ভেতরের চাইতে বাইরে এলে কিন্তু আরও ভালো লাগবে।

বাদায় মৃত্যু

সেকেন্ড খানেক কি দুয়েক দম বন্ধ করে বসে রইলাম, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না তারপরেই ফিরে পেলাম বাকশক্তি এবং বোধশক্তি। নিমেষের মধ্যে দায়িত্বের একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল মন থেকে। ছুরির মতো ধারালো বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ নিরুত্তাপ এই কণ্ঠস্বরের অধিকারী ত্রিভুবনে একজনই আছে।

উল্লাসে তাই ফেটে পড়লাম পরক্ষণেই, হোমস! হোমস!

বাইরে এসো। দয়া করে রিভলবারটা সামলে রেখো।

দরজার ওপরকার এবড়োখেবড়ো পাথরটার তলা দিয়ে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দেখলাম, একটা পাথরের ওপর বসে বন্ধুবর। আমার চোখ-মুখের বিস্ময় দেখে কৌতুকে নৃত্য করে উঠল ধূসর দুই চক্ষু। একটু রোগা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বেশ সতর্ক এবং উজ্জ্বল। রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জের মতো দেখাচ্ছে মুখখানা, ঝড়ো হাওয়ায় একটু রুক্ষও হয়েছে। টুইড সুট আর কাপড়ের ক্যাপ পরায় বাদার আর পাঁচটা টুরিস্টের মতোই দেখতে হয়েছে তাকে। বেড়ালের মতো নিজের চেহারাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও এতটুকু ত্রুটি দেখলাম না। দাড়িগোঁফ কামিয়ে পোশাক পরিচ্ছদে যেমন ফিটফাট থাকে বেকার স্ট্রিটে, এখানেও রয়েছে তেমনি।

দু-হাতে ওর দু-হাত সবলে চেপে ধরে বললাম, জীবনে কাউকে দেখে এমন খুশি আমি হইনি।

এমন অবাকও হওনি?

তা মানতেই হবে। বিশ্বাস করো, তুমি একাই অবাক হওনি। তুমি যে আমার গোপন আস্তানা বার করে ফেলেছ জানতাম না। শুধু বার করা নয়, ভেতরে ঢুকে বসে আছে– এটাও কল্পনা করতে পারিনি। পারলাম দরজা থেকে বিশ পা দূরে এসে।

আমার পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চয়?

না, ওয়াটসন। দুনিয়ার লোকের পায়ের ছাপের মধ্যে তোমার পায়ের ছাপ চিনে নেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই। সত্যিই যদি ঠকাতে চাও আমাকে, তোমার তামাকওলা পালটাও। পোড়া সিগারেটের গায়ে ব্র্যাডলি অক্সফোর্ড স্ট্রিট ছাপাটা দেখলেই বুঝে ফেলি ধারেকাছে। কোথাও রয়েছে আমার বন্ধু ওয়াটসন। রাস্তার ধারেই দেখো পড়ে রয়েছে পোড়া সিগারেটটা। তেড়েমেড়ে শূন্য কুটিরে ঢোকবার সময়ে নিশ্চয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছিলে।

ঠিক ধরেছ।

তোমার নাছোড়বান্দা স্বভাবটা তো জানি সত্যিই প্রশংসা করবার মতো। তাই সিগারেট যখন তোমার, তখন নিশ্চয় হাতিয়ার বাগিয়ে বসে আছো কুটিরে বাসিন্দার ফেরার প্রতীক্ষায়

এটুকু বুঝতে দেরি হল না। তুমি তাহলে সত্যিই ভেবেছিলে আমিই ক্রিমিন্যাল?

তুমি কে তা জানতাম না। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলাম, সেটাই জানব।

চমৎকার, ওয়াটসন! ঠিক এই জায়গাতেই যে আছি বুঝলে কী করে? কয়েদির পেছনে ধাওয়া করছিলে যে-রাত্রে, তখন নিশ্চয় দেখেছিলে? বোকার মতো চাঁদকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম পাহাড়চুড়োয়।

হ্যাঁ, তখনই দেখেছি তোমায়।

তারপর নিশ্চয় একধার থেকে সব কুটিরে খানাতল্লাশি চালিয়ে এখানে এসেছ?

আরে না। তোমার ছোকরাটাকে দেখা গেছে। তাতেই বুঝেছি কোথায় খোঁজা দরকার।

বুঝেছি। ওই বুড়ো টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখেছ। লেন্সের ঝিলিক কোনদিক থেকে এল প্রথমে ধরতে পারিনি। উঠে দাঁড়াল হোমস, উঁকি দিল কুটিরের ভেতরে! এই তো,

কার্টরাইট খাবারদাবার এনেছে দেখছি। কাগজটা কীসের? তাই বল, কুমবে ট্রেসি গেছিলে?

হ্যাঁ।

মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে?

ধরেছ ঠিক।

শাবাশ! দু-জনেরই গবেষণা দেখছি সমান্তরাল রেখায় ছুটছে। গবেষণার ফল এক করলে দেখা যাবে কেস সম্বন্ধে সব খবরই জানা হয়ে গেছে।

তুমি যে এসেছ, এইতেই আমি খুশি। দায়িত্ব আর রহস্য সইতে পারছিল না আমার স্নায়ু। কিন্তু এখানে এলে কীভাবে? করছই-বা কী? আমি তো ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রিটে বসে এখনও ব্ল্যাকমেলিং কেস নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছ।

আমি চেয়েছিলাম তুমি তাই ভাবো।

তার মানে? তুমি আমাকে খাঁটিয়ে নিতে চাও, কিন্তু বিশ্বাস কর না! হোমস, আরও একটু ভালো ব্যবহার তোমার কাছে আশা করেছিলাম।

ভায়া, অন্যান্য কেসের মতো এ-কেসেও তুমি যা করেছ তা ভোলবার নয়। সামান্য একটু চালাকি অবশ্য করতে হয়েছে, ক্ষমা নিশ্চয় করবে। সত্যি কথা বলতে কী, এটুকু করতে হয়েছে কিছুটা তোমার কথা ভেবে। কী সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তুমি আঁচ করে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। নিজে এসে সব দেখতে চেয়েছিলাম। স্যার হেনরি আর তোমার সঙ্গে থাকলে আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই তোমার দৃষ্টিভঙ্গির মতোই হত। তা ছাড়া, আমার উপস্থিতিতে আমাদের দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষও হুঁশিয়ার হয়ে যেত। কিন্তু এখন কত সুবিধে দেখো। বাস্কারভিল হলে থাকলে যেখানে খুশি যেতে পারতাম না–এখানে থেকে পারি। কেউ জানেও না আমি কে। সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে চুপটি করে বসে আছি। সংকট মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ব সর্বশক্তি নিয়ে।

কিন্তু আমাকে আঁধারে রাখা হল কেন?

জানলে কি আমার বেশি উপকারে আসতে? আসতে না। উলটে আমার এখানকার আস্তানা হয়তো জানাজানি হয়ে যেত। নানা ধরনের খবর দেওয়ার জন্যে দৌড়ে আসতে, অথবা আমার থাকা খাওয়ার দুরবস্থা দেখে তোমার মতো হৃদয়বান মানুষ সহ্য করতে পারত না–আরামে যাতে থাকতে পারি সেইরকম টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসতে, অযথা একটা ঝুঁকি নিতে হত। এক্সপ্রেস অফিসে কার্টরাইট ছোকরার কথা মনে আছে? ওকে সঙ্গে এনেছি টুকটাক জিনিসপত্র এনে দেওয়ার জন্যে রুটি আর কাঁচা জামা প্যান্ট–এই তো আমার চাই। এর বেশি আর কী দরকার বলো? সেইসঙ্গে ওর বাড়তি একজোড়া চোখ আর ভারি চটপটে একজোড়া পায়ের সাহায্যও পেয়েছি। দুটোই সমান কাজে লেগেছে।

তার মানে আমার রিপোোর্টগুলো কোনো কাজেই লাগেনি? উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল আমার। মনে পড়ল কী কষ্টে লিখেছি প্রতিটি রিপোর্ট। অহংকারও হয়েছিল খুব।

পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করল হোমস।

ভায়া, এই দেখো তোমার রিপোোর্ট। বিশ্বাস করো, প্রত্যেকটা লাইন খুঁটিয়ে পড়েছি। রিপোর্ট যাতে হাতে আসে, তার ব্যবস্থাও করেছিলাম চমৎকার শুধু যা একদিন দেরি হত। অসাধারণ দুর্বোধ্য এই কেসে তুমি যে দারুণ উদ্যম আর ধীশক্তি দেখিয়েছ, তার জন্যে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন রইল।

আমাকে ঠকানো হয়েছে, এই চিন্তাটা তখনও কুরে কুরে খাচ্ছে আমার ভেতরটা। কিন্তু হোমসের প্রাণঢালা প্রশংসায় রাগ জল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বুঝলাম ভালোই করেছে। হোমস। জলায় সে আছে, এটা আমার না-জানা থাকায় বরং মঙ্গলই হয়েছে।

এই তো চাই, আমার মুখের অন্ধকার কেটে যেতে দেখে বলল ও। এবার বলো মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করে কী খবর জানলে। কুমবে ট্রেসি নিবাসিনী এই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে অনেক খবরই যে পাওয়া যাবে, এটা আমি বুঝেছি বলেই ধরে নিয়েছিলাম ওখানে হানা দিয়েছ তুমি। সত্যি কথা বলতে কী, তুমি যদি আজকে না-যেতে, আমি নিজে কাল যেতাম।

সূর্য অস্ত গেছে, বাদায় আঁধার ছড়িয়ে পড়ছে। হাড়-কাঁপানো বাতাস বইতে শুরু করেছে। কুটিরের ভেতরটা উষ্ণ বলে ভেতরে ঢুকলাম। গোধূলির আলোয় পাশাপাশি বসে হোমসকে বললাম কী কী কথা হয়েছে ভদ্রমহিলার সঙ্গে। শুনে ও এতই আগ্রহী হল যে কিছু ঘটনা দু-বার বলতে হল ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।

শেষ করার পর বলল, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা। অত্যন্ত জটিল এই ধাঁধার একটা জায়গার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না–এবার পেলাম। এই ভদ্রমহিলা আর স্টেপলটনের মধ্যে যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে নিশ্চয় তা উপলব্ধি করেছ?

এ-রকম কোনো নিবিড় ঘনিষ্ঠতার খবর আমার জানা নেই।

কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ওদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়, চিঠি লেখালেখি হয় এবং পরিপূর্ণ বোঝাবুঝি আছে দু-জনের মধ্যে। ফলে, হাতে একটা শক্তিশালী অস্ত্র পাওয়া গেল। এই অস্ত্র হেনে স্ত্রী-কে যদি ওর কাছ থেকে আলাদা করা যেত—

ওঁর স্ত্রী?

অনেক খবরই তো দিলে, প্রতিদানে আমি তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। মিস স্টেপলটন নামে যিনি পরিচিতা, আসলে তিনি ওঁর স্ত্রী।

বল কী হোমস! সঠিক জেনে বলছ তো? তাই যদি হয় তো বউয়ের প্রেমে স্যার হেনরিকে পড়তে দিলেন কীভাবে?

প্রেমে পড়ার ফলে স্যার হেনরি ছাড়া আর কারো ক্ষতি হবে না। তুমি নিজেও লক্ষ করেছ, স্যার হেনরি যাতে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক প্রেমের পর্যায়ে না-পৌঁছে যান, সে-ব্যাপারে কড়া নজর রেখেছেন স্টেপলটন। ফের বলছি শোনো, ভদ্রমহিলা ওঁর বোন নন, স্ত্রী।

কিন্তু এত প্রতারণার কারণটা কী?

বোন হিসেবে ভদ্রমহিলাকে আরও বেশি কাজে লাগানো যাবে বলে।

ধাঁ করে অনেকগুলো ব্যাপার মাথা চাড়া দিল মনের মধ্যে। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমনি অনেক সহজাত অনুভূতি আর আবছা সন্দেহ নিমেষের মধ্যে আকার পরিগ্রহ করে ঘিরে ধরল প্রকৃতিবিদকে। বর্ণহীন, আবেগহীন, উদাস লোকটার মধ্যে আচমকা দেখতে পেলাম একটা মহাভয়ংকরের প্রতিমূর্তি অপরিসীম ধৈর্য আর কৌশলের প্রতিমূর্তি–মুখে যার হাসি কিন্তু মনে যার খুনের সংকল্প হাতে যার প্রজাপতির জাল, আর মাথায় স্ত্রহ্যাট—অত্যন্ত মামুলি, সাদাসিদে, নির্বিরোধী মানুষ যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

এই কি তাহলে আমাদের আসল শত্রু? এই লোকই কি ফেউয়ের মতো লেগেছিল পেছনে?

ধাঁধার জবাব তাই বলছে।

হুঁশিয়ারিটা তাহলে নিশ্চয় ওর স্ত্রীর লেখা!

এক্কেবারে ঠিক।

অর্ধ-দৃশ্য, অর্ধ-অনুমিত যেসব দানবিক শয়তানিতে পরিবৃত ছিলাম এতদিন, এবার তা অন্ধকারের মধ্যে থেকে স্পষ্ট চেহারা নিয়ে ফুটে উঠল আমার সামনে।

হোমস, তুমি কি নিশ্চিত? ভদ্রমহিলা যে ওঁর স্ত্রী জানছ ক করে?

তার স্বমুখে বলা আত্মজীবনীর একটা টুকরো থেকে। তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন তার আলাপ, সেদিন মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা। তারপর নিশ্চয় পস্তেছেন পরে। উত্তর ইংলন্ডে এককালে স্কুলমাস্টার ছিলেন ভদ্রলোক। স্কুলমাস্টারের নাড়িনক্ষত্র জানার মতো সোজা কাজ আর নেই। শিক্ষাবিদদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। যেকোনো শিক্ষাব্রতী সম্বন্ধে খবর নিতে হলে এদের দ্বারস্থ হলেই হল। একটু খোঁজ নিতেই জানলাম, বর্বরোচিত পরিস্থিতির দরুন একটা স্কুলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে এবং স্কুলের মালিক সস্ত্রীক উধাও হয়ে যান। তখন তাঁর নাম অন্য ছিল। কিন্তু চেহারার বিবরণ মিলে গেল। তারপর যখন জানলাম কীটবিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন ভদ্রলোক, সম্পূর্ণ হল শনাক্তকরণ।

অন্ধকার সরে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও অনেক অংশ ছায়া ঢাকা রয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, এই ভদ্রমহিলা ওঁর স্ত্রী হলে, মিসেস লরা লায়ন্স এর মধ্যে আসছে কী করে?

তোমার নিজের গবেষণাতেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে অনেক কিছুই স্পষ্ট করে তুলেছ। স্বামীর সঙ্গে ভদ্রমহিলার বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা চলছে, এটা জানতাম না। তাহলেই দেখো, স্টেপলটনকে অবিবাহিত মনে করে তার স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন সে দেখছে।

স্বপ্ন যখন ধূলিসাৎ হবে?

তখন তাকে আমাদের কাজে লাগানো যাবে। কালকে আমাদের প্রথম কাজ হবে তার সঙ্গে দেখা করা–দু-জনেই যাব। ওয়াটসন, তুমি কিন্তু দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে সরে রয়েছ অনেকক্ষণ। তোমার এখন বাস্কারভিল হলে থাকা উচিত।

পশ্চিম দিগন্তে শেষ রক্তরশ্মি ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে। রাতের যবনিকা চেপে বসছে বাদার বুকে। বেগুনি আকাশে চিকমিক করছে কয়েকটা ক্ষীণ তারকা।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, যাবার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব, হোমস। তোমার আর আমার সঙ্গে এত লুকোচুরি খেলার কোনো প্রয়োজন আছে কী? মানে কি এসবের বলতে পারো? কী চায় সে? মতলবটা কী?

গলার স্বর খাদে নেমে এল হোমসের। বললে, নরহত্যা, ওয়াটসন, ভেবেচিন্তে, ঠান্ডা মাথায়, প্ল্যানমাফিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষ খুন। তার জাল যেমন সেঁটে বসছে স্যার হেনরির চারধারে, আমার জালও তেমনি গুটিয়ে আসছে তার চারধারে তোমার সাহায্য পাওয়ায় বলতে পারো এখন তাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। ভয় পাচ্ছি শুধু একটা বিপদকে। আমরা আঘাত হানবার মতো প্রস্তুতি শেষ করার আগেই হয়তো উনি মরণ মার মেরে বসে থাকবেন। আর একদিন খুব জোর দু-দিনের মধ্যেই কেস সম্পূর্ণ করব। এই দুটো দিন তুমি স্যার হেনরিকে দু-হাতে আগলে রাখো–রুগণ শিশুকে মা যেভাবে চোখে চোখে রাখে, সেইভাবে তাকে চোখে চোখে রাখো। আজকের অভিযান অবশ্য অনেক কাজ দিয়েছে, কিন্তু আমার মন বলছে তুমি তার কাছছাড়া না-হলেই ভালো করতে ওই শোনো।

বিকট বীভৎস একটা আর্ত চিৎকারে ফালা ফালা হয়ে গেল রাতের আকাশ–নিমেষ মধ্যে যেন খান খান হয়ে গেল বাদার নৈঃশব্দ্য রক্ত-জল-করা ভয়াল ভয়ংকর সেই চিৎকারে। নিঃসীম আতঙ্ক যেন হাহাকার হয়ে ফেটে পড়ল–ঠান্ডা বরফের মতো যেন জমে গেল আমার ধমনীর রক্ত।

বললাম নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, হা ভগবান! এ কী? এ কীসের আওয়াজ?

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠেছিল হোমস। কুটিরের দ্বার দেশে দেখলাম ওর ক্রীড়াপটু দেহরেখা। কাঁধ বেঁকিয়ে, মুণ্ড বার করে উঁকি মারছে নীরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে।

চুপ! একদম চুপ! বলল ফিসফিস করে।

কলজে-ছেড়া তীব্রতার জন্যে অত উচ্চ-নিনাদী শুনিয়েছিল চিৎকারটা চিৎকারের উৎস ছিল কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে কোথাও। এবার তা ফেটে পড়ল কানের ওপর–আরও কাছে, আরও জোরে, আরও ব্যাকুলভাবে।

কোথায় বলো তো? ফিসফিস করে বলে হোমস। রোমাঞ্চিত কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম ওর মতো লৌহকঠিন মানুষের অন্তরাত্মাও শিহরিত হয়েছে এই চিৎকারে।

ওয়াটসন, কোথেকে আসছে আওয়াজটা?

ওইদিক থেকে মনে হচ্ছে, অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে বললাম আমি।

না, এইদিকে!

আবার নিস্তব্ধ রাতের বুক বিদীর্ণ করে তরঙ্গাকারে দিক হতে দিকে ছুটে গেল অবর্ণনীয় সেই চিৎকার–আগের চাইতেও আকুল হাহাকার যেন আরও কাছে চলে এসেছে, আরও

জোরে শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা নতুন শব্দ একটা অনুচ্চ, গভীর গুরু গুরু শব্দ, সংগীতময় অথচ রক্তহিম-করা, নিরন্তর সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো সে-শব্দ নীচু খাদে উঠছে আর নামছে বিরামবিহীনভাবে।

হাউন্ড! চেঁচিয়ে ওঠে হোমস। চলে এসো, ওয়াটসন, চলে এসো! হে ভগবান, দেরি না হয়!

বাদার ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটতে শুরু করেছে হোমস। পেছন পেছন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি আমি। আচম্বিতে আমাদের সামনেই কোথাও এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি জমির দিক থেকে ভেসে এল নিঃসীম নৈরাশ্যের করুণ শেষ আর্ত চিৎকার, আর তারপরেই একটা চাপা, ভারী ধপাস শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে কান খাড়া করে রইলাম। বাতাসহীন রাতের নিথর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শোনা গেল না আর কোনো শব্দ।

দেখলাম, বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের মতো কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হোমস। সজোরে পা ঠুকল মাটিতে।

ওয়াটসন, হারিয়ে দিল আমাদের। বড়ো দেরি করে ফেলেছি।

না, না কখনোই না!

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাই আমার মুখর্তা হয়েছে। ওয়াটসন, তুমিও দেখো, ওঁকে ছেড়ে আসার পরিণামটা কী দাঁড়াল! কিন্তু যদি ওঁর সর্বনাশ হয়ে গিয়ে থাকে, শোধ আমি নেবই নেব।

অন্ধের মতো ছুটলাম বিষঃ অন্ধকারের বুক চিরে, বড়ো বড়ো গোলাকার পাথরের মাঝখান দিয়ে কখনো হাতড়ে, কখনো কাঁটাঝোপে হুমড়ি খেয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে বেরিয়ে এসে কখনো হাঁপাতে হাঁপাতে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠে, আবার তিরবেগে নেমে গিয়ে ছুটতে লাগলাম একই দিকে যেদিক থেকে ভেসে এসেছে রক্ত-জল-করা চিৎকার। উঁচু জায়গায় উঠলেই সাগ্রহে আশপাশ দেখেছে হোমস, জলার গাঢ় কালোছায়ার বুকে সঞ্চরমাণ কিছুই চোখে পড়েনি।

কিছু দেখতে পাচ্ছো?

কিছু না।

ওই শোনো! ও কী?

একটা চাপা গোঙানি ভেসে এল কানে। বাঁ-দিক থেকে আসছে আওয়াজটা! সেদিকে একটা পাথুরে শিরা উঁচু পাহাড়ের আকার নিয়েছে, প্রস্তর-আকীর্ণ ঢালের ওপর যেন ঝুঁকে রয়েছে। এবড়োখেবড়ো খোঁচা-খোঁচা গড়ানের ওপর ডানা ছড়িয়ে পড়ে থাকা ইগলপাখির মতো কালো একটা বস্তু বিশৃঙ্খল আকারে পড়ে রয়েছে। বেগে নীচে নামতে

নামতে দেখলাম জিনিসটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অস্পষ্ট রেখা থেকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেখা দিল। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক, মাথাটা বেঁকে বীভৎসভাবে ঢুকে রয়েছে দেহের নীচে, গোল হয়ে গিয়েছে দু-কাঁধ এবং সমস্ত দেহটা এমনভাবে ধনুকের মতন বেঁকে রয়েছে যেন এই বুঝি ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে যাবে। কিম্ভুতকিমাকার ওই ভঙ্গিমা দেখেই কিন্তু নিমেষ মধ্যে বুঝে নিলাম গোঙানিটা কীসের প্রাণপাখি ছেড়ে গেছে দেহপিঞ্জর। কালো ছায়ামূর্তি এখন নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। ঝুঁকে রইলাম বটে, কিন্তু এতটুকু নড়াচড়ার লক্ষ্মণ দেখলাম না। গায়ে হাত রেখেই ভয়-বিকট গলায় পেঁচিয়ে হাত তুলে নিল হোমস। দেশলাই জ্বালাল পরক্ষণে। দেখলাম, চাপ চাপ রক্ত লেগে আঙুলে; ডেলা-ডেলা বিকট পদার্থ ছড়িয়ে পড়ছে ঘেঁতলানো করোটির চারপাশে; সেইসঙ্গে দেখলাম আরও একটা জিনিস। দেখেই অবশ হয়ে এল আমাদের দুজনেরই হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখলাম, স্যার হেনরি বাস্কারভিলের দেহ!

অদ্ভুত লালচে রঙের এই টুইড স্যুট যে ভোলবার নয়। প্রথম যেদিন বেকার স্ট্রিটে এসেছিলেন উনি, এই স্যুট পরেছিলেন–দু-জনেরই স্পষ্ট মনে আছে। দেশলাইয়ের আলোয় অল্পক্ষণের জন্যে হলেও পরিষ্কার দেখলাম সেই বেশ, তারপরেই দপ দপ করে উঠে দেশলাই গেল নিভে, সেইসঙ্গে সব আশা মুছে গেল অন্তর থেকে। গুঙিয়ে উঠল হোমস। অন্ধকারের মধ্যেও দেখলাম চক চক করছে তার মুখ।

পশু কোথাকার! দু-হাত মুঠি পাকিয়ে বললাম অব্যক্ত বেদনায়। হোমস! ওঁকে ছেড়ে আসার জন্যেই আজ এই ঘটনা ঘটল–এ আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

www.bengaliebook.com

ওয়াটসন, তোমার চেয়ে আমার দোষই বেশি। কেসকে নিটোল করতে গিয়ে, সম্পূর্ণ করতে গিয়ে, মক্কেলের জীবন নাশ ঘটিয়েছি ওঁর দিকে তেমন নজরই দিইনি। এর চাইতে বড়ো আঘাত আমার কর্মজীবনে আর পাইনি, ওয়াটসন। কিন্তু কী করে যে এত বারণ করা সত্ত্বেও প্রাণ হাতে নিয়ে উনি একলা বেরোলেন জলায়?

চিৎকারটা শুনেও যদি বাঁচাতে পারতাম! উঁঃ, কী ভীষণ চীৎকার! বুকফাটা হাহাকার শুনেও তো তাকে বাঁচাতে পারলাম না। কোথায়... কোথায় সেই জানোয়ার হাউন্ড? যার তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত মরতে হল স্যার হেনরিকে? নিশ্চয় এই মুহূর্তে ওত পেতে রয়েছে পাথরের কোনো খাঁজে। স্টেপলটনই-বা কোথায়? জবাবদিহি তো ওঁকেই করতে হবে।

করবেন। আমি করিয়ে ছাড়ব। খুড়ো-ভাইপো খুন হয়ে গেলেন পর-পর। একজন শুধু জানোয়ারটাকে দেখেই আঁতকে উঠে মারা গেছেন ভেবেছিলেন অলৌকিক ব্যাপার। আর একজন তাড়া খেয়ে উন্মাদের মতো পালাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে শেষ হয়ে গেলেন। মানুষ আর জানোয়ারটার মধ্যে সম্পর্ক সূত্রটা এবার প্রমাণ করতে হবে আমাদের। আওয়াজটুকুই কেবল আমরা শুনেছি তার বেশি কোনো প্রমাণ আর নেই। কেননা, স্যার হেনরি পাহাড় থেকে আছাড় খেয়ে মারা গেছেন। কিন্তু যত ধূর্তই সে হোক না কেন, চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আমি আমার পায়ের তলায় এনে ফেলব।

বিকৃত শবদেহের দু-পাশে তিক্ত অন্তঃকরণে দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। অকস্মাৎ এবং অপরিবর্তনীয় এই বিপর্যয়ে অভিভূত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। বৃথা গেল

দীর্ঘদিনের এত পরিশ্রম। চাঁদ উঠল আকাশে। যে পাহাড়ের ওপর থেকে প্রিয় বন্ধুর পতন ও মৃত্যু ঘটেছে, উঠলাম সেই পাহাড়ে। চূড়ায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম অর্ধেক রুপোলি অর্ধেক বিষণ্ণ ছায়াচ্ছন্ন বাদার ওপর দিয়ে। অনেক দূরে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটিমাত্র নিষ্কম্প হলুদ আলো জ্বল জ্বল করছে। স্টেপলটনের নিরালা বাড়ির আলো নিশ্চয় অন্য কোনো বাড়ির আলো হতেই পারে না। বিষম আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠলাম সেইদিকে চেয়ে।

মুষ্টি আস্ফালন করে বললাম, এখুনি গ্রেপ্তার করলেই তো হয়?

কেস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। লোকটা অপরিসীম ধূর্ত আর হুঁশিয়ার। কী জেনে ফেলেছি, সেটা বড় কথা নয়–কী প্রমাণ করতে পারব, সেইটাই আসল কথা। একটু ভুল করলেই পগারপার হতে পারে নাটের গুরু।

তবে করবটা কী?

করবার মতো অনেক কাজ রয়েছে আগামীকালের জন্যে। রাত্রে বাকি শুধু একটা কাজ বন্ধুকৃত্য।

খাড়াই পাহাড় বেয়ে নেমে এলাম দুজনে। রুপোর মতো ঝকঝকে পাথরের বুকে পড়ে দেহটা কালো এবং স্পষ্ট। দোমড়ানো মোচড়ানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকটিত আতীব্র বেদনাবোধ চোখে জল এনে দিল আমার যন্ত্রণা সঞ্চারিত হল আমার মধ্যেও।

হোমস, লোকজন ডাকা যাক! দু-জনে মিলে এতটা পথ বাস্কারভিল হলে ওঁকে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। আরে গেল যা! পাগল হয়ে গেলে নাকি?

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল হোমস। এখন ধেই ধেই করে নাচছে। হো-হহা করে হাসছে আর আমার দু-হাত ধরে মোচড় দিচ্ছে। এই কি সেই আত্মসংযত, কঠোর-প্রকৃতি শার্লক হোমস? এ যে ছাই চাপা আগুন!

দাড়ি! দাড়ি! লোকটার দাড়ি আছে।

দাড়ি?

ব্যারনেট নয়–ব্যারনেট নয়–এ হল –আরে, এ যে আমার প্রতিবেশী–পলাতক কয়েদি!

ক্ষিপ্তের মতো চিৎ করে শোয়ালাম দেহটা। রক্ত-চোয়ানো একটা দাড়ি উঁচিয়ে রইল স্নিগ্ধ, শীতল, সুস্পষ্ট চাঁদের পানে। ভুল হবার জো নেই–ওই তো সেই কোটরাপ্রবিষ্ট পাশবিক চোখ আর ঝুঁকে-পড়া অদ্ভুত কপাল। মোমবাতির আলোয় পাথরের ওপর থেকে আমার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল একটা মুখ ঘৃণ্য অপরাধী সেলডেনের মুখ।

পরের মুহূর্তেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। মনে পড়ল ব্যারনেটের কথা–পুরোনো পোশাক দিয়েছিলেন ব্যারিমুরকে। ব্যারিমুর দিয়েছে সেলডেনকে পালানোর

সুবিধের জন্যে। বুট, শার্ট, ক্যাপ–সবই স্যার হেনরির। অত্যন্ত মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক দৃশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধির বিধানে শেষ পর্যন্ত স্বদেশি আইনের কবলেই প্রাণবিয়োগ ঘটল তার। খুলে বললাম হোমসকে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় টইটম্বুর হয়ে রইল হৃদয়।

সব শুনে ও বলল, তাই বলো। বেচারির মৃত্যুর কারণ তাহলে এই পোশাক। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্যার হেনরিরই ব্যবহার করা কোনো জিনিসের গন্ধ শুকিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাউন্ডটাকে খুব সম্ভব হোটেল থেকে খোয়া যাওয়া সেই বুটটা ধরা হয়েছিল ওর নাকের সামনে একই গন্ধ এর জামা প্যান্ট-বুটে পেয়ে তাড়া করে এনেছে এতদুর। এ-ব্যাপারে একটা অত্যন্ত অসাধারণ রহস্য কিন্তু এখনও পরিষ্কার হল না। অন্ধকারের মধ্যে সেলডেন বুঝল কী করে যে হাউন্ড তাড়া করেছে?

ডাক শুনে।

বাদার বুকে হাউন্ডের ডাক শুনলেই ওর মতো ডাকাবুকো কয়েদি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এমন উদ্ভ্রান্তের মতো খানা-খন্দ পাহাড় টপকে আকাশফাটা চিৎকার ছেড়ে দৌড়ায় না– পলাতক কয়েদি কখনন কুকুরের তাড়া খেয়ে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেয় না। চেঁচানির ধরন শুনে মনে হল অনেকদ্দূর থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছুটেছে পেছনে হাউন্ড তাড়া করেছে টের পেয়ে। টের পেল কী করে?

তার চাইতেও বড়ো যে-রহস্যটা এখনও দুর্বোধ্য রয়ে গেল আমার কাছে তা হল এই হাউন্ড। সবার সব ধারণা যদি সঠিক বলেই ধরে নেওয়া হয়—

আমি কিছুই ধরে নিই না।

বেশ তো, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু রাতেই হাউন্ডটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় কেন? জলার বুকে নিশ্চয় সবসময়ে ছাড়া থাকে না যেখানে খুশি ছুটে বেড়ায় না। স্যার হেনরি জলায় আছেন না-জানলে কখনোই হাউন্ড লেলিয়ে দিত না স্টেপলটন।

তোমার আর আমার সমস্যার মধ্যে আমারটাই কিন্তু আরও দুর্ধর্ষ কেননা তোমার সমস্যার সমাধান শিগগিরই করে ফেলব–চিররহস্য থেকে যাবে আমারটা। যাই হোক, আপাতত সমস্যা এই দেহটা নিয়ে। কী করি বল তো? শেয়াল দাঁড়কাকদের খপ্পরে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।

আমি বলি কী, যেকোনো একটা কুটিরের মধ্যে রেখে দিয়ে চলো পুলিশকে খবর দিই। ঠিক বলেছ। কুটির পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারব দু-জনে। আরে! আরে! ওয়াটসন, এ আবার কী? কী আশ্চর্য স্পর্ধা দেখেছ? নাটের গুরু নিজেই আসছে যে! খবরদার, তোমার ভেতরের সন্দেহ যেন একদম প্রকাশ না-পায়–একটা বেস কথাও যেন মুখ দিয়ে না-বেরোয়, সমস্ত প্ল্যানটা তাহলে মাঠে মারা যাবে।

জলার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা মূর্তি। জ্বলন্ত চুরুটের ম্যাড়মেড়ে লাল আভা দেখা যাচ্ছে। চাদের আলো পড়েছে মাথায়, দূর থেকেও চেনা যাচ্ছে প্রকৃতিবিদের কর্মঠ

আকৃতি–স্ফুর্তিবাজ চালচলন। আমাদের দেখেই থমকে গেলেন, পরমুহূর্তেই এগিয়ে এলেন।

আরে, ডক্টর ওয়াটসন নাকি? এত রাতে আপনাকে বাদায় দেখব আশাই করিনি। কিন্তু একী! কী সর্বনাশ! কে জখম হল? স্যার হেনরি নাকি?

বেগে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন স্টেপলটন। সশব্দে নিশ্বাস নেওয়ার চকিত আওয়াজ শুনলাম, চুরুট খসে পড়ল আঙুলের ফাঁক থেকে।

বললেন তোতলাতে তোতলাতে, এ—একে?

সেলডেন প্রিন্সটাউন জেল থেকে যে পালিয়েছিল।

পাঙাশপানা বিকট মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন সেলডেন। কিন্তু অসম্ভব মনোবল তার। অদ্ভুত কায়দার বিস্ময় আর নৈরাশ্যবোধকে নিমেষে দমিয়ে ফেললেন। সচকিত তীক্ষ্ণ চোখে পর্যায়ক্রমে তাকালেন আমার আর হোমসের পানে।

কী সর্বনাশ! কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার! মারা গেল কীভাবে?

পাহাড় থেকে পড়ে মাথার খুলি গুঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে। বাদায় বেড়াচ্ছিলাম আমরা দুই বন্ধু, চিৎকার শুনে এসে দেখি এই কাণ্ড।

চিৎকার আমিও শুনেছিলাম। সেইজন্যেই ছুটে এসেছি। স্যার হেনরির কথা ভেবে বসে থাকতে পারলাম না।

স্যার হেনরির কথাই বিশেষ করে ভাবলেন? প্রশ্নটা ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

আমি তাকে আসতে বলেছিলাম বলে। না-আসায় অবাক হয়েছিলাম। বাদার বুকে। ওইরকম চিৎকার শুনে ভয় হল–বিপদে পড়লেন নাকি? ভালো কথা–দৃষ্টিশর চকিত ভঙ্গিমায় আমার মুখ থেকে সরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হল হোমসের মুখের ওপর, চিৎকার ছাড়া আর কিছু শুনেছিলেন?

না, বললে হোমস; আপনি শুনেছেন?

না।

তাহলে জিজ্ঞেস করলেন কেন?

চাষাদের গালগল্পর কথা কে না-জানে বলুন। জলায় নাকি কুকুর-ভূত টহল দেয়। গভীর রাতে নাকি তার ডাক শোনা যায়। আজ রাত্রে সে-রকম কোনো আওয়াজ স্বকর্ণে কেউ শুনেছে কিনা খোঁজ নিচ্ছিলাম।

সে-রকম কোনো আওয়াজই শুনিনি, বললাম আমি।

বেচারার মৃত্যুর কারণটা কি অনুমান করেছেন?

উদবেগে আর দিনরাত খোলা আকাশের তলায় থেকে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। পাগলের মতো জলায় দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলেছে।

খুবই যুক্তিসংগত অনুমান, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে স্টেপলটন। আমার চোখে তা স্বস্তির নিশ্বাস বলেই মনে হল। মি. শার্লক হোমস, আপনার কী মনে হয়?

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানাল বন্ধুবর।

বলল, আপনি দেখছি খুব তাড়াতাড়ি চিনে ফেলেন।

ডক্টর ওয়াটসন আসবার পর থেকেই এ-অঞ্চলে আপনার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় রয়েছি আমরা সকলেই। এসেই দেখলেন ট্র্যাজেডি।

তা ঠিক। আমার বিশ্বাস ওয়াটসন ঠিকই বলছে–মর্মন্তুদ এই মৃত্যুর উপর্যুক্ত কারণ দর্শিয়েছে। অপ্রীতিকর স্মৃতি নিয়ে কালকেই ফিরে যেতে হবে লন্ডনে।

কালকেই ফিরে যাবেন?

সেইরকমই ইচ্ছে।

এখানকার গোলমেলে ব্যাপারগুলোয় কিছু আলোকপাত করতে পারলেন?

কাঁধ ঝাঁকি দিল হোমস। সাফল্যের আশা সবাই করে, কিন্তু সাফল্য জোটে ক-জনের ভাগ্যে? তদন্তকারীর একান্ত দরকার ঘটনা—উপকথা নয়, কিংবদন্তি নয়, গুজব নয়। এ-কেসটা সেদিক দিয়ে একেবারেই যাচ্ছেতাই।

খুব খোলাখুলি এবং অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় কথাগুলো বলে গেল বন্ধুবর। স্টেপলটন কিন্তু তবুও খরখরে চোখে চেয়ে রইলেন তার পানে। তারপর ফিরলেন আমার দিকে।

একে আমার বাড়ি নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু দেখে আঁতকে উঠতে পারে আমার বোন। আমার মনে হয় গায়ে কিছু চাপা দিয়ে রাখলে সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

সেই ব্যবস্থাই হল। স্টেপলটনের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যখ্যান করে হোমস আর আমি রওনা হলাম বাস্কারভিল হল অভিমুখে। একলাই বাড়ি ফিরে গেল প্রকৃতিবিদ। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল বাদার ওপরে তার ধীর সঞ্চরমাণ মূর্তি, সেইসঙ্গে দেখলাম চন্দ্রকিরণ বিধৌত রুপোলি পাহাড়ের ঢালে একটা কালো ধ্যাবড়া দাগ পলাতক কয়েদির নশ্বর দেহ।

শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি টক্কর আরম্ভ হল, একত্রে বাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে হোমস। লোকটার স্নায়ুর জোরটা দেখলে! ষড়যন্ত্র করে যাকে সরিয়েছে, সে যে আসল শিকার নয়–এটা চোখের সামনে দেখেও কীভাবে সামলে নিল নিজেকে! সাংঘাতিক এই মানসিক আঘাতে দেহমন পঙ্গু হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু ওর কিছু হল? ওয়াটসন, লন্ডনেও বলেছি তোমায়, অবার বলছি এখানে আমাদের ইস্পাত শক্তির সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়ার মতো এহেন শত্রু জীবনে আর দেখিনি।

তোমাকে দেখে ফেলল, এইটাই যা দুঃখ।

আমারও দুঃখ হয়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু এড়ানোর পথ আর ছিল না।

তুমি যে এখানে, ও তা জেনে ফেলেছে। এর ফলে ওর ষড়যন্ত্র কোন পথে চলবে বলে মনে হয় তোমার?

হয় আরও সতর্ক হবে, না হয় মরিয়ার মতো দুম করে কিছু একটা করে বসবে। অধিকাংশ অপরাধীর মতোই নিজের ওপর অত্যধিক আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাববে হয়তো আমাদের বেবাক বোকা বানাতে পেরেছে।

এক্ষুনি গ্রেপ্তার করছি না কেন? ভায়া ওয়াটসন, ঠুটো জগন্নাথ হওয়ার জন্যে সৃষ্টিকর্তা তোমায় গড়েননি। অদম্য প্রাণচাঞ্চল্য টগবগ করে ফুটছে তোমার মধ্যে এ-জিনিস তোমার সহজাত। তর্কের খাতিরে ধরো আজ রাতেই ওঁকে গ্রেপ্তার করে ফেললাম। কিন্তু সেটা করে কী লাভটা হবে বলতে পারো? ওঁর বিরুদ্ধে কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারব না। পুরো চক্রান্তটার এইটাই হল মহাশয়তানিসুচতুর ধড়িবাজ! মানুষকে দিয়ে মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করলে না হয় একটা প্রমাণ পাওয়া যেত–কিন্তু বিরাট একটা কুকুরকে কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে কুকুরের মালিকের গলায় তো আর ফাঁসির দড়ি গলাতে পারব না।

কিন্তু কেসটা তো খাড়া করে ফেলেছি।

কেসের ছায়া পর্যন্ত খাড়া করতে পারিনি শুধু অনুমান আর কল্পনা করেছি। প্রমাণহীন গল্প নিয়ে কোর্টে গেলে টিটকিরি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

স্যার চার্লসের মৃত্যুটা তো মিথ্যে নয়।

মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া গেছে কিন্তু সারাশরীরে কোনো দাগ পাওয়া যায়নি। তুমি আমি জানি নিদারুণ ভয়ে তার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়েছিল–ভয়টা কেন পেয়েছিলেন তাও জানি। কিন্তু বারোজন নিরেট জুরিকে তা বোঝাব কী করে বলতে পারো? হাউন্ডের কোনো চিহ্ন কি সেখানে ছিল? কোথায় তার ছুঁচোলো দাঁতের দাগ? মড়াকে হাউন্ড কামড়ায় না ঠিকই–স্যার চার্লসের নাগাল ধরার আগেই স্রেফ ভয়ে তিনি মারা গেছিলেন। কিন্তু এসব তো প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করবার অবস্থায় এখনও আমরা পৌঁছোইনি।

বেশ তো, আজ রাতেও কি পৌঁছোইনি?

না, আজ রাতেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি! হাউন্ড, আর একটা মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্কসূত্র এবারও নেই। দু-জনেই কেউই স্বচক্ষে দেখিনি হাউন্ডটাকে। শুধু ডাক শুনেছি; কিন্তু সে যে এই বেচারাকে তাড়া করেছিল, তা প্রমাণ করতে পারব না, মোটিভ একেবারেই নেই। না, ভায়া, না; এই মুহূর্তে কেস এখনও কঁচা, এ-সত্য তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। কেসকে পাকা করার জন্যে যেকোনো ঝুঁকি নিয়েও আরও অপেক্ষা করতে হবে।

কী করবে বলে ঠিক করেছ?

পরিস্থিতিটা স্পষ্ট করে তুলতে পারে কেবল মিসেস লরা লায়ন্স–বিরাট ভরসা রয়েছে তার ওপর। এ ছাড়া আমার নিজস্ব একটা প্ল্যানও আছে। কালকের দিনটা অনেক

খারাপের মধ্যে দিয়ে যাবে ঠিকই; কিন্তু আশা আছে দিন ফুরোনোর আগেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনব।

এর বেশি আর কিছু ওর কাছ থেকে বার করতে পারলাম না। বাস্কারভিল হল পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা চিন্তায় ডুবে রইল হোমস।

ভেতরে আসবে নাকি?

আসব। আর লুকোছাপার কারণ দেখছি না। কিন্তু আমার শেষ কথাটা শুনে রাখো, ওয়াটসন। হাউন্ড সম্পর্কে কোনো কথা বলবে না স্যার হেনরিকে। সেলডেনের মৃত্যুর কারণটা স্টেপলটন যেমন বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন আমাদের, ওঁদের ভাবতে দাও সেইভাবে যদ্র মনে পড়ে রিপোর্টে তুমি লিখেছিলে, আগামীকাল স্টেপলটনদের বাড়িতে খেতে যাবেন স্যার হেনরি। তখনই অতি কঠোর পরীক্ষা হয়ে যাবে তার স্নায়ুশক্তির–তার আগে আর পরীক্ষা নিতে যেয়ো না।

খেতে তো আমিও যাচ্ছি।

অছিলা করে ওঁকে একলাই পাঠাবে তুমি যাবে না। এ-ব্যবস্থা হয়ে যাবেখন। যাই হোক, দেরি অনেক হল; ডিনার না-পেলেও নৈশ-আহার পাওয়া যাবে।

জাল বিস্তার

শার্লক হোমসকে দেখে স্যার হেনরি যতটা অবাক হলেন তার চাইতেও বেশি খুশি হলেন। কেননা, দিন কয়েক ধরে আশা করছিলেন সাম্প্রতিক ঘটনার আকর্ষণে লন্ডন থেকে আসবে হোমস। বন্ধুবরের সঙ্গে মালপত্র নেই এবং না-থাকার কোনো ব্যাখ্যাও নেই শুনে একটু ভুরু তুললেন। গোপনে সব বুঝিয়ে বললাম এবং একটু দেরি করে নৈশ আহারে বসে আমাদের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু তাকে নিবেদন করলাম–ওঁর পক্ষে যতটুকু জানা দরকার, তার বেশি অবশ্য একটা অপ্রীতিকর কর্তব্য সারতে হল–ব্যারিমুর আর তার স্ত্রীকে ডেকে জানাতে হল সেলডেনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ। ব্যারিমুরের কাছে খবরটা অপ্রশমিত স্বস্তিবোধের কারণ হলেও কেঁদে অ্যাপ্রন ভিজিয়ে ফেলল তার স্ত্রী। দুনিয়ার সামনে সেলডেন একটা জঘন্য হিংস্র পুরুষ ছাড়া কিছুই নয়–অর্ধ-পশু অর্ধ-দানবের সংমিশ্রণ। কিন্তু দিদির কাছে সে সেই ছোট্ট একগুঁয়ে খোকা–দিদির হাত জড়িয়ে ধরে বড়ো হয়ে ওঠা ছোট্ট দুষ্টু ভাইটি। যে-পুরুষের মৃত্যুতে শোক করার মতো একজন নারীরও অভাব হয়, তার মতো অভিশপ্ত অভাগা আর নেই।

ব্যারনেট বললেন, ওয়াটসন সকালে বেরিয়ে যাবার পর ঘরদোর মোছামুছি করছিলাম আমি। কথা রাখার জন্যে আমার কিন্তু বেশ খানিকটা কৃতিত্ব প্রাপ্য হয়েছে। একলা বেরোব

এ-কথা যদি আপনাদের না-দিতাম, সন্ধেটা আজকে ভালোই কাটত। কেননা স্টেপলটন খবর পাঠিয়েছিলেন ওঁদের ওখানে যাওয়ার জন্যে।

শুষ্ক কণ্ঠে হোমস বললে, সন্ধেটা আরও ভালোভাবে যে কাটত, তাতে কোনো সন্দেহই নেই আমার। আপনার ঘাড় মটকানোর জন্যে আমরা শোক আর অনুতাপে জ্বলেপুড়ে মরছিলাম শুনলে নিশ্চয় খুশি হবেন না?

চোখের পাতা পুরো খুলে গেল স্যার হেনরির, সে আবার কী?

বেচারা আপনার পোশাক পরে বেরিয়েছিল। পুলিশের ঝামেলায় পড়তে পারে আপনার চাকর। এ-পোশাক সে-ই তাকে দিয়েছিল।

তা নাও হতে পারে। যদূর জানি, কোনো পোশাকেই চিহ্ন নেই।

তাহলে আপনার চাকরের কপাল ভালো শুধু তাই নয়, আপনাদের সকলেরই। কেননা আপনারা প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে আইনবিরোধী কাজ করেছেন। ওয়াটসনের রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষী আপনারা প্রত্যেকেই। বিবেকবান গোয়েন্দা হিসেবে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে গ্রেপ্তার করাটা আমার প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত।

কিন্তু কেস কদ্দূর এগোল? শুধোন ব্যারনেট। জট ছাড়াতে পারবেন? এখানে আসার পর আমি আর ওয়াটসন যে-তিমিরে ছিলাম, এখনও সেই তিমিরেই রয়েছি।

খুব বেশি আর দেরি হবে বলে মনে হয় না, তার আগেই পরিস্থিতি অনেকটা প্রাঞ্জল করতে পারব। ব্যাপারটা অসাধারণ জটিল, আর অত্যন্ত কঠিন। কতকগুলো বিষয়ে এখনও আলোকপাত প্রয়োজন অবশ্য তার সূচনাও দেখা দিয়েছে!

ওয়াটসন নিশ্চয় জানিয়েছে আপনাকে এর মধ্যে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছে। জলার বুকে হাউন্ডের ডাক আমরা দুজনেই শুনেছি–কাজেই কিংবদন্তিটা একেবারেই অলীক বা নিছক কুসংস্কার মানতে পারছি না। পশ্চিমে থাকার সময়ে কুকুর নিয়ে কিছু কাজ করতে হয়েছিল আমাকে, ডাক শুনলেই ধরতে পারি। এ-কুকুরকে যদি ধরতে পারেন, মুখবন্ধনী পরিয়ে গলায় চেন দিয়ে বাঁধতে পারেন তবেই বলব আপনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা।

সাহায্য যদি করেন তাহলে মুখবন্ধনী পরিয়ে গলায় চেন দিয়ে বাঁধতে পারব বলেই আমার মনে হয়।

যা বলবেন, তাই করব।

চমৎকার। আরও একটা কথা বলব। অন্ধের মতো যা বলব তাই করতে হবে; কথায় কথায় প্রশ্ন করলে চলবে না।

যা চাইবেন, তাই হবে।

যদি করতে পারেন, তাহলে জানবেন ছোট্ট এই সমস্যার সুরাহা শিগগিরই হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস

আচমকা কথা বন্ধ করে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে স্থির চোখে শুন্যে তাকাল হোমস। ল্যাম্পের আলো আছড়ে পড়ল মুখাবয়বে। দেখলাম, মুখের একটা পেশিও নড়ছে না। তন্ময় হয়ে রয়েছে চোখের চাহনি, ঠিক যেন একটা নিখুঁত খোদাই অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তরমূর্তি। মূর্তিমান প্রত্যাশা আর সতর্কতা।

কী হল? চেঁচিয়ে উঠলাম দু-জনেই।

চোখ নামাল হোমস। স্পষ্ট দেখলাম একটা আত্যন্তিক আবেগ চাপার চেষ্টা করছে। মুখভাব সংযত, কিন্তু দুই চক্ষু কৌতুক তরলিত।

উলটোদিকের দেওয়ালে প্রলম্বিত সারি সারি প্রতিকৃতির দিকে হস্ত সঞ্চালন করে বললে, সমঝদারের প্রশংসা গ্রহণ করুন। আমি যে আর্টের খবর রাখি, ওয়াটসন তা মানতেই চায় না। তবে সেটা নিছক ঈর্ষা, কেননা, এ-ব্যাপারে দু-জনের মত দু-রকম, এ-ছবিগুলো কিন্তু সত্যিই উঁচুদরের।

একটু অবাক হয়ে বন্ধুবরের পানে তাকিয়ে স্যার হেনরি বললেন, ভালো লাগল আপনার প্রশংসা। এসব জিনিস খুব একটা বুঝি এমন ভান করতে চাই না। ছবির চাইতে ঘোড়া

বা কম বয়েসি বলদের কদরটা বুঝি বেশি। এসব জিনিসের জন্যেও সময় পান জানতাম না।

ভালো জিনিস দেখলে বুঝতে পারি–এখন যা দেখেছি, তা উঁচুদরেরই জিনিস বলতে পারি, ওদিকে নীল সিল্ক পরা ওই যে ভদ্রমহিলা, উনি নিশ্চয় নেলার। মাথায় পরচুলা পরা এই যে মোটাসোটা ভদ্রলোক, ইনি নিশ্চয় রেনল্ডস। সবই পারিবারিক প্রতিকৃতি, তাই না?

প্রত্যেকটা।

নাম জানেন?

ব্যারিমুর শিখিয়ে দিয়েছে, শিক্ষাটা রপ্তও করেছি মোটামুটি।

টেলিস্কোপ নিয়ে ওই ভদ্রলোক কে?

রিয়ার অ্যাডমিরাল বাস্কারভিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজে রোডনীতে মোতায়েন ছিলেন। নীল কোট পরে হাতে পাকানো কাগজ নিয়ে যিনি দাঁড়িয়ে, উনি স্যার উইলিয়াম বাস্কারভিল। পিট-এর অধীনস্থ হাউস অফ কমন্স কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান ছিলেন।

আমার সামনে এই যে অশ্বারোহী সৈনিক গায়ে কালো মখমল আর লেস-ইনি কে?

এঁর সম্পর্কে জানার অধিকার আপনার আছে। ইনিই যত নষ্টের মূল বাস্কারভিলস হাউন্ডের শুরু যিনি করেছেন–বদমাইশ শিরোমণি হিউগো। এঁকে ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।

সাগ্রহে, সবিস্ময়ে স্থির চোখে চেয়ে রইলাম প্রতিকৃতির দিকে।

হোমস বললে, কী আশ্চর্য! দেখে তো খুব শান্ত, কুণ্ঠিত মানুষ বলে মনে হয়। চোখের মধ্যে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খোদ শয়তান যেন ওত পেতে রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম দুবৃত্ত ধরনের আরও বলিষ্ঠ চেহারা দেখব।

এটাই যে যথার্থ ছবি, সে-বিষয়ে ভুল নেই। নাম আর ১৬৪৭ তারিখটা পেছনের ক্যানভাসে লেখা রয়েছে।

আর বেশি কথা বলল না হোমস। কিন্তু প্রাচীন রাজন্য প্রতিকৃতির প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছে দেখা গেল। সামনের ছবির দিকে চেয়ে থেকে শেষে করল নৈশ আহার। স্যার হেনরি নিজের ঘরে গেলে পর শুনলাম ওর চিন্তাধারার বৃত্তান্ত। শোবার ঘরের মোমবাতি হাতে নিয়ে আমাকে ফের নিয়ে গেল খাবার ঘরে এবং উঁচু করে তুলে ধরল দেওয়ালে প্রলম্বিত কালো মলিন ছবিটার সামনে।

কিছু দেখতে পাচ্ছো?

পাখির পালক গোঁজা চওড়া-কিনারা টুপির দিকে তাকালাম, কানের পাশে ঝোলা কোকড়া চুল; সাদা লেসের কলার দিয়ে ঘেরা সোজা, কঠিন মুখটি খুঁটিয়ে দেখলাম। পাশবিক মূখ। মোটেই নয়, কিন্তু নিখুঁত, শক্ত, কঠোর দৃঢ়সংবদ্ধ পাতলা ঠোঁট। হিমশীতল অসহিষ্ণু চোখ।

এইরকম দেখতে চেনো কাউকে?

চোয়ালটা অনেকটা স্যার হেনরির মতন।

হয়তো একটু আদল আছে। কিন্তু দাঁড়াও!

চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল হোমস। বাঁ-হাতে ধরল আলো, ডান বাহু বেঁকিয়ে চাপা দিল চওড়া টুপি আর লম্বা কোঁকড়া চুল।

আরে সর্বনাশ! বললাম সবিস্ময়ে।

ক্যানভ্যাসের বুকে সহসা আবির্ভূত হয়েছে স্টেপলটনের মুখ।

এই তো, দেখতে পেলে তাহলে। আমার হল ট্রেনিং-পাওয়া চোখ–মুখটাই দেখি, পারিপাট্য বাদ দিই। অপরাধ তদন্তকারীর পয়লা গুণটাই তো ছদ্মবেশ ছুঁড়ে দেখবার ক্ষমতা।

কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য আশ্চর্য ব্যাপার। ছবিটা ওঁর বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়।

হ্যাঁ, একেই বলে পূর্বপুরুষের ধারায় প্রত্যাগত বংশধর–আত্মিক ও শারীরিক দিক দিয়েই। এটা হল একটা কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত। শুধু পারিবারিক প্রতিকৃতি নিয়েই যদি গবেষণা করা যায়, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস এসে যায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক বাস্কারভিল বংশের একজন।

শুধু তাই নয়–উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি দখলের চক্রান্তও চালাচ্ছেন।

ঠিক তাই। কালক্রমে ছবিটা চোখে পড়ায় একটা অত্যন্ত অবশ্যম্ভাবী সংযোগ সূত্রও হাতে এসে গেল। মিসিং লিঙ্ক এখন পরিষ্কার। ওয়াটসন ভদ্রলোক এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। কাল রাত শেষ হওয়ার আগেই জালে পড়বেন। প্রজাপতি বেচারারা যেভাবে ওঁর জালে আটকে পতপতিয়ে ছটফট করে, উনিও ছটফট করবেন আমাদের জালে। একটা আলপিন, একটা ছিপি, আর একটা কার্ড ওকেও গেঁথে রেখে দেব আমাদের বেকার স্ট্রিটের সংগ্রহশালায়!

ছবির সামনে থেকে হাসতে হাসতে ফিরে এল হোমস। এভাবে ওকে বড়ো একটা হাসতে দেখা যায় না। বিরল এই হাসি যখনই শুনেছি তখনই জেনেছি দিন ঘনিয়ে আসছে কারুর।

পরের দিন বেশ ভোরে শয্যাত্যাগ করলাম। কিন্তু দেখি হোমস উঠেছে আমারও আগে। আমি যখন পোশাক পরছি, ও তখন বাগানের পথ দিয়ে ফিরছে।

দু-হাত ঘষে কাজ-চনমনে হৃষ্টকণ্ঠে বললে, ওহে, আজ আর নিশ্বেস ফেলার সময় নেই। জাল পাতা হয়ে গেছে টানা শুরু হল বলে। দিন ফুরোনোর আগেই জানা যাবে পাতলা-চোয়াল প্রকাণ্ড পাইক মাছ জালে পড়ল, না, জাল কেটে বেরিয়ে গেল।

বাদায় ঘুরে এলে নাকি?

সেলডেনের মৃত্যুর খবর গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটাউনে পাঠিয়ে দিলাম। তোমাদের কেউই ঝামেলায় পড়বে না। পরম বিশ্বাসী কার্টরাইটকেও খবর পাঠালাম। নইলে বেচারা ভেবে মরত। প্রভুভক্ত কুকুর যেমন প্রভুর কবর ছেড়ে নড়তে চায় না, ও বেচারিও তেমনি কুটিরের দরজার ছেড়ে আসত না–হা-হুতাশ করে মরত।

এরপর কী করবে?

স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করব। আরে, ওই তো উনি আসছেন?

গুডমর্নিং হোমস, বললেন বারনেট। আপনাকে এখন ঠিক সেনাধ্যক্ষের মতো মনে হচ্ছে–মুখ্য অফিসারকে ডেকে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছেন যেন।

পরিস্থিতি এখন হুবহু তাই। ওয়াটসন অর্ডার চাইছেন।

সে তো আমিও চাইছি।

উত্তম কথা। যদূর জানি, আজ রাতে বন্ধুবর স্টেপলটনের বাড়িতে আপনার আহারের নেমন্তন্ন আছে।

আশা করি আপনিও আসবেন। ভাই-বোন দু-জনেই খুব অতিথিবৎসল। আপনাকে দেখে খুব খুশি হবে।

ওয়াটসন আর আমার কিন্তু লন্ডন না-গেলেই নয়।

লন্ডন যাবেন?

এই পরিস্থিতিতে আমার বিশ্বাস লন্ডনে থাকলেই আমরা বেশি কাজ করতে পারব।

মুখটা লম্বা হয়ে গেল ব্যারনেটের।ভেবেছিলাম এ-ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখে যাবেন। একার পক্ষে বাস্কারভিল আর বাদা জায়গাটা খুব আনন্দের জায়গা নয়।

ভায়া, আমার ওপর অটল আস্থা রাখুন যা বলি ঠিক তাই করুন। বন্ধুদের বলবেন, আমাদের আসার ইচ্ছে ছিল, এলে খুবই আনন্দ পেতাম কিন্তু জরুরি তলবে শহরে যেতে হয়েছে। খুব শিগগিরই ডেভনশায়ারে ফিরে আসার ইচ্ছে আছে। কথাগুলো গুছিয়ে বলতে ভুলবেন না নিশ্চয়ই?

নেহাতই যদি জোর করেন, তাহলে বলতে হবে।

বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া কিছু করার নেই।

ব্যারনেটের মেঘাচ্ছন্ন ললাট দেখে বুঝলাম গভীর আঘাত পেয়েছেন। উনি ধরে নিয়েছেন আমরা ওঁকে ফেলে পালাচ্ছি।

বললেন শীতল কণ্ঠে, কখন যাবেন ঠিক করেছেন?

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পরেই। কুমবে ট্রেসি স্টেশন থেকে যাব। ওয়াটসন যে আবার ফিরে আসবে তার গ্যারান্টি হিসেবে জিনিসপত্র রেখে যাবে। ওয়াটসন, স্টেপলটনকে একটা চিরকুট লিখে জানিয়ে দাও আসতে পারছ না।

ব্যারনেট বললেন, আপনাদের সঙ্গে আমারও লন্ডন যেতে মন চাইছে। আমি একা এখানে কেন পড়ে থাকব বলতে পারেন?

কারণ, আপনার কর্তব্য কেন্দ্র এইখানে। কারণ, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যা বলব তাই শুনবেন এবং এখন আমি এইখানেই আপনাকে থাকতে বলছি।

ঠিক আছে, আমি থাকব।

আর একটা নির্দেশ। আমার ইচ্ছে আপনি মেরিপিট হাউসে গাড়ি নিয়ে যাবেন। পৌঁছেই ঘোড়ার গাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। ওঁদের জানিয়ে দেবেন, হেঁটে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আপনার।

বাদার ওপর দিয়ে হেঁটে আসব?

হ্যাঁ।

কিন্তু ঠিক এই কাজটাই আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন বহুবার।

এবার আপনি নিরাপদে হাঁটতে পারেন। আপনার স্নায়ু আর সাহসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা আছে বলেই এমন কথা বললাম–নইলে বলতাম না। কিন্তু হেঁটে আসাটা একান্তই দরকার।

বেশ, তাহলে হেঁটেই আসব।

প্রাণের মায়া থাকলে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাদার অন্য রাস্তা ভুলেও মাড়াবেন না। সোজা রাস্তা একটাই–মেরিপিট হাউস থেকে গ্রিমপেন রোড, বাড়ি ফেরার স্বাভাবিক পথ।

যা বলছেন, ঠিক তাই করব।

চমৎকার। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ব ভাবছি। তাহলে লন্ডন পৌঁছে যাব বিকেল নাগাদ।

গত রাতে হোমস স্টেপলটনকে বলেছিল বটে যে পরের দিন বিদায় নেবে এ-অঞ্চল থেকে। তা সত্ত্বেও ওর সফরসূচি শুনে বিস্মিত হলাম। আমাকেও যে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এটা তখন মাথায় আসেনি আমার। বিশেষ করে যে-সময়টা খুবই সংকটপূর্ণ বলে নিজেই বলেছে, ঠিক সেই সময়টাতেই দু-জনেরই এ-জায়গা ছেড়ে লম্বা দেওয়ার কারণ কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। মনে তিলমাত্র সংশয় না-রেখে অক্ষরে অক্ষরে হুকুম তামিল করা ছাড়া পথও নেই। তাই যথাসময়ে শুষ্কবদনে ক্ষুব্ধ বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে দু-ঘণ্টা পরে পৌঁছোলাম কুমবে ট্রেসি স্টেশনে। গাড়ি ফিরে গেল বাস্কারভিল হলে। প্ল্যাটফর্মে একটা ছেলেকে থাকতে দেখলাম।

হুকুম আছে, স্যার?

কার্টরাইট, এই ট্রেনেই শহরে যাও। পৌঁছেই আমার নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে। বলবে, ভুল করে আমি পকেটবইটা ফেলে এসেছি। উনি খুঁজে পেলেই যেন রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বেকার স্ট্রিটে পাঠিয়ে দেন।

ইয়েস, স্যার।

স্টেশন অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো আমার নামে চিঠিপত্র এসেছে কিনা।

একটা টেলিগ্রাম নিয়ে ফিরে এল ছেলেটা। হোমস পড়ল। আমার হাতে দিল। টেলিগ্রামে লেখা আছে—

তারবার্তা পেয়েছি। স্বাক্ষরহীন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আসছি। পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছোব–লেসট্রেড।

সকালে আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম–এটা তার উত্তর। পেশাদার গোয়েন্দাদের মধ্যে ওকেই আমি সেরা বলে মনে করি ওর সহযোগিতা হয়তো দরকার হতে পারে। ওয়াটসন, মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করলে আমার বিশ্বাস সময়টা ভালোভাবে কেটে যাবে।

ওর লড়াই-পরিকল্পনা একটু একটু করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা যে সত্যিই ফিরে গেছি, এ-খবরটা স্টেপলটন ভাইবোনদের বিশ্বাস করাচ্ছে ব্যারনেটকে দিয়ে। আসলে কিন্তু আমরা থেকে যাচ্ছি। ঠিক যখন আমাদের দরকার হবে, তখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। লন্ডন-থেকে-পাওয়া টেলিগ্রামের কথাটা যদি স্যার হেনরি উল্লেখ করেন স্টেপলটন ভাইবোনকে, তাহলে সন্দেহের শেষ ছায়াটুকুও বিদায় নেবে ওদের মন থেকে। পাতলা-চোয়াল মিষ্টি জলের পাইক-মাছের চারপাশে আমাদের জাল যে এর মধ্যেই বেশ এঁটে বসেছে, এতক্ষণে তা টের পেলাম।

অফিসে ছিল মিসেস লরা লায়ন্স। খোলাখুলি আর সোজাসুজি কথা আরম্ভ করে দিল শার্লক হোমস। যৎপরোনাস্তি তাজ্জব হয়ে গেল ভদ্রমহিলা।

স্বর্গত স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুকালীন পরিস্থিতির তদন্ত করতে এসেছি আমি। এ-ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন এবং যা চেপে গেছেন–তা আমার বন্ধু ওয়াটসন আমাকে জানিয়েছে।

কী চেপে গেছি? উদ্ধতভাবে বললে ভদ্রমহিলা। রাত দশটায় স্যার চার্লসকে ফটকে আসতে বলেছিলেন, আপনি স্বীকার করেছেন। আমরা জানি ঠিক ওই সময়ে ওই জায়গাতেই মারা গেছেন তিনি। এই দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্রটা আপনি চেপে গেছেন।

কোনো যোগসূত্রই নেই।

সেক্ষেত্র বলতে হবে কাকতালীয়টা বাস্তবিকই অসাধারণ। আমার কিন্তু বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত একটা যোগসূত্র আমরা বার করবই। মিসেস লায়ন্স আমি আপনার সঙ্গে অত্যন্ত খোলাখুলি কথা বলতে চাই। আমাদের চোখে স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপার আসলে একটা খুনের কেস এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাতে আপনার বন্ধু মি. স্টেপলটনই শুধু দোষী প্রতিপন্ন হবেন না–তাঁর স্ত্রী-ও জড়িয়ে পড়বেন।

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ভদ্রমহিলা। বলল তীক্ষ্ণস্বরে, তার স্ত্রী!

ঘটনাটা আর গোপন নেই। বোন বলে এতদিন যাকে চালিয়েছেন উনি, আসলে তিনি তার স্ত্রী।

ফের আসন গ্রহণ করেছে মিসেস লায়ন্স। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে চেয়ারের হাতল। লক্ষ করলাম, চাপের চোটে সাদা হয়ে গেছে গোলাপি নখ। ফের বললে, তার স্ত্রী! তার স্ত্রী! উনি তো বিবাহিত নন!

কাঁধ ঝাঁকি দিল শার্লক হোমস।

প্রমাণ করুন! প্রমাণ করুন! প্রমাণ যদি করতে পারেন তো বাকি কথাটা বলার দরকার হল না। দু-চোখের ভয়ংকর ঝলক দেখেই বোঝা গেল প্রমাণ করতে পারলে কী করবে ভদ্রমহিলা।

পকেট থেকে একগাদা কাগজ টেনে বার করতে করতে হোমস বলল, প্রমাণ করব বলে তৈরি হয়েই এসেছি। এই দেখুন একটা ফটো চার বছর আগে ইয়র্কে তোলা হয়েছিল–স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। যদিও নাম লেখা রয়েছে মিস্টার এবং মিসেস ভ্যানডেলর, আপনি কিন্তু ওঁকে দেখলেই চিনবেন–মিসেসকেও চিনবেন, যদি স্বচক্ষে দেখে থাকেন। এই দেখুন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর লেখা তিনটে দৈহিক বিবরণ–মিস্টার এবং মিসেস ভ্যানডেলরকে দেখতে কীরকম, তিনজনেই লিখে জানিয়েছেন। তখন এঁরা সেন্ট অলিভার্স প্রাইভেট স্কুলে ছিলেন। পড়ে দেখুন শনাক্ত করতে পারছেন কিনা।

চোখ বুলিয়ে নিল মিসেস লায়ন্স। তারপর মরিয়া মহিলার মতন দৃঢ়-সংবদ্ধ আড়ষ্ট মুখ তুলে চাইল আমাদের পানে।

বলল, আমার স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলে আমাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে এই লোকটা। লোকটা ঠগ, শয়তান, বদমাশ–ডাহা মিথ্যে বলেছে আগাগোড়া। আজ পর্যন্ত একটা সত্যিও বলেনি। কিন্তু কেন? কেন, ভেবেছিলাম যা কিছু হচ্ছে আমার ভালোর জন্যেই হচ্ছে। কিন্তু এখন দেখছি আমি ওর হাতের যন্ত্র বই আর কিছু না। আমি যার বিশ্বাসের পাত্রী নই, সেই-বা আমার বিশ্বাসের পাত্র হতে যাবে কেন? কেন আমি তাকে আড়াল করে রাখব তার কুকর্মের ফল ভোগ করা থেকে; যা খুশি জিজ্ঞেস করুন, কিচ্ছু গোপন করব না। একটা কথা শুধু বলে রাখি! বৃদ্ধ ভদ্রলোককে চিঠিখানা লেখবার সময়ে কল্পনাও করতে পারিনি তার সর্বনাশ করতে যাচ্ছি–উনি যে আমার সত্যিকারের উপকারী বন্ধু ছিলেন।

শার্লক হোমস বললে, ম্যাডাম, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্তরালে কী ব্যাপার হয়ে চলেছে, তা সহজে বোঝাতে গেলে সব ঘটনা গোড়া থেকে বলা দরকার। বস্তুগত ত্রুটি থাকলে শুধরে দেবেন। স্টেপলটনই এ-চিঠি পাঠানোর মতলব দিয়েছিল আপনাকে?

ও মুখে মুখে বলে গেছিল, আমি লিখে নিয়েছিলাম।

বিবাহবিচ্ছেদের মোকদ্দমার যা খরচ, স্যার চার্লসের কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যেই চিঠি লিখতে বলেছিলেন?

ঠিক কথা।

চিঠিখানা পাঠানোর পর ওই সময়ে আপনাকে যেতে নিরস্ত করেছিলেন?

বললে, তার আত্মসম্মানে লাগছে। অন্য ব্যক্তি টাকার জোগান দেবে তবে বিবাহবিচ্ছেদ হবে এবং আমাদের মিল হবে, এটা ভাবা যায় না। সে গরিব হতে পারে, কিন্তু শেষ কপর্দকটিও ব্যয় করবে মিলনের অন্তরায় দূর করার জন্যে।

ভদ্রলোকের চরিত্রে বেশ দৃঢ়তা আছে দেখা যাচ্ছে নীতিতে অবিচলিত থাকেন। তারপর থেকে খবরের কাগজে মৃত্যুসংবাদ পড়া পর্যন্ত আর কিছু শোনেননি?

না। স্যার চার্লসের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা যেন কাকপক্ষীও জানতে না-পারে–এই মর্মে হলফ করিয়ে নিয়েছিল আপনাকে?

হ্যাঁ। বললে, মৃত্যুটা অত্যন্ত রহস্যজনক। ঘটনাটা ফাঁস হয়ে গেলে পুলিশ নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করবে। দারুণ ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল বলতে পারেন।

তা ঠিক। আপনি কিন্তু সন্দেহ করেছিলেন?

দ্বিধায় পড়ল মিসেস লায়ন্স। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে, ওকে আমি চিনি। আমার ওপর যদি আস্থা রাখতে পারত, আমি তার মর্যাদা নিশ্চয় দিতাম।

শার্লক হোমস বললে, মমাটের ওপর আমার বিশ্বাস স্রেফ কপালজোরে আপনি বেঁচে গেছেন। ওঁকে আপনি কবজায় পেয়েছেন উনি তা জানতেন–তারপরেও যে বেঁচে আছেন। এখনও এইটাই যথেষ্ট। মাস কয়েক খাড়া পাহাড়ের কিনারা দিয়ে হেঁটেছেন জানবেন জীবন ঝুলছিল সুতোর ওপর। মিসেস লায়ন্স, এবার সুপ্রভাত জানিয়ে বিদায় নেব। খুব সম্ভব শিগগিরই ফের যোগাযোগ হবে।

শহর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন পৌঁছোনোর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে হোমস বললে, কেস ক্রমশ নিটোল হয়ে আসছে। একটার পর একটা বাধা সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। আধুনিক যুগে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এবং অসাধারণ যত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ-কেস

তার মধ্যে একটা। খুব শিগগিরই কেসটার একটা পরস্পর-সংযুক্ত একটানা বিবরণ শোনাবার পরিস্থিতিতে পৌঁছোব। অপরাধতত্ত্বের ছাত্ররা অনুরূপ অপরাধের সন্ধান পাবে ১৮৬৬ সালে অনুষ্ঠিত লিটল রাশিয়ার গ্রোড়নো» কেসে; নর্থ ক্যারোলিনার অ্যান্ডারসন হত্যাগুলোও প্রায় এইরকমই বটে, কিন্তু এ-কেসের একেবারেই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এখনও পর্যন্ত দেখো চতুর-চূড়ামণি এই লোকটার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোনো কেস খাড়া করা যায়নি। কিন্তু আজ রাতে শয্যাগ্রহণের আগেই যদি তা স্পষ্ট না হয়, তাহলে খুবই অবাক হব আমি।

প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ফোঁস ফোঁস ঝন ঝন শব্দে এসে পৌঁছোল লন্ডন এক্সপ্রেস। প্রথম শ্রেণির একটা কামরা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নামল ছোটোখাটো চেহারার বুলডগ টাইপের অতি-চটপটে একটা লোক। করমর্দন করলাম তিনজনে। শার্লক হোমসের প্রতি লেসট্রেডের সশ্রদ্ধ চাহনি দেখে বুঝলাম, প্রথম দিকে একত্র কাজের পর থেকে অনেক শিক্ষাই হয়েছে। তার। প্রথম-প্রথম যুক্তিবাদীর অনুমিতি কী পরিমাণ অবজ্ঞা জাগ্রত করত হাতেকলমে কর্মীর অন্তরে, তা এখনও জ্বলজ্বল করছে আমার স্মৃতির পর্দায়।

সুখবর আছে? শুধোয় লেসট্রেড।

বছরের সবচেয়ে বড়ো খবর আছে, বললে হোমস। কাজে নামার আগে হাতে আছে দুটো ঘণ্টা। আমার মতে সময়টা খুব ভালোভাবে কাটবে যদি এই ফাঁকে ডিনার খাওয়ার পর্বটা সেরে নিই। লেসট্রেড, তারপর ডার্টমুরের খাঁটি নৈশ-বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে

গলার মধ্যে থেকে লন্ডনের কুয়াশাটা ঠেলে বার করে দিয়ো। ডার্টমুরে যাওনি বুঝি কখনো? প্রথম দর্শনের স্মৃতি এ-জীবনে আর ভুলবে বলে মনে হয় না।

বাস্কারভিলস হাউন্ড

শার্লক হোমসের একটা ত্রুটি আছে। জানি না আর কেউ একে ত্রুটি বলবেন কিনা। পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে সফল না-হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে তিলমাত্র আভাস দিতে নারাজ। এর জন্য কিছুটা দায়ী ওর কর্তৃত্বব্যঞ্জক প্রকৃতি–ধারেকাছে যারা থাকে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার আর তাদের চিত্তে চমক সৃষ্টি ওর স্বভাবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। বাকিটা এসেছে ওর পেশাগত সতর্কতা থেকে কোনো ফাঁক রাখতে সে রাজি নয়। ফলে সহযোগী আর অনুচরদের মনে চাপ পড়ে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে থাকে ভেতরটা। এহেন মানসিক অস্থিরতায় বহুবার ভুগেছি এর আগে কিন্তু সেদিনের মতো নয়–অন্ধকারে গা ঢেকে গাড়িতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সময়ে আমার মনের অবস্থা ভাষায় বোঝাতে পারব না। সামনেই সুকঠিন পরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষাই বলা উচিত। শেষ চাল চালতে চলেছি। অথচ সে-বিষয়ে টু শব্দটি করছে না হোমস। কীভাবে বাজিমাত করবে, কী করবে না-করবে তা মনে মনে আঁচ করা ছাড়া আর পথ দেখছি না। ঠান্ডা হিম বাতাস মুখে আছড়ে পড়তেই রোমাঞ্চিত হল প্রতিটি স্নায়ু আসন্ন রোমাঞ্চের সম্ভাবনায় শিউরে উঠল প্রতিটি অণুপরমাণু। অন্ধকারে দু-পাশে জেগে উঠল সংকীর্ণ রাস্তার পর রাস্তা। বুঝলাম এসে গেছে রহস্যাবৃত বাদা। কদম কদম ঘোড়া এগোচ্ছে, আমরাও কদম কদম এগোচ্ছি চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চার অভিমুখে। চাকা ঘুরছে এবং প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গেসঙ্গে কাছে এগিয়ে আসছে অজ্ঞাত ভয়ংকর।

দু-চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়িটা ভাড়া করা। চালক বসে থাকায় প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি না। বাধ্য হয়ে সময় কাটাচ্ছি অকিঞ্চিৎকর কথাবার্তায়। অথচ তখন উৎকণ্ঠা, আবেগ আর আসন্ন সম্ভাবনার চিন্তায় টান টান হয়ে রয়েছে প্রতিটি স্নায়ু। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাড়ি পেরিয়ে আসার পর যখন বুঝলাম বাস্কারভিল হল এসে গেছে এবং কর্মক্ষেত্র আর দূরে নেই–তখন কিছুটা রেহাই পেলাম অস্বাভাবিক এই সংযমের কবল থেকে। দরজা পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে আর গেলাম না, নেমে পড়লাম ইউ-বীথির গেটে। ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে কুমবে ট্রেসি ফিরে যেতে হুকুম দিলাম গাড়োয়ানকে। তারপর পদব্রজে রওনা হলাম মেরিপিট হাউস অভিমুখে।।

লেসট্রেড, তুমি সশস্ত্র ?

হাসল খর্বকায় ডিটেকটিভ। ট্রাউজার্স যতক্ষণ আছে, ট্রাউজার্সে একটা হিপপকেটও আছে। হিপপকেট যতক্ষণ আছে, তার মধ্যে একটা বস্তুও আছে।

ভালো! আমি আর আমার এই বন্ধুটিও জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

মি. হোমস, এ-ব্যাপারে অনেক, এগিয়ে গেছেন দেখছি। এখন কীসের খেলা খেলতে চলেছেন?

অপেক্ষা করার খেলা।

যাই বলুন, জায়গাটা খুব আহামরি নয়–প্রাণে পুলক জাগানোর মতো নয়, গ্রিমপেন মায়ারের ওপর জমে থাকা বিশাল কুয়াশা-সরোবর আর পাহাড়ের পর পাহাড়ের বিষাদকালো চালগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে বললে ডিটেকটিভ। সামনেই একটা বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে।

ওই হল মেরিপিট হাউস–আমাদের যাত্রাপথের শেষ। একটা অনুরোধ, পা টিপে টিপে হাঁটো, ফিসফিস করে কথা বলো–জোরে কথা একদম নয়।

যেন বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এইভাবেই হাঁটছিলাম রাস্তা বরাবর। কিন্তু শ-দুই গজ ব্যবধান থাকতেই হোমস দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের।

বললে, এতেই হবে। ডান দিকের এই পাথরগুলো পর্দার মতো চমৎকার আড়াল করে রাখবে আমাদের।

অপেক্ষা করব? হ্যাঁ, ওত পেতে, এইখানেই বসে থাকব। লেসট্রেড, এই ফাঁকটায় ঢুকে পড়ো। ওয়াটসন, তুমি তো বাড়ির ভেতরে গেছিলে, তাই না? ঘরগুলো কোথায় কীভাবে আছে বলতে পারো? এইদিকের জাফরি কাটা জানলাগুলো কীসের?

রান্নাঘরের জানলা মনে হচ্ছে।

তার ওদিকে ওই যে জানলাটা খুব ঝলমল করছে, ওটা কীসের?

নিশ্চয় খাবার ঘর।

খড়খড়ি তোলা রয়েছে। এখানকার জমি তোমার চেনা। গুড়ি মেরে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসো কী করছে ওরা! কিন্তু খবরদার, ঘাপটি মেরে দেখছ এটা যেন টের না-পায়!

পা টিপে টিপে গেলাম রাস্তা বেয়ে। মাথা-দাবানো ঘেরা ফলের বাগানের পাশ দিয়ে একটা পাঁচিল ঘেরা পুরো বাড়িটা। হেঁট হয়ে দাঁড়ালাম পাঁচিলটার পেছনে। ছায়ায় গা ঢেকে গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালাম যেখান থেকে পর্দাহীন জানলার মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়।

ঘরে রয়েছে দু-জন পুরুষ মানুষ স্যার হেনরি এবং স্টেপলটন। গোলটেবিলের দু-পাশে বসে দু-জনে। দু-জনেরই মুখের পাশের দিক ফেরানো রয়েছে কফি আর সুরা। স্টেপলটন তড়বড় করে কথা বলে চলেছেন প্রাণশক্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্যার হেনরি কিন্তু ফ্যাকাশে এবং অন্যমনস্ক। অলক্ষুণে বাদার ওপর দিয়ে একলা হেঁটে যেতে হবে ভেবেই বোধ হয় মুষড়ে পড়েছেন।

কথা বলতে বলতে স্টেপলটন একবার উঠে দাঁড়ালেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্যার হেনরি ফের গেলাস ভরে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে ল্যাগলেন। দরজায় কঁাচ-কাচ আওয়াজ শুনলাম। কাঁকরের ওপর বুটজুতোর কড়মড় আওয়াজ কানে ভেসে এল। আমি যে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে আছি, সেই পাঁচিলের অন্যদিকে এগিয়ে গেল

পায়ের আওয়াজ। মাথা তুলে দেখলাম, ফলের বাগানের কোণে একটা আউট-হাউসের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন প্রকৃতিবিদ। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে একটা অদ্ভুত খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল ভেতরে। মিনিট খানেক ভেতরে থেকেই ফের বেরিয়ে এলেন স্টেপলটন। দরজায় তালা দিলেন। আমার সামনে গিয়ে ঢুকলেন বাড়িতে। অতিথির সামনে গিয়ে বসবার পর গুড়ি মেরে ফিরে এসে সঙ্গীদের বললাম কী-কী দেখেছি।

বলা শেষ হলে হোমস জিজ্ঞেস করল, ভদ্রমহিলা ওখানে নেই বলছ?

না।

তাহলে উনি কোথায়? রান্নাঘর ছাড়া আর কোনো ঘরে তো আলো জ্বলছে না।

আমার মাথায় আসছে না।

আগেই বলেছি, সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির ওপরে গাঢ়, সাদা কুয়াশা ভাসছিল। দেখা গেল ভাসতে ভাসতে কুয়াশাটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত জমাট গাঢ়, সুস্পষ্ট প্রাচীরের মতোই তা মন্থর গতিতে অবিচলভাবে আসছে আমাদের দিকে। চাঁদের আলোয় বিরাট তুহিন ক্ষেত্রের মতো ঝকমক করছে ভাসমান কুয়াশা। কুয়াশা ছুঁড়ে মাথা তুলে রয়েছে দূরে দূরে কালো পাহাড়গুলোর এবড়োখেবড়ো শীর্ষদেশ। হোমসের মুখ

ঘুরে গেল সেইদিকে এবং ধীরগতি আগুয়ান শ্বেত কুয়াশার পানে তাকিয়ে বললে অস্ফুট, অসহিষ্ণু কণ্ঠে :

ওয়াটসন, এ যে দেখছি নড়ছে।

গুরুতর কিছু কি?

খুবই গুরুতর। আমার সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিতে পারে শুধু এই একটি জিনিস। ওঁর আসার সময় হয়েছে। এখনই তো দশটা বাজে। কুয়াশায় রাস্তা ঢেকে যাওয়ার আগেই যদি বেরিয়ে পড়েন, তবেই সফল হবে আমার প্ল্যান, প্রাণে বেঁচে যাবেন উনি।

সুনির্মল নৈশ-আকাশ ঝকঝক করছে মাথার ওপর। তারাগুলো উজ্জ্বল এবং শীতল। কোমল, অনিশ্চিত প্রভায় সমগ্র দৃশ্যটা দীপ্যমান করে রেখেছে অর্ধ-চন্দ্র। সামনেই সুবৃহৎ অন্ধকারের পিণ্ডর মতো মেরিপিট হাউসের খাড়া খাড়া চিমনি আর করাতের দাঁতের মতো কাটা কাটা ছাদ স্পষ্ট হয়ে জেগে রয়েছে রুপোলি চুমকি বসানো আকাশের বুকে। ফলের বাগান আর জলার বুকে বিস্তৃত রয়েছে নীচু-নীচু জানলা থেকে বিচ্ছুরিত সোনালি আলোর চওড়া রশ্মিরেখা। একটা রশ্মিরেখা সহসা নিভে গেল। রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল চাকরবাকর। একটাই ল্যাম্প কেবল জ্বলতে লাগল বসবার ঘরে–যে-ঘরে মুখোমুখি বসে সিগার টানছেন দুই পুরুষ মূর্তি–একজনের অন্তরে খুনের সংকল্প, তিনি গৃহস্বামী; আরেকজন জানেন না কী ঘটতে চলেছে, তিনি অতিথি। দু-জনেই মশগুল গল্পে।

বাদার অর্ধেক চাপা পড়ে গেছে সাদা পশমের মতো সুবিশাল কুয়াশা-প্রাচীরে। মিনিটে মিনিটে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে মহাকায় শ্বেতপিণ্ডআলোকিত জানালার স্বর্ণাভক্ষেত্রে এর মধ্যেই হালকা পেঁজা তুলোর মতো সঞ্চয়মান কুয়াশা স্তবক দেখা দিয়েছে। ফলের বাগানের দূরস্থিত প্রাচীর এর মধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে কুয়াশা যবনিকায়। কুণ্ডলী পাকানো শ্বেতবাষ্পের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন হি-হি করে কাঁপছে বৃক্ষসারি। মালার মতো বাড়ির দু-পাশ ঘিরে গাঢ় কুয়াশা গড়িয়ে এল সামনের দিকে এবং নিরেট নিচ্ছিদ্র প্রাচীরের মতো ফের এক হয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রে ভাসমান বিচিত্র জাহাজের মতো কেবল দেখা গেল মেরিপিট হাউসের ওপর তলা আর ছাদখানা। আতীব্র আবেগে সবলে পাথরের ওপর হাত ঠুকল হোমস, অসহিষ্ণুভাবে পদাঘাত করল মাটিতে।

আর পনেরো মিনিটের মধ্যে না-বেরোলে রাস্তা ঢেকে যাবে। আধঘণ্টা পরে নিজেদের হাতই আর দেখতে পাব না।

পেছিয়ে গিয়ে উঁচু জমিতে দাঁড়ালে হয় না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভালো।

কুয়াশা প্রাচীর যতই এগোয়, আমরাও ততই পেছোই। পেছোতে পেছোতে এসে গেলাম বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইলটাক দূরে। গাঢ় শ্বেত সমুদ্র কিন্তু তখনও এগোচ্ছে বিরামহীন মন্থর গতিতে চাঁদের আলোয় রুপোর মতো ঝকঝক করছে কিনারা।

হোমস বললে, বড্ড দূরে চলে যাচ্ছি। আমাদের কাছে আসার আগেই ওঁর নাগাল ধরে ফেলুক, এটা আমি চাই না। কপালে যাই থাকুক, এ-জায়গা ছেড়ে আর নড়ছি না। বলে, হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতল জমিতে। জয় ভগবান, উনি আসছেন, পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বাদার নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল দ্রুত পদধ্বনিতে। পাথরের আড়ালে গুড়ি মেরে বসে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলাম সামনের রৌপ্য-শীর্ষ প্রাচীরের দিকে। পায়ের আওয়াজ আরও কাছে এল। ঠিক যেন পর্দার আড়াল থেকে কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন যাঁর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকা। সুনির্মল, নক্ষত্রালোকিত আকাশের তলায় বেরিয়ে এসে বিস্মিত হলেন, চারপাশে চেয়ে দেখলেন। তারপর দ্রুত চরণে পথ বেয়ে এসে আমাদের খুব কাছ দিয়ে পেছনের দীর্ঘ ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলেন ওপরে। হাঁটতে হাঁটতে দু-কাঁধের ওপর দিয়ে ঘন ঘন তাকাতে লাগলেন পেছনে কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না।

চুপ! চাপা গলায় গর্জে উঠল হোমস, সঙ্গেসঙ্গে পিস্তলের ঘোড় তোলার মৃদু কটাং আওয়াজ শুনলাম। সামনে তাকাও! আসছে, সে আসছে!

মাটি কামড়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসা কুয়াশা-প্রাচীরের কেন্দ্রস্থল থেকে ভেসে এল একটা একটানা মচমচ, খসখস খড়খড় শব্দ–ক্ষীণ কিন্তু চটপটে, দ্রুত, তেজালো। পঞ্চাশ গজ দুরে এসে গেছে মেঘপুঞ্জ। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তিনজনেই চেয়ে রইলাম সেদিকে না-জানি কী শরীরী বিভীষিকা উদ্দামবেগে আবির্ভূত হবে ভেতর থেকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম হোমসের কনুইয়ের কাছে, মুহূর্তের জন্যে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুখ, অথচ বিজয়োল্লাসে দুই চক্ষু ঝকঝক করছে চাদের আলোয়। আচম্বিতে দুটো চোখই যেন আড়ষ্ট স্থির চাহনি নিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটরের মধ্যে থেকে বিষম বিস্ময়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল দুই ঠোঁট। সেই মুহূর্তে বিকট গলায় ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে লেসট্রেড উপুড় হয়ে মুখ খুঁজড়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি। অবশ হাতে চেপে ধরলাম পিস্তল, মন কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেল কুয়াশার ছায়া থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ভয়াবহ আকৃতিটা দেখে। হাউন্ডই বটে, কয়লা-কালো অতিকায় হাউন্ড, কিন্তু মর-জগতের কোনো মানুষ এ-হাউন্ড আজও দেখেনি। গলগল করে আগুন ঠিকরে আসছে উন্মুক্ত মুখবিবর থেকে, ধূমায়িত জ্বলন্ত চাহনি লেলিহান হয়ে রয়েছে দুই চক্ষুতে; নাক-মুখ ঘাড়-গলকম্বল প্রকট হয়ে উঠেছে লকলকে অগ্নিশিখায়। কুয়াশা প্রাচীর ভেদ করে সেদিন যে কৃষ্ণকুটিল বন্য-বর্বর মুখ বিকট হাঁ করে তেড়ে এলে আমাদের দিকে, তার চাইতে হিংস্র, তার চাইতে রক্ত-জল-করা, তার চাইতে নারকীয় মুখের কল্পনা ঘোর উন্মত্ত মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ত দুঃস্বপ্নেও উদিত হয়নি আজ পর্যন্ত।

লম্বা লম্বা লাফ মেরে ঢাল বেয়ে আসছে কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড প্রাণীটা বন্ধুটি যে-পথে গিয়েছে, ঠিক সেই পথে পদক্ষেপ অনুসরণ করে তীব্র বেগে খচমচ শব্দে এগিয়ে আসছে করাল আকৃতি। অলৌকিক এই প্রেতচ্ছায়া দর্শনে এমন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলাম যে পাশ দিয়ে তা সাঁৎ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফিরে পেলাম স্নায়ুশক্তি। পরক্ষণেই যুগপৎ গুলিবর্ষণ করলাম আমি আর হোমস। বিকট শব্দে গর্জে উঠল প্রাণীটা–দীর্ঘ টানা আর্তনাদে শিউরে উঠল জলার নৈঃশব্দ্য অন্তত একজনের গুলিও তাহলে লেগেছে। গুলি খেয়েও কিন্তু থামল না–নক্ষত্রবেগে প্রকাণ্ড লাফ মেরে ধেয়ে গেল সামনে। বহুদুরে রাস্তার ওপরে

দেখতে পেলাম ঘুরে দাঁড়িয়েছেন স্যার হেনরি, চাঁদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে মুখখানা, নিঃসীম আতঙ্কে দু-হাত তুলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অসহায়ভাবে শুধু দেখছেন মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন তেড়ে আসছে পেছন পেছন তাঁরই মাড়িয়ে আসা পথের ধুলোর ওপর দিয়ে।।

হাউন্ডের যন্ত্রণা বিকৃত চিৎকারে কিন্তু আমাদের ভয় কেটে গিয়েছিল। যাকে আঘাত করা যায়, সে নিশ্চয় মর-জগতের প্রাণী এবং আহত যদি করে থাকি, বধও করতে পারব নিশ্চয়। সে-রাতে হোমস যেভাবে দৌড়ে গেল, সেভাবে কোনোদিন কাউকে দৌড়োতে দেখিনি। ক্ষিপ্রগতি বলে আমার সুনাম আছে। কিন্তু সেদিন আমি যেমন অক্লেশে পেছনে ফেলে এলাম খর্বকায় পেশাদার ডিটেকটিভকে, ঠিক তেমনি অক্লেশে আমাকে পেছনে ফেলে সামনে ধেয়ে গেল হোমস। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শুনলাম সামনের রাস্তা থেকে স্যার হেনরির মুহুর্মুহু আর্তনাদ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর চাপা গলায় গজরাচ্ছে হাউন্ডটা। আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই দেখতে পেলাম শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে গলায় দাঁত বসাতে যাচ্ছে জানোয়ারটা, পরমুহূর্তেই গর্জে উঠল হোমসের রিভলবার—পর-পর পাঁচটা গুলি প্রাণীটার পার্শ্বদেশে প্রবেশ করিয়ে শূন্য করে ফেলল পাঁচটা নল। তা সত্ত্বেও যন্ত্রণাকাতর শেষ দীর্ঘ বিলাপ-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে প্রাণীটা কটাৎ শব্দে কামড় বসিয়ে দিল শূন্যে। পরক্ষণেই উলটে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চার থাবা দিয়ে ভয়ানকভাবে বাতাস আঁচড়াতে আঁচড়াতে কাত হয়ে গেল দেহ। হাঁপাতে হাঁপাতে হেঁট হয়ে আমি রিভলবারের নল চেপে ধরলাম জানোয়ারটার বীভৎস ঝকমকে মাথায়–কিন্তু ঘোড়া টেপবার আর দরকার হল না। দানব হাউন্ডের মৃত্যু হয়েছে।

স্যার হেনরি যেখানে আছড়ে পড়েছিলেন, সেইখানেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। টান মেরে কলার খুলে ফেললাম আমরা। পাঁজর খালি করা স্বস্তির নিশেস ফেলে ঈশ্বরের জয়গান করে উঠল হোমস দেহের কোথাও আঁচড় নেই–মোটেই জখম হননি স্যার হেনরি যথাসময়ে এসে পড়ে বাঁচাতে পেরেছি তাকে। এর মধ্যেই চোখের পাতা কাঁপতে শুরু করেছে বন্ধুর, নড়াচড়ার সামান্য চেষ্টাও করছেন। ব্যারনেটের দু-পাটি দাঁতের ফাঁকে লেসট্রেড ওর ব্র্যান্ডি-ফ্লাস্ক গুঁজে ধরল। ভয়ার্ত চোখ মেলে স্যার হেনরি তাকালেন আমাদের দিকে।

বললেন ফিসফিস করে, হে ভগবান! এটা কী? দোহাই আপনাদের, বলুন এটা কী?

যাই হোক না কেন, এখন অক্কা পেয়েছে, বললে হোমস। জন্মের মতো খতম করে দিয়েছি। বাস্কারভিল ফ্যামিলির ভূতুড়ে হাউন্ডকে। ধরার ধুলোয় আর তার আবির্ভাব ঘটবে না।

শুধু আকার আর দৈহিক শক্তির দিক দিয়েই এ এক ভয়ংকর প্রাণী। লম্বা হয়ে আমাদের সামনেই পড়ে আছে তার পিলে-চমকানো আকৃতি। খাঁটি ব্লাডহাউন্ড নয়, খাঁটি ম্যাসটিফও নয়। মনে হল দুইয়ের সংমিশ্রণ ছোটো সিংহিনীর মতোই কৃশ, হিংস্র এবং বিরাট। মরণেও তার বিরাট চোয়াল থেকে যেন নীলচে আগুন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝরে পড়ছে এবং কোটরে গাঁথা, ছোটো ছোটো ক্রুর চোখ ঘিরে অগ্নিবলয় লকলক করছে। জলন্ত নাক

মুখে হাত বুলিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। আমার আঙুলেও ধূমায়িত আগুন দেখা গিয়েছে–দপদপ করে জ্বলছে অন্ধকারে।

বললাম, ফসফরাস।

ফসফরাস দিয়ে তৈরি একটা মলম–একেই বলে ধড়িবাজি, মৃত প্রাণীটার গা শুকতে শুকতে বললে হোমস। নির্গন্ধ মলম। গন্ধ নেই বলেই গন্ধ শুকে পেছন ধাওয়া করার ক্ষমতায় বাগড়া পড়েনি। স্যার হেনরি, অ্যাপনাকে এই প্রচণ্ড ভয়ের মাঝে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে আমাদের ক্ষমা করবেন। আমি তৈরি ছিলাম একটা হাউন্ডের জন্যে-এ-রকম একটা প্রাণীর জন্যে নয়। তা ছাড়া, কুয়াশার জন্যে টক্কর নেওয়ার সময় পর্যন্ত পাইনি।

আমার জীবন রক্ষে করেছেন আপনি।

প্রথমে বিপন্ন করার পর। দাঁড়াবার মতো শক্তি পেয়েছেন?

আর এক ঢোক ব্র্যান্ডি দিন–তারপর যা বলবেন করব। এই তো এবার একটু ধরুন আমাকে। বলুন কী করতে চান?

আপনাকে এখানে রেখে যেতে চাই। আজ রাতে আর নতুন অ্যাডভেঞ্চারের মতন অবস্থায় আপনি নেই। এখানে যদি অপেক্ষা করেন, আমাদের যে কেউ একজন আপনার সঙ্গে বাস্কারভিল হল পর্যন্ত যাবেখন।

টলমলিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন স্যার হেনরি। কিন্তু মুখভাব তখনও বিকট বিবর্ণ, হাত-পা তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে একটা পাথরে বসিয়ে দিলাম। দু-হাতে মুখ গুজে বসে রইলেন তিনি। মুহুর্মুহু শিহরিত হতে লাগল প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

হোমস বললে, আপনাকে এখন এখানেই ছেড়ে যাব আমরা। কাজ এখনও বাকি প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। কেস হাতের মুঠোয় এসে গেছে, লোকটাকে এবার চাই।

দ্রুতপদে হাঁটতে হাঁটতে জের টেনে নিয়ে বললে, বাড়িতে ওঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই কম। গুলির আওয়াজ শুনেই নিশ্চয় বুঝেছেন শেষ হয়েছে লীলাখেলা।

অনেক দূরে ছিলাম কিন্তু আমরা, তা ছাড়া কুয়াশাতেও আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।

তুমি জেনে রেখো হাউন্ডের পেছন পেছন এসেছিলেন উনি কাজ ফুরোলেই ডেকে নেওয়ার জন্যে। না, না, এতক্ষণে পালিয়েছেন! তবুও বাড়ি তল্লাশ করে দেখতে হবে আছেন কিনা।

দরজা দু-হাট করে ভোলা ছিল। তেড়েমেড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বেগে এ-ঘর ও-ঘর দেখলাম। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল জরাকম্পিত এক বৃদ্ধ ভৃত্য। করিডরে দেখা হল তার সঙ্গে। খাবারঘর ছাড়া কোথাও আর আলো নেই। খপ করে ল্যাম্পটা তুলে নিল হোমস, বাড়ির কোনো অংশ দেখতে বাকি রাখল না। কিন্তু যার পেছনে ছুটে আসা, তার চিহ্ন দেখা গেল না। কোথাও। ওপরতলায় উঠে দেখা গেল একটা শয়নকক্ষের দরজায় তালা দেওয়া।

চেঁচিয়ে উঠল লেসট্রেড, ঘরের মধ্যে কেউ আছে! নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দরজা খুলুন!

ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ গোঙানি আর খসখস শব্দ ভেসে এল। পায়ের চেটো দিয়ে তালার ঠিক ওপরে সবলে লাথি মারল হোমস, দড়াম করে খুলে গেল পাল্লা। উদ্যত পিস্তল হাতে তিনজনেই বেগে ঢুকলাম ভেতরে।

কিন্তু উদ্ধত মরিয়া সেই মহাশয়তানের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলাম না ঘরের মধ্যে। তার বদলে এমন একটা অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত বস্তু প্রত্যক্ষ করলাম যে তিনজনেই ক্ষণকাল বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে।

ঘরটা ছোটো মিউজিয়ামের উপযোগী করে সাজানো। দেওয়াল বোঝাই সারি সারি কাচের আধার ভরতি প্রজাপতি আর মথপোকার বিবিধ সংগ্রহ–বিপজ্জনক এবং জটিল চরিত্রের এই ব্যক্তির অবসর বিনোদনের যা উপাদান; ঘরের কেন্দ্রে একটা সিধে কাঠের বরগা

পোকায় খাওয়া সেকেলের ছাদের কড়িকাঠ ঠেস দিয়ে রাখার জন্যে কোনো এক সময়ে খাড়া করা হয়েছিল। এই খুঁটির সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা মূর্তি অজস্র কাপড়ের ফেটি এবং বিছানার চাদর দিয়ে আপাদমস্তক বাঁধা থাকায় চেনা মুশকিল পুরুষ না নারী। গলার ওপর দিয়ে একটা তোয়ালে চেপে টেনে নিয়ে গিয়ে কষে বাঁধা হয়েছে খুঁটির পেছনে। আর একটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা মুখের নীচের দিক। তার ওপরে একজোড়া কৃষ্ণচক্ষু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আমাদের পানে–দুঃখ আর কষ্ট, লজ্জা আর অপমানের সঙ্গেসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে একটা ভয়াবহ জিজ্ঞাসা প্রকট হয়ে রয়েছে চোখের ভাষায়। মুহূর্তের মধ্যে মুখ থেকে তোয়ালে খুলে সারাশরীরের বাঁধন খসিয়ে দিতেই আমাদের সামনে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন মিসেস স্টেপলটন। বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়তেই দেখলাম ঘাড়ের ওপর কশাঘাতের টকটকে লাল স্পষ্ট দাগ।

চিৎকার করে উঠল হোমস, জানোয়ার কোথাকার! লেসট্রেড, ব্র্যান্ডি-বোতল দাও! তুলে চেয়ারে বসিয়ে দাও! উৎপীড়ন আর ক্লান্তিতে জ্ঞান হারিয়েছেন দেখছি।

চোখ মেললেন ভদ্রমহিলা। শুধোলেন, উনি নিরাপদ তো? পালিয়েছেন?

ম্যাডাম, আমাদের খপ্পর থেকে পালাতে উনি পারবেন না।

না, না, আমার স্বামীর কথা আমি বলছি না। স্যার হেনরি? নিরাপদ তো?

হ্যাঁ।

হাউন্ডটা?

মারা গেছে।

পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস স্টেপলটন।ভগবান বাঁচিয়েছেন! ভগবান বাঁচিয়েছেন। উফ, কী শয়তান! দেখুন আমার কী অবস্থা করেছে! বলে, বাহু বাড়িয়ে ধরলেন আস্তিনের মধ্যে থেকে। শিউরে উঠলাম দাগড়া দাগড়া কালসিটে আর বেতের দাগ দেখে! এ তো কিছুই নয়। আমার মনটাকেই যে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, মনের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, অপবিত্র করে দিয়েছে। সব সইতাম–জীবনভোর প্রতারণা, নির্জনে বসবাস, দুর্ব্যবহার সমস্ত–যদি জানতাম সবার ওপরে আছে তার ভালোবাসা। শুধু এই আশা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারতাম কিন্তু এখন জেনেছি তাও মিথ্যে তার কাছে আমি একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির টোপ, একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। বলতে বলতে আকুল আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

হোমস বললে, ম্যাডাম, তার প্রতি আপনার কোনো সদিচ্ছা যখন নেই, তাহলে বলুন কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে। কুকর্মে যদি কখনো তার সহায় হয়ে থাকেন, তাহলে এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করুন আমাদের সাহায্য করুন।

পালিয়ে সে একটা জায়গাতেই যেতে পারে। পঙ্কভূমির একদম মাঝে একটা দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপে একটা টিনের পুরোনো খনি আছে। হাউন্ড রাখত সেইখানে পালিয়ে গিয়ে

যাতে আশ্রয় নিতে পারে, তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে সেখানে। এখন সে সেইখানেই গিয়েছে।

সাদা পশমের মতো কুয়াশা প্রাচীর দুলছে জানলার সামনে। সেইদিকে ল্যাম্প তুলে ধরল হোমস।

বললে, দেখেছেন? আজ রাতে গ্রিমপেন পঙ্কভূমিতে পথ চিনে যেতে কেউ পারবে না।

হেসে উঠে, হাততালি দিলেন মিসেস স্টেপলটন। ভীষণ উল্লাসে ঝিকমিক করে উঠল চোখ আর দাঁত।

বললেন সোল্লাসে, খুঁজে খুঁজে যেতে ঠিক পারবে–বেরোতে আর পারবে না। পথ চেনার কাঠিগুলো দেখতে পাবে না তো আজকের রাতে! পঙ্কভূমির মাঝ দিয়ে পথ চিনে যাওয়ার জন্যে ও আর আমি দু-জনে মিলে পুঁতেছিলাম সরু লম্বা কাঠির সারি। ইস! আজকেই যদি তুলে ফেলতাম! তাহলে ওকে কবজায় পেতেন অনায়াসে।

বেশ বুঝলাম, কুয়াশা না-সরা পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে কোনো লাভ নেই। তাই বাড়ি পাহারায় লেসট্রেডকে রেখে ব্যারনেটকে নিয়ে বাস্কারভিল হলে ফিরে এলাম আমি আর হোমস। স্টেপলটনের কাহিনি আর লুকোনো গেল না বটে, কিন্তু সে-আঘাত তিনি বুক বেঁধে সহ্য করলেন যখন শুনলেন তার প্রণয়িনীর প্রকৃত কাহিনি। নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের নিদারুণ মানসিক আঘাত কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না। স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার

দরুন সকাল হওয়ার আগেই দারুণ জ্বরে বিকারের ঘোরে আবোল তাবোল বকতে শুরু করলেন! চিকিৎসা শুরু করলেন ডক্টর মর্টিমার। নিয়তির লিখনে দুজনকে একত্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোতে হয়েছিল এরপর। দীর্ঘ এক বছর ভূমণ্ডল পর্যটনের পর আগের স্বাস্থ্য আর মন ফিরে পেয়ে অভিশপ্ত ভূসম্পত্তির ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল।

অত্যাশ্চর্য এই উপাখ্যানের উপসংহারে এবার দ্রুত পৌঁছোচ্ছি। সুদীর্ঘকাল যে কৃষ্ণকুটিল বিভীষিকা আর নামহীন ভয়ংকর আতঙ্ক ঘিরেছিল এবং যে ভয়-বিভীষিকার অবসান ঘটল শেষ পর্যন্ত এইরকম শোচনীয়ভাবে পাঠক-পাঠিকাকে তার ভাগ দেওয়ার চেষ্টা আমি করেছি। হাউন্ডের মৃত্যুর পরের দিন সকালে কুয়াশা বিদেয় হওয়ার পর মিসেস স্টেপলটন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন পঙ্কভূমির কেন্দ্রদেশে। যাওয়ার পথ ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আবিষ্কার করেছিলেন। এখন স্ত্রীটি পরম আগ্রহে আর বিষম আনন্দে সেই পথ ধরেই নিয়ে গেলেন আমাদের পলাতক স্বামীর সন্ধানে। এই থেকেই উপলব্ধি করতে পারলাম কী নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এই ভদ্রমহিলা। ক্রমশ সরু হয়ে একটা জমি ঢুকে গেছে দূর বিস্তৃত পঙ্কভূমির মধ্যে। জলাভূমির পচা উদ্ভিজ পদার্থে প্যাচপেচে শক্ত মাটির এই সরু অন্তরীপে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। অন্তরীপ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে কতকগুলো সরু লম্বা কাঠি এখানে সেখানে পোঁতা রয়েছে কাদার মধ্যে। অর্থাৎ পথটা আঁকাবাঁকাভাবে গিয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে। সবুজ গাঁজলা ভরতি পচা আগাছা আর নোংরা পাঁকের মধ্যে দিয়ে পথের সন্ধান পাবে না নতুন মানুষ। দেখেই শিউরে উঠবে। দুর্গন্ধযুক্ত নলবন এবং প্রচুর সরল এঁটেল মাটির মতো আঠালো জলজ উদ্ভিদ থেকে একটা পচা গন্ধ আর পুতিগন্ধময় ভারী বাষ্প এসে

আছড়ে পড়ল আমার মুখে। পা ফসকে একাধিকবার ঊরু পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলেছি কালো পাঁকের মধ্যে, পায়ের তলায় কয়েক গজ জায়গা জুড়ে মৃদু কোমলভাবে তরঙ্গায়িত হয়েছে পাঁক কেঁপে কেঁপে উঠেছে বারংবার। পাঁকের নাছোড়বান্দা কামড় থেকে পা তুলতে বেগ পেয়েছি প্রতি পদক্ষেপে, ডুবে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে অতল অঞ্চল থেকে যেন একটা সাংঘাতিক বৈরী হাত টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে কুৎসিত তলদেশে। প্রতিবার পাঁকের খপ্পরে পা আটকে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এই একই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে অন্তরে–ক্রুর কুটিল অভিসন্ধি নিয়ে কে যেন আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে পাকের তলায়। বিপদসংকুল এ-পথে আমাদের আগে যে একজন গিয়েছে, তার প্রমাণ পেলাম একবারই। আঠালো কাদার মধ্যে থেকে তুলোঘাসের একটা পটি বেরিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে কালোমতো কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। পথ থেকে সরে গিয়ে বস্তুটা ধরতে গিয়ে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলল হোমস এবং আমরা টেনে না বার করলে এ-জীবনে আর ওকে শক্ত ভূমিতে পা রাখতে হত না। একটা পুরোনো কালো বুট জুতো তুলে ধরল শূন্যে। ভেতরের চামড়ায় ছাপা রয়েছে একটা নাম–মেয়ার্স, টরোন্টো।

বলল, কর্দম স্নানের উপযুক্ত জিনিসই বটে। এই সেই নিখোঁজ বুট–যা হারিয়েছিলেন আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি।।

পালানোর সময় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন স্টেপলটন।

ঠিক ধরেছ। স্যার হেনরির পেছনে হাউন্ড লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে হাতে রেখেছিলেন বুটটা–খেল খতম হয়েছে জেনে হাতে নিয়েই ছুটতে আরম্ভ করেন। এইখানে এসে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এই পর্যন্ত নিরাপদে এসেছেন বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু এর বেশি আর কিছু জানবার মতো ভাগ্য আমাদের ছিল না। কল্পনা অনেক কিছুই করা যেতে পারে, সঠিক কী হয়েছে বলা মুশকিল। জলার ওপর পায়ের ছাপ খুঁজে বার করার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবসময়েই ভুরভুর করে কাদা উঠছে ওপরদিকে পায়ের ছাপ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে দেখতে দেখতে। তা সত্ত্বেও বাদা পেরিয়ে শক্ত জমিতে পৌঁছোনোর পর সাগ্রহে পদচিহ্নের সন্ধান করলাম। কিন্তু ক্ষীণতম পায়ের ছাপও চোখে পড়ল না। মৃত্তিকার কাহিনি যদি সত্য বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে বলব আগের রাতের কুয়াশা ঠেলে দ্বীপের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আর পৌছতে পারেননি স্টেপলটন। সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির বুকে কোথাও, প্রকাণ্ড বাদার নোংরা পঙ্কিল ক্লেদের মধ্যে তিনি তলিয়ে গিয়েছেন চিরতরে। শীতলচিত্ত নিষ্ঠুর-হৃদয় মানুষটির চিরন্তন কবর রচিত হয়েছে শীতল, নিতল পাঁকের রাজ্যে।

বাদা-বেষ্টিত দ্বীপে হিংস্র স্যাঙাতকে লুকিয়ে রাখার অনেক চিহ্নই অবশ্য পেলাম। প্রকাণ্ড একটা চাকা কল আর আবর্জনায় অর্ধেক ভরতি একটা পাতালকুপ দেখেই বোঝা গেল কোথায় ছিল পরিত্যক্ত টিনের খনি। পাশেই খনি শ্রমিকদের কুটিরগুলো প্রায় মাটিতে মিশে এসেছে। চারপাশের পচা পাঁকের দুর্গন্ধে তিষ্ঠোতে না-পেরে নিশ্চয় সটকান দিয়েছিল বেচারিরা। এইরকম একটা ভগ্ন প্রায় কুটিরের দেওয়ালে ইংরেজি ইউয়ের মতো একটা আংটা লাগানো। আংটা থেকে ঝুলছে একটা শেকল, সামনে পড়ে বেশ

কিছু চিবিয়ে-গুঁড়ো-করা-হাড়। এইখানেই তাহলে থাকত জানোয়ারটা। জঞ্জালের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল জট পাকানো বাদামি লোম লেগে রয়েছে কঙ্কালে।

কুকুরের কঙ্কাল! বলল হোমস। আরে সর্বনাশ! এ যে দেখছি কোঁকড়া চুলো স্প্যানিয়েল। আহারে! পোষা কুত্তাকে ইহজীবনে আর দেখতে পাবেন না মর্টিমার বেচারা। যাক গে, এ-জায়গায় আর কোনো গুপ্ত রহস্য নেই–সব রহস্যের তলা পর্যন্ত দেখা হয়ে গিয়েছে। হাউন্ডকে উনি লুকিয়ে রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু হাঁকডাক লুকোতে পারেননি। তাই রাতবিরেতে অমন রক্ত-জল-করা ডাক শোনা যেত দিনের আলোতে শুনলেও গা ছমছম করে উঠত। জরুরি অবস্থায় মেরিপিটের আউট হাউসে রাখতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু তাতে ঝুঁকি প্রচণ্ড । তাই চরম মুহূর্তের দিনে মানে যেদিন ওঁর সর্বপ্রয়াসের অবসান ঘটতে চলেছে বলে মনে করতেন সেইদিনই কেবল আউট হাউসে হাউন্ড রাখার সাহস তার হত। টিনের কৌটোয় এই যে মলমটা, নিশ্চয় এই সেই আলোময় সংমিশ্রণ জন্তুটার সারাগায়ে মুখে জাবড়া করে লাগিয়ে দিতেন। মতলবটা মাথায় এসেছিল দুটো কারণে। প্রথম, ফ্যামিলি নরক-কুকুরের কিংবদন্তি; দ্বিতীয়, বৃদ্ধ স্যার চার্লসকে ভয় পাইয়ে মেরে ফেলার অভিলাষ, অন্ধকারের বুক চিরে জলার ওপর দিয়ে এ-রকম একটা প্রাণীকে লম্বা লম্বা লাফ মেরে যদি পেছনে তাড়া করে আসতে দেখা যায়, প্রত্যেকেই প্রাণের ভয়ে বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয়–আমরাও দৌড়োতাম, স্যার হেনরিও দৌড়েছিলেন, মহাশয়তান কয়েদি বেচারাও দৌড়েছিল। অত্যন্ত সেয়ানা পদ্ধতি। শিকারকে কেবল যে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলার সম্ভাবনাই থাকছে, তা নয়। জলার বুকে এমন একটা প্রাণীকে চাষারা যদি দেখেও ফেলে–দেখেওছে অনেকে খোঁজখবর নেওয়ার মতো বুকের পাটা কি থাকবে? ওয়াটসন, লন্ডনে তোমাকে একবার বলেছিলাম, আবার

বলছি এখানে হন্যে হয়ে যাঁর পেছনে ছুটে বেরিয়েছি এতদিন এবং যিনি ওই ওখানে কোথাও শুয়ে আছেন তার চাইতে বিপজ্জনক মানুষের পিছনে আজ পর্যন্ত আমাকে ধাওয়া করতে হয়নি বলে বাহু সঞ্চালন করে দেখাল নানাবর্ণের ছাপযুক্ত ধ্যাবড়া দূরবিস্তৃত পঙ্কভূমি–দূর হতে দূরে গিয়ে এক সময়ে যা মিশে গিয়েছে পাটবর্ণ তরঙ্গায়িত জলাভূমির সঙ্গে।

স্মৃতিমন্থন

নভেম্বরের শেষ। আর্দ্র; কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে জ্বলন্ত চুল্লির দু-পাশে বসে আমি আর হোমস। ডেভনশায়ের চূড়ান্ত শোচনীয় পরিণতির পর দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল হোমস। প্রথম কেসে ননপ্যারিউ ক্লাবের বিখ্যাত তাস কেলেঙ্কারির ব্যাপারে কর্নেল আপউডের বর্বরোচিত আচরণ ও ফঁস করে দেয়। দ্বিতীয় কেসে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়ে দেয় হতভাগিনী ম্যাডাম পেসিয়ারকে। সৎ-মেয়ে ক্যারারকে নাকি তিনি খুন করেছিলেন বলে রটনা হয়েছিল। সবাই জানেন, ছমাস পরে তরুণী সৎ-কন্যাকে জীবন্ত এবং বিবাহিতা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল নিউইয়র্কে। পর-পর কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কেসে সাফল্য লাভ করায় বন্ধুবর খোশমেজাজে রয়েছে দেখে বাস্কারভিল রহস্যের আলোচনার জন্যে একটু উসকে দিলাম। আমি তো চিনি ওঁকে। একটা কেসকে কখনোই আর একটা কেসের ঘাড়ে চাপতে দেবে না। যুক্তিনিষ্ঠ পরিষ্কার মনকে কখনোই অতীত কেসের স্মৃতি দিয়ে ঘুলিয়ে দেবে না বর্তমান কেস থেকে মনকে সরতে দেবে না। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি এতদিন। স্যার হেনরি আর ডক্টর মর্টিমার এখন লন্ডনে আছেন। স্যার হেনরির বিধ্বস্ত স্নায়ুকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে দীর্ঘ পর্যটনের সুপারিশ অনুযায়ী লন্ডনে এসেছেন দু-জনে এখান থেকে শুরু হবে বিশ্বপর্যটন। ওই দিনই বিকেলে দেখা করে গেছেন ওঁরা আমাদের সঙ্গে তাই এ-প্রসঙ্গে আলোচনা এখন খুবই স্বাভাবিক।

হোমস বলল, স্টেপলটন নামে যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। গোড়া থেকেই তিনি সব কিছুই অত্যন্ত সোজাসুজি সরাসরি করে গেছেন। কিন্তু প্রথম দিকে আমরা তার উদ্দেশ্য ধরতে পারিনি, ঘটনাগুলোও আংশিকভাবে জেনেছিলাম–ফলে আমাদের কাছে সব ব্যাপারটাই দারুণ জটিল মনে হয়েছে। মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে দু-বার কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল। পুরো কেসটা তারপর থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে এর মধ্যে আর কোনো গুপ্তরহস্য আছে বলে মনে হয় না আমার। এ-ব্যাপারে কিছু ঘটনা আমি টুকে রেখেছি আমার তদন্ত-তালিকার B শীর্ষক সূচীপত্রে।

ঘটনাগুলো পরপর কীরকম ঘটেছিল মন থেকে যদি একটু বল তো ভালো হয়।

নিশ্চয় বলব, তবে সব ঘটনা মনে রাখতে পেরেছি, এমন গ্যারান্টি দিতে পারব না। অত্যন্ত নিবিড় মনঃসংযোগের ফলে অতীত ঘটনা অদ্ভুতভাবে মুছে যায় মন থেকে। নখদর্পণে সব ঘটনা রেখে যে-ব্যারিস্টার নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করে যেতে পারেন, দু-এক হপ্তা কোর্টে যাওয়ার পর দেখা যায় বেমালুম সেসব ভুলে গিয়েছেন। ঠিক সেইভাবে আমার মাথার মধ্যেও একটা কেস আর একটা কেসকে হটিয়ে দেয়। বাস্কারভিল রহস্যের স্মৃতিও ফিকে হয়ে এসেছে কুমারী ক্যারারের আবির্ভাবে। আগামীকাল হয়তো ছোটোখাটো নতুন সমস্যার আবির্ভাবে মানসপট থেকে হটে যেতে বাধ্য হবে সুন্দরী ফরাসি মহিলা এবং কুখ্যাত আপউড। হাউন্ড কেসের ব্যাপারে যা-যা ঘটেছিল বলবার চেষ্টা করব বটে, কিন্তু যদি দেখো কিছু ভুলে গেছি, ধরিয়ে দিয়ো।

আমার তদন্তের ফলে প্রশ্নাতীতভাবে একটা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল–পারিবারিক প্রতিকৃতি কখনো মিথ্যে বলতে পারে না। লোকটা সত্যিই নিজেই একজন বাস্কারভিল। স্যার চার্লসের ছোটো ভাই রোজার বাস্কারভিল কুখ্যাতি মাথায় নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়েছিলেন। শোনা যায় অবিবাহিত অবস্থায় সেখানে তিনি মারা যান। আসলে তিনি বিয়ে করেছিলেন, একটি ছেলেও হয়েছিল। এই লোকটি সেই ছেলে–আসল নামটা বাপের নামে। কোস্টা রিকা-র ডাকসাইটে সুন্দরী বেরিল গারসিয়াকে ইনি বিয়ে করেন এবং বেশ কিছু ধন-অর্থ আত্মসাৎ করে নাম পালটে ভ্যানডেলর হন। তারপর পালিয়ে যান ইংলন্ডে। ইয়র্কশায়ারের পূর্বে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ ধরনের এই ব্যবসা পত্তনের একটা কারণ ছিল। দেশে ফেরার পথে একজন ক্ষয়রোগী শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়। এর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে স্কুল ব্যাবসা দাঁড় করিয়ে ফেলেন। ফ্রেজার, মানে, ক্ষয়রোগী সেই শিক্ষক মারা যাওয়ার পর আস্তে আস্তে সুনাম হারিয়ে দুর্নামের পাঁকে ডুবে কুখ্যাতি অর্জন করে বসল স্কুল। ভ্যানডেলর দম্পতি দেখল আবার নাম পালটানোর দরকার হয়েছে। কাজেই ভ্যানডেলর হয়ে গেল স্টেপলটন। স্কুলের সম্পদ পকেটস্থ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এলেন দক্ষিণ ইংলন্ডে সঙ্গে এল কীটবিদ্যার শখ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ-বিদ্যার তিনি একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। ইয়র্কশায়ারে থাকার সময় বিশেষ একটা মথ পোকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার জন্যে পাকাপোক্তভাবে ভ্যানডেলর নামকরণ হয়েছে পোকাটার।

তার জীবনের যে-অংশে আমাদের তীব্র কৌতূহল, এবার সেই জীবন নিয়ে কথা বলা যাক। তিনি যে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, মূল্যবান একটা জমিদারির মালিক হওয়ার অন্তরায় মাত্র দু-টি জীবন।

ডেভনশায়ারে গিয়ে যখন উঠলেন, তখন নিশ্চয় খুবই আবছা অবস্থায় ছিল পরিকল্পনাটা। তবে গোড়া থেকেই যে নষ্টামির প্ল্যান করেছেন, তার প্রমাণ স্ত্রীকে কাজে লাগানোর মতলবটা মাথায় ঘুর ঘুর করেছে তখন থেকেই। কিন্তু চক্রান্ত কীভাবে সাজাবেন, তখনও তা স্পষ্ট করে ভেবে উঠতে পারেননি। সব শেষে জমিদারিটা যেন হাতে আসে—এই তঁার চরম লক্ষ্য। এবং এ-লক্ষ্যে পৌঁছতে যেকোনো ঝুঁকি নিতে বা যেকোনো ব্যক্তিকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে তিনি পেছপা ছিলেন না। এজন্যে প্রথমেই দুটি কাজ করতে হল তাঁকে। একটি হল পূর্বপুরুষদের ভিটের যথাসম্ভব কাছে আস্তানা গেড়ে বসা। দ্বিতীয়টি স্যার চার্লস বাস্কারভিল এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি।

ফ্যামিলি হাউন্ডের গল্প ব্যারনেট নিজেই শোনালেন স্টেপলটনকে এবং নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করলেন। স্টেপলটন—এখনও এই নামেই ডাকব এঁকে—জানতেন বৃদ্ধের হার্টের অবস্থা সঙিন। আচমকা মানসিক ধাক্কায় মারাই যাবেন। এ-খবরটা জোগাড় করেছিলেন ডক্টর মর্টিমারের কাছ থেকে। এটাও শুনেছিলেন, যে স্যার চার্লস কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং ভয়ানক কিংবদন্তিটা গভীর দাগ কেটেছে তাঁর মনে। উর্বর মস্তিষ্কে সঙ্গেসঙ্গে গজিয়ে উঠল হত্যার পরিকল্পনা। এমনই অভিনব পরিকল্পনা যে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—ব্যারনেট মরবেন, কিন্তু আসল খুনিকে কেউ ভুলেও সন্দেহ করতে পারবে না।

পরিকল্পনা স্থির হয়ে যাওয়ার পর অত্যন্ত সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলেন স্টেপলটন। সাধারণ চক্রী একটা হিংস্র হাউন্ড লেলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হত। ইনি কিন্তু কৃত্রিম পন্থায় জানোয়ারটাকে পৈশাচিক করে তুলেছেন এবং প্রতিভার চমক দেখিয়েছেন। লন্ডনের ফুলহ্যাম রোডে রস অ্যান্ড ম্যাঙ্গল-এর দোকান থেকে কুকুরটাকে কিনে নিয়ে

যান উনি। এর চাইতে হিংস্র আর শক্তিমান কুকুর ওদের কাছে আর ছিল না। নর্থ ডেভন লাইনে উনি কুকুর নিয়ে যান এবং বাদার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে বাড়ি পৌঁছেন–ফলে কোনোরকম উত্তেজিত মন্তব্য শোনা যায়নি। পোকামাকড়ের খোঁজে বেরিয়ে গ্রিমপেন পঙ্কভূমির মাঝ দিয়ে যাওয়ার পথ উনি আগেই বার করে ফিলেছিলেন–প্রাণীটাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গার অভাবও তাই ঘটল না। নিরালা দুর্গম সেই দ্বীপে কুকুরশালা বানিয়ে ওত পেতে রইলেন সুযোগের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু বেশ সময় লাগল। কোনো প্রলোভনেই রাত্রে বাড়ির বাইরে বার করা গেল না বৃদ্ধকে। বেশ কয়েকবার হাউন্ড নিয়ে চারপাশে টহল দিলেন স্টেপলটন, কিন্তু কাজ হল না।এহেন নিফল অন্বেষণের সময়ে তঁাকে, তার চাইতে বরং বলা যাক তার স্যাঙাতটাকে, কয়েকজন চাষা দেখে ফেলে। দানব কুকুরের কিংবদন্তি যে তাহলে নিছক অলীক নয়, এরপর থেকেই তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। উনি আশা করেছিলেন, স্ত্রীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্যার চার্লসকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে এই একটি ব্যাপারে বেঁকে বসলেন গৃহিণী–নিজের মতে শক্ত রইলেন। ভাবাবেগে জড়িয়ে একজন বৃদ্ধকে শত্রুর জালে টেনে আনতে তিনি নারাজ। ভয় দেখিয়ে এমনকী চড়চাপড় ঘুসি মেরেও টলানো গেল না ভদ্রমহিলাকে। এ-ব্যাপারে কোনো সাহায্যই তিনি করবেন না। সাময়িকভাবে অচলাবস্থায় পড়লেন স্টেপলটন।

সুরাহা পাওয়া গেল স্যার চার্লসেরই দেওয়া সুযোগের মধ্যে থেকে। হতভাগিনী মিসেস লরা লায়ন্সের ক্ষেত্রে স্টেপলটনের হাত দিয়েই দান-ধ্যান করতেন স্যার চার্লস। বৃদ্ধের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব জমিয়ে নিয়েছিলেন স্টেপলটন। মিসেস লায়ন্সের কাছে নিজেকে

অবিবাহিত হিসেবে হাজির করেছিলেন। কথা দিয়েছিলেন যদি স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেন, তাহলে তাকে বিয়ে করবেন। মিসেস লায়ন্সকে এইভাবেই একেবারে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেন স্টেপলটন। চক্রান্ত হঠাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোল যখন শুনলেন ডক্টর মর্টিমারের এহেন পরামর্শ অনুযায়ী বাস্কারভিল হল ছেড়ে যাচ্ছেন স্যার চার্লস। ডক্টর মর্টিমারের এহেন পরামর্শে সায় দেওয়ার ভান করে গেলেন স্টেপলটন। আর দেরি করা যায় না, শিকার নাগালের বাইরে চলে যেতে বসেছে–যা করবার এখুনি করতে হবে। তাই চাপ দিয়ে মিসেস লায়ন্সকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখালেন স্যার চার্লসকে লন্ডন যাওয়ার আগের রাতে দেখা করার প্রার্থনা জানালেন কাকুতি-মিনতি করে। তারপর অবশ্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ভদ্রমহিলার যাওয়া বন্ধ করলেন। বলাবাহুল্য যুক্তিটা সংগত মনে হলেও সত্য নয়। যাই হোক, এতদিন যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এবার তা পাওয়া গেল।

ঠিক সময়ের আগেই গাড়ি নিয়ে চলে এলেন কুমবে ট্রেসি থেকে, হাউন্ডের ডেরায় পৌছোলেন, গায়ে সেই নারকীয় রং লাগালেন। হাঁটিয়ে নিয়ে এসে ফটকের অদূরে দাঁড়ালেন। এই গেটেই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বৃদ্ধ স্যার চার্লসের। প্রভুর উসকানি পেয়ে প্রচণ্ড খেপে গিয়ে এক লাফে খাটো গেট পেরিয়ে এল কুকুরটা এবং তাড়া করল ভাগ্যহীন ব্যারনেটকে– উনি তখন আর্ত চিৎকার করতে করতে দৌড়োচ্ছেন ইউ-বীথি বরাবর। ওইরকম একটা বিষাদাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথে লকলকে আগুন ঘেরা চোয়াল আর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে অতিকায় কালো একটা প্রাণী যদি লম্বা লম্বা লাফ মেরে পেছনে তেড়ে আসে তাহলে ভয় পাবারই কথা। ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ নেই। হৃদরোগ আর আতঙ্কের দরুন বেশিদূর যেতে হল না স্যার চার্লসকে, ইউ-বীথির প্রান্তে প্রাণ হারিয়ে

লুটিয়ে পড়লেন। উনি দৌড়েছিলেন রাস্তা বরাবর, হাউন্ড দৌড়েছিল ঘাসের পটি বরাবর। তাই স্যার চার্লসের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোনো পায়ের ছাপ দেখা যায়নি। শিকারকে চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখে সম্ভবত ওকে দেখার জন্যে কাছে গিয়েছিল প্রাণীটা, কিন্তু মারা গিয়েছেন দেখে ফের ফিরে যায়। এই সময়ে মাটিতে তার থাবার ছাপ পড়ে–ডক্টর মর্টিমার স্বচক্ষে তা দেখেন। স্টেপলটন ডেকে নিলেন হাউন্ডকে, নিয়ে গেলেন গ্রিমপেন পঙ্কভূমির আস্তানায়। আশ্চর্য এই রহস্যের কিনারা করতে না-পেরে মাথা ঘুরে গেল কর্তাদের, ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল স্থানীয় বাসিন্দাদের। শেষ পর্যন্ত কেসটা এসে পৌছোল আমাদের তদন্তের আওতায়।

এই হল গিয়ে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুর বিবরণ। শয়তানি সেয়ানাপনাটা নিশ্চয় লক্ষ করেছ। আসল খুনির বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো সত্যিই অসম্ভব। দোসর ওঁর একজনই–যে কখনোই ওঁকে ধরিয়ে দেবে না। পদ্ধতিটা কিম্ভুতকিমাকার আর অকল্পনীয় বলেই বেশি কার্যকর। এ-কেসে জড়িত দু-জন মহিলাই তীব্র সন্দেহ করে এসেছেন স্টেপলটনকে। মিসেস স্টেপলটনই জানতেন বৃদ্ধকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে স্বামীরত্নহাউন্ডের অস্তিত্বও তিনি জানতেন। মিসেস লায়ন্স এসব কিছুই জানতেন না বটে, কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হওয়ার পরে ঠিক ওই সময়ে স্যার চার্লসের অস্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক করে অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর স্টেপলটন ছাড়া আর কেউ জানতেন না। কিন্তু দুই মহিলাকে একেবারে কবজা করে রেখেছিলেন স্টেপলটন দু-জনের কারোর দিক থেকেই আশঙ্কার কারণ ছিল না। ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এখন বাকি আরও কঠিন পর্বটুকু।।

এমনও হতে পারে কানাডায় একজন উত্তরাধিকারী রয়ে গেছেন, স্টেপলটন তা জানতেন না।–জানলেও খবরটা অচিরেই তিনি জেনে গেলেন ডক্টর মর্টিমারের মুখে—স্যার হেনরি বাস্কারভিল কবে কখন আসছেন, সে-খবরও সংগ্রহ করলেন ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে। স্টেপলটনের প্রথম মতলব ছিল কানাডা-প্রত্যাগত এই তরুণ আগন্তুককে লন্ডনেই খতম করে দেওয়া–ডেভনশায়ারে পা দেওয়ার আগেই। স্যার চার্লসকে ফাঁদে ফেলতে চায়নি বলে স্ত্রীকে আর বিশ্বাস করতেন না। বেশিদিন চোখের আড়ালেও রাখতে ভরসা পেতেন না–পাছে কবজির বাইরে চলে যায় এই কারণে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন লন্ডনে। খবর নিয়ে জেনেছি ওঁরা উঠেছিলেন ক্র্যাভেন স্ট্রিটের মেক্সবরো প্রাইভেট হোটেলে। আমার চর কিন্তু এ-হোটেলেও খোঁজ নিয়েছিল। হোটেলের একটা ঘরে স্ত্রীকে আটকে রেখে নিজে গালে দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে ডক্টর মর্টিমারকে অনুসরণ করে বেকার স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়েছিলেন, পরে স্টেশনে গিয়েছিলেন, তারপর নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলেন। স্বামীর বদমতলবের কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন স্ত্রী। কিন্তু যমের মতো ভয় পেতেন তাকে ভয়টা পাশবিক উৎপীড়নের। সেই ভয়েই বিপদাপন্ন মানুষটিকে চিঠি লিখেও হুঁশিয়ার করতে সাহসে কুলোয়নি। চিঠি যদি স্টেপলটনের হাতে পড়ে, তাহলে ওঁর নিজের প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত আমরা জানি কীভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে নিয়ে পত্ররচনা করেছিলেন এবং হস্তাক্ষর গোপন করে ঠিকানাটা লিখেছিলেন! চিঠি পৌঁছোয় ব্যারনেটের হাতে এবং আসন্ন বিপদের প্রথম সতর্কবাণী তিনি পান।

স্টেপলটন দেখলেন, স্যার হেনরির ব্যবহার করা ধড়াচূড়ার কোনো একটা বস্তু না-জোগাড় করলেই নয়। শেষ পর্যন্ত যদি কুকুরটাকেই ব্যবহার করতে হয়, গন্ধ শুকিয়ে

পেছনে লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে চাই এমন একটা জিনিস। ক্ষিপ্রতা আর স্পর্ধা ওঁর চরিত্রে দুটো বড়ো বৈশিষ্ট্য। ফলে কাজ আরম্ভ করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। হোটেলের জুতো পরিষ্কার করে যে-ছোকরা অথবা বিছানা পেতে দেয় যে ঝি-টি–এদের কাউকে মোটা ঘুস দিয়ে নিশ্চয় কাজ উদ্ধার করেন স্টেপলটন। কপালক্রমে প্রথমে যে-বুটটা পেলেন, তা আনকোরা নতুন কাজে লাগবে না। তাই নতুন বুট ফেরত দিয়ে তার বদলে জোগাড় করলেন পুরোনো বুট। ঘটনাটা চোখ খুলে দিল আমার। স্পষ্ট বুঝলাম, আসল হাউন্ডের সঙ্গেই লড়তে হবে আমাদের। নতুন বুটের প্রতি এত ঔদাসীন্য এবং পুরোনো বুটের জন্যে উদবেগের এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয় না। ঘটনা যত বিচিত্র আর কিম্ভুতকিমাকার হবে, ততই জানবে তা সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার। যে-বিষয়টা সবচেয়ে জট পাকাচ্ছে বলে মনে হবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা ঠিকমতো বিচার করলে দেখবে জট-ছাড়ানোর পক্ষে সেটাই সবচেয়ে মোক্ষম বিষয়।

পরের দিন সকালে বন্ধুরা এলেন আমাদের এখানে পেছন পেছন ছায়ার মতো কিন্তু গাড়ি নিয়ে লেগে রয়েছেন স্টেপলটন। আমাদের এই বাড়ির হদিশ তিনি জানেন, আমাকে দেখলেই তিনি চিনতে পারেন এবং তার নিজের কাজকর্মও সুবিধের নয়–এই তিনটে বিষয় থেকে অনায়াসেই ধরে নিতে পারি বাস্কারভিল হলের অপরাধটাই তাঁর অপরাধ জীবনের একমাত্র কুকীতি নয়। ইঙ্গিতপূর্ণ কতকগুলি ঘটনা বলছি শোনো। গত তিন বছরে পশ্চিম ইংলন্ডে চারটে বড়ো রকমের চুরির কোনো কিনারা আজও হয়নি। গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে চোর। চোর ধরা পড়েনি। শেষ চুরিটা ঘটে মে মাসে ফোকস্টোন কোর্টে। ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর আরও একটা কারণে। ছোকরা চাকর হঠাৎ ঢুকে পড়ে চমকে দিয়েছিল চোরকে। চোর একবার এসেছিল, মুখে মুখোশ ছিল।

খুব ঠান্ডা মাথায় ছোকরাকে গুলি করেছিল চোর। আমার বিশ্বাস সঞ্চিত ধন যখনই ফুরিয়ে এসেছে, এইভাবেই তা নতুন করে পূরণ করে নিয়েছেন স্টেপলটন। বহু বছর ধরেই উনি বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া।

আমাদের হাত ফসকে যেদিন পালালেন, সেদিনই ওঁর আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধির নমুনা আমরা দেখেছি। ধৃষ্টতা যে কতখানি, সে-প্রমাণও পেয়েছি গাড়োয়ানের মারফত আমারই নাম আমার কাছে পাঠানোর ব্যাপারে। সেই মুহূর্ত থেকেই উনি বুঝেছিলেন, লন্ডনে কেসটা গ্রহণ করেছি আমি। কাজেই এখানে আর সুবিধে হবে না তাই ডার্টমুরে ফিরে গিয়ে ওত পেতে রইলেন ব্যারনেটের জন্যে।

এক মিনিট! বললাম আমি। পর পর বললে ঠিকই, একটা বিষয় কিন্তু খোলসা করলে না। মনিব যখন লন্ডনে, হাউন্ডকে তখন কে দেখত?

এ-ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছি আমি। সত্যিই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্টেপলটনের যে একজন দোসর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরো বিশ্বাস করেনি তাকে। ষড়যন্ত্রে আদ্যোপান্ত বললে পাছে তার খপ্পরে পড়তে হয়, তাই সব কথা বলেননি। মেরিপিট হাউসে একজন বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। নাম তার অ্যান্টনি। লোকটার সঙ্গে স্টেপলটনদের সম্পর্ক অনেক দিনের – স্কুলজীবন পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে জেনেছি অ্যান্টনি তখনও ওঁদের সঙ্গে ছিল। তার মানে, মনিব আর মনিবানি যে আসল স্বামী স্ত্রী অ্যান্টনি তা জানত। লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে–দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। নামটা কিন্তু লক্ষ করার মত। অ্যান্টনি নাম ইংলন্ডে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু স্পেন বা স্পেনীয় অ্যামেরিকান অঞ্চলে

অ্যানটোনিও নামটা আকছার শোনা যায়। মিসেস স্টেপলটনের মতো সে-ও দিব্যি ইংরেজি বলত–কিন্তু অদ্ভুত রকমের আধো-আধো উচ্চারণে। গ্রিমপেন পঙ্কভূমির মাঝখান দিয়ে যে-রাস্তায় চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন স্টেপলটন, নিজের চোখে দেখেছি, সেই রাস্তা দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে এই বুড়ো? মনিবের অনুপস্থিতিতে খুব সম্ভব সে-ই হাউন্ডের তত্ত্বাবধান করেছে। যদিও জানত না কী কাজে লাগানো হয় জানোয়ারটাকে।

স্টেপলটন ডেভনশায়ার ফিরে গেল, স্যার হেনরিকে নিয়ে তুমি পৌঁছোলে তার পরেই। সেই সময়ে আমি কী করছিলাম এবার বলা যাক। তোমার মনে থাকতে পারে, ছাপা শব্দ সাঁটা চিঠির কাগজের জলছাপ খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে কাগজখানা আমি চোখের ইঞ্চিকয়েক দূরে এনেছিলাম। সেই সময়ে নাকে একটা হালকা সুগন্ধ ভেসে আসে। গন্ধটা জুইয়ের। পঁচাত্তর রকম সেন্ট আছে বাজারে। প্রত্যেকটা গন্ধ আলাদাভাবে চেনার ক্ষমতা থাকা চাই অপরাধ-বিশেষজ্ঞের। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গন্ধ শুকেই সেন্টের নাম চট করে বলে দেওয়ার ওপর বহু জটিল কেসের আশু সমাধান নির্ভর করেছে। এই ক্ষেত্রেও সেন্টের গন্ধ শুকেই বুঝতে পারলাম, কেসটায় একজন মহিলাও জড়িয়ে আছেন। তখন থেকেই আমার চিন্তা ধেয়ে গেল স্টেপলটনদের দিকে। হাউন্ড সম্বন্ধে এইভাবেই নিশ্চিন্ত হলাম এবং পশ্চিম ইংলন্ডে যাওয়ার আগেই অনুমান করে নিলাম অপরাধী আসলে কে!

এবার শুরু হল আমার খেলা–স্টেপলটনকে নজরবন্দি রাখার খেলা। বুঝতেই পারছ, তোমার সঙ্গে থাকলে এ-কাজ আমি করতে পারতাম না। বেশি সাবধান হয়ে যেতেন স্টেপলটন। তাই সবাইকে ঠকালাম, তোমাকেও বাদ দিলাম না। যখন আমার লন্ডনে

থাকার কথা, তখন গোপনে চলে এলাম অকুস্থলে। তুমি যতটা ভেবেছ, ততটা ধকল সইতে হয়নি আমায়। তদন্তে নেমে এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে তদন্ত করা যায় না। বেশির ভাগ সময় কুমবে ট্রেসিতে থাকতাম। কুকীর্তি যেখানে অনুষ্ঠিত হবে, সেই জায়গাটা দেখবার দরকার হলে কুটিরে চলে আসতাম। কার্টরাইট এসেছিল আমার সঙ্গে। গাঁইয়া ছোকরার ছদ্মবেশে অনেক সাহায্য করেছিল। খাবার আর পরিষ্কার পোশাকের জন্যে ওর ওপর নির্ভর করতে হত আমায়। আমি যখন স্টেপলটনকে নজরে রাখতাম, কার্টরাইট তখন প্রায়ই তোমাকে নজরে রাখত। এইভাবেই হাতের মুঠোয় রেখেছিলাম সবক-টা সুতো।

আগেই বলেছি, তোমার সব রিপোর্টই খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেত আমার কাছে। বেকার স্ট্রিট থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেওয়া হত কুমবে ট্রেসিতে। খুব কাজে লেগেছিল রিপোর্টগুলো–বিশেষ করে পাঁচ কথার মধ্যে স্টেপলটনের খাঁটি আত্মজীবনী খানিকটা লিখে ফেলে ভালো করেছিলে। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে শনাক্ত করে ফেললাম সহজেই এবং বুঝলাম কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে কেস। পলাতক কয়েদি আর ব্যারিমুর দম্পতির সঙ্গে তার আত্মীয়তার ব্যাপারে বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল কেসটা। খুব চমৎকারভাবে এ-জট তুমি ছাড়িয়েছিলে, যদিও একই সিদ্ধান্তে তোমার আগেই পৌছেছিলাম স্বচক্ষে সব দেখার পর।।

জলার কুটিরে আমাকে যখন ধরে ফেললে, তখন কেসটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। কিন্তু জুরিদের সামনে নিয়ে হাজির হওয়ার মতো নিটোল অবস্থায় তখনও কেস পৌছোয়নি। সেই রাত্রে স্যার হেনরিকে মারতে গিয়ে ভুল করে কয়েদি বেচারার মৃত্যু

ঘটানোর পরেও খুনের দায়ে স্টেপলটনকে ধরা সম্ভব হল না–প্রমাণ কই? হাতেনাতে ওঁকে ধরা ছাড়া আর পথ দেখলাম না। স্যার হেনরিকে একলা ছেড়ে দিয়ে টোপ ফেলতে হল। অরক্ষিত মনে করানো হল বটে, কিন্তু আমরা রইলাম আড়ালে। হাতেনাতে ধরলাম ঠিকই, কিন্তু মূল্য দিতে হল অনেক। সাংঘাতিক মানসিক আঘাত পেলেন আমাদের মক্কেল। নিপাত গেলেন স্টেপলটন। এ-রকম একটু ঝুঁকির মধ্যে স্যার হেনরিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে স্বীকার করছি গঞ্জনা দেওয়া উচিত আমারই পরিচালন ব্যবস্থাকে; কিন্তু জানোয়ারটা যে ওইরকম আতঙ্ক-ধরানো দেহমন-পঙ্গু-করা প্রেতমূর্তির আকারে বেরিয়ে আসবে–এটা কিন্তু দিব্য চোখে দেখিনি। তা ছাড়া কুয়াশার দরুন আচমকা বেরিয়ে আসার ফলে যে এত কম সময় পাব–তাও আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারিনি। যে-মূল্যের বিনিময়ে সফল হয়েছি, বিশেষজ্ঞ এবং ডক্টর মর্টিমার দু-জনেই বলেছেন তা সাময়িক। দীর্ঘ পর্যটনের ফলে স্যার হেনরি যে কেবল বিধ্বস্ত স্নায়ুকেই চাঙ্গা করে ফেলবেন তা নয়–আহত অনুভূতির স্মৃতি থেকেও মুক্তি পাবেন। ভদ্রমহিলাকে উনি আন্তরিকভাবে, গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কদর্য এই কেসের ব্যাপারটা তাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে, তা হল এই প্রতারণা। ভদ্রমহিলার এই প্রবঞ্চনা বড়ো বেশি আঘাত হেনেছে তাঁর বুকে।

আগাগোড়া কী ভূমিকায় অভিনয় করে গিয়েছেন এই ভদ্রমহিলা, এবার তা দেখা যাক। এঁর ওপর স্টেপলটনের প্রভাব ছিল এবং তা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ দেখি না। প্রভাবটা ভালোবাসার দরুন হতে পারে, অথবা স্বামীকে ভয় পাওয়ার দরুনও হতে পারে। অথবা দুইয়ের যোগফলের জন্যেও হতে পারে। দু-জনের আবেগের তীব্রতা যে একরকম ছিল না, তা তো ঠিক। স্বামীর হুকুমেই তাঁকে সহোদরার ভূমিকায় অভিনয়

করে যেতে হয়েছে। প্রভাবটা কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে ঠেকে গেল যখন স্টেপলটন দেখলেন খুনের ব্যাপারে সরাসরি হাত মেলাতে স্ত্রী নারাজ। স্বামীকে না-ফাঁসিয়ে সাধ্যমতো স্যার হেনরিকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা এবং বার বার সে-চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে ব্যারনেট প্রেমনিবেদন করেছেন দেখে ঈর্ষায় জ্বলে গিয়ে ফেটে পড়েছিলেন স্টেপলটন স্বয়ং অথচ জিনিসটা ঘটছিল তারই পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু প্রচণ্ড আবেগ সামলাতে না-পেরে ফেটে পড়ার ফলে ছদ্ম সংযমের আড়ালে সুকৌশলে লুকোনো তার ভীষণ প্রকৃতি নগ্ন হয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দিলেন স্টেপলটন যাতে ঘনঘন মেরিপিট হাউসে আসেন স্যার হেনরি। তাহলে দু-দিন আগে হোক কি পরে তোক ইচ্ছা পূরণের সুযোগ ঠিক পেয়ে যাবেন। কিন্তু মহাসংকটের সেই বিশেষ দিনটিতেই আচমকা রুখে দাঁড়ালেন স্ত্রী। কয়েদির মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, সে-খবর উনি পেয়েছিলেন সেইসঙ্গে জেনেছিলেন, স্যার হেনরি যে-রাত্রে ডিনার খেতে আসছেন, সেই রাত্রে হাউন্ডটাকে এনে রাখা হয়েছে আউট হাউসে। খুনের মতলবের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন স্বামীকে। ফলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল দুজনের মধ্যে এবং সেই প্রথম স্ত্রীকে স্টেপলটন জানালেন প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। মুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ ঘৃণায় পর্যবসিত হল অন্তরের অনুরাগ। স্টেপলটন দেখলেন স্ত্রী-ই এবার বেইমানি করবেন। তাই বেঁধে রাখলেন বউকে যাতে স্যার হেনরি এলে সাবধান করতে না-পারেন। মনে মনে এই আশাও নিশ্চয় ছিল যে ব্যারনেটের মৃত্যুর জন্যে পারিবারিক অভিশাপকেই দায়ী করবেন তল্লাটের প্রতিটি মানুষ করতও তাই–তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভবিতব্যকে মেনে নিতে বাধ্য করতেন স্ত্রীকে–মুখে চাবি দিয়ে থাকতেন ভদ্রমহিলা। আমার মনে হয় এই একটি ব্যাপারে হিসেব ভুল করে ফেলেছেন স্টেপলটন। আমরা যদি নাও পৌঁছতাম, ভদ্রলোকের জাহান্নামে যাওয়া আটকানো যেত

না। স্পেনীয় রক্ত বইছে যার ধমনীতে এ-ধরনের আচার এত হালকাভাবে তিনি নিতে পারেন না। আমার লেখা টীকাটিপ্পনি না-দেখে কেসটা সম্বন্ধে এর বেশি কিছু মন থেকে আর বলতে পারব না। তা ছাড়া কিছু বাদ দিয়েছি বলেও তো মনে হচ্ছে না।

ভূতুড়ে হাউন্ড লেলিয়ে বৃদ্ধ পিতৃব্যকে ভয় দেখিয়ে মেরেছেন বলে স্যার হেনরির ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, এমনটা নিশ্চয় আশা করেননি?

জানোয়ারটা একে হিংস্র, তার ওপর আধপেটা খাইয়ে রাখা হয়েছিল। ওই চেহারা দেখে ভয়ের চোটে মৃত্যু না-হলেও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তো কেড়ে নেওয়া যায়।

তা ঠিক। আর একটা খটমট ব্যাপার। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যদিও না-হতেন স্টেপলটন, অন্য নামে গোপনে সম্পত্তির এত কাছে বসবাসের কী কারণ দর্শাতেন উনি? সন্দেহ বা তদন্তের সূচনা না-ঘটিয়ে সম্পত্তি দাবি করতেন কী করে?

সমস্যাটা সাংঘাতিক। সমাধানটা জিজ্ঞেস করে খুব বেশি আশা করছ আমার কাছে। অতীত আর বর্তমানই কেবল আসে আমার তদন্তের আওতায়। কিন্তু ভবিষ্যতে কে কী করবে, তার জবাব দেওয়া বড়ো শক্ত। সমস্যাটা নিয়ে স্বামীকে অনেকবার আলোচনা করতে শুনেছেন মিসেস স্টেপলটন। তিনটে সম্ভাব্য পথ ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সম্পত্তি দাবি করতে পারতেন, সেখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে শনাক্ত করে ইংলন্ডে না-এসেই সম্পত্তি হাতিয়ে নিতেন। অথবা, লন্ডনে যেটুকু সময় থাকা দরকার, সেটুকু সময়ের জন্যে নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। অথবা, কোনো দোসরকে

কাগজপত্র প্রমাণের সাহায্যে নিজের উত্তরাধিকারী দাঁড় করিয়ে সম্পত্তির আয় থেকে নিজে খানিকটা অংশ রাখতেন। ওঁকে যদ্দূর চিনেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপায় একটা ঠিকই বার করতেন। যাই হোক, ভায়া ওয়াটসন, বেশ কয়েক সপ্তাহ দারুণ কাজের ধকল গিয়েছে। মনোরম খাতে চিন্তাকে ঢেলে দেওয়ার জন্য একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা উচিত বলে আমি মনে করি। লা হুগুনট-এ একটা বক্স বুক করেছি। ডা. রেসজেকস কখনো শুনেছ? আধঘণ্টার মধ্যে তাহলে তৈরি হয়ে নিতে পারবে? যাওয়ার পথে মার্সিনিতে ডিনার খেয়ে নেবখন!

———

যে-কিংবদন্তি অবলম্বনে হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস লিখেছিলেন কন্যান ডয়াল, তা যে নিছক কিংবদন্তি নয়—লোমহর্ষক সত্য— নীচের অনুরূপ কাহিনিটা তার প্রমাণ।

ডার্টমুরের অশরীরী হাউন্ড

ডার্টমুরের গা ছমছমে পরিবেশে অশরীরী হাউন্ডের পাল্লায় পড়েছিলেন এক ভদ্রমহিলা। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন কোনোমতে। গল্পটা তার জবানিতেই শোনা যাক:

ডার্টমুরের ঠিক মাঝে পচা পাক আর কাদাভরতি বিরাট অঞ্চলে কখনো কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। চরাচর নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখিকে উড়তে দেখা যায় মাথার

ওপর। পায়ের তলায় ছলছল করে বয়ে চলে কালো জলসোত পচা আগাছা আর পাঁকের মধ্যে এঁকেবেঁকে প্রায় নিঃশব্দে বয়ে চলে জলের ধারা। মাইলের পর মাইল হেঁটে গেলেও বাতাসের সোঁ সোঁ চাপা গজরানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে অবশ্য কালো জলে পা ডুবে গেলে ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজে চমকে উঠতে হয় নিজেকেই। রোদ্দুর থাকলে ভালোই লাগে এই শব্দহীনতা শব্দময় জগৎ থেকে যেন একটু নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এখানে এলে। মাথার ওপর দিয়ে হু-হু করে ভেসে যায় ধূসর মেঘ কখনো গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে দেয় দু-হাত দূরের দৃশ্যও। ঠিক সেই মুহূর্তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বুকের রক্ত ছলকে ওঠে এবং ঠিক তখনই শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়ে বায়ুবেগে শিকারের পেছনে ধাওয়া করে অশরীরী হাউন্ড। এ-অঞ্চলে এদের নাম উইজ হাউন্ড (Wish Hound)। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ওয়াইল্ড হান্ট হাউন্ড অথবা গ্যাব্রিয়েলের হাউন্ডের মতোই উইজ হাউন্ড একটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

উইজ হাউন্ডের জিভ নেই বলে আওয়াজ করতে পারে না। মাথাও নেই। বিরাট কালো ঘাড়ের কাছে দেখা যায় কেবল নীলচে আগুনের লকলকে শিখা! পচা আগাছা আর কাদার ওপর ভারী ভারী পা পড়লেও কোনো শব্দ শোনা যায় না।

উইজ হাউন্ড স্রেফ একটা গল্প—এই বিশ্বাস নিয়েই চ্যাগফোর্ড থেকে হেঁটে যাচ্ছিলাম জলার ঠিক মাঝখানে ক্র্যানমিয়ার পুলের দিকে। সুন্দর দিন। চ্যাগফোর্ড মার্কেট থেকে কিছু প্যাসট্রি কিনেছি খিদে পেলে খাব বলে। এ ছাড়া সঙ্গে আছে একটা ম্যাপ আর একটা কম্পাস। সরু গলি দিয়ে গিডলি এলাম। সেখান থেকে বাদায় এসে পড়লাম। পাথুরে চত্বর দিয়ে হাঁটছি। বেশ লাগছে হাঁটতে।।

প্রথমে গেলাম থির্লস্টোন পাহাড়ের দিকে। কালো, কর্কশ, এবড়োখেবড়ো চোখাচোখা পাথরে পাহাড়। এ-অঞ্চলে এসব পাহাড়কে টর বলা হয়। ডার্টমুর ছাড়া টর কোথাও দেখা যায় না।

থির্লস্টোন টর কিন্তু দেখবার মতো পাহাড়। বিরাট বিরাট খিলেনগুলোর মধ্যে দিয়ে যেন হু-হু করে বয়ে গেছে আস্ত একটা সমুদ্র। ক্ষয়ে চূর্ণ হয়ে গেছে, ছুরির মতো ধারালো হয়ে গেছে কিনারাগুলো।

থির্লস্টোন চূড়ায় উঠে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। দেখলাম, পূর্বদিকে মাইলের পর মাইল কেবল জঙ্গল আর তেপান্তরের মাঠ দৃষ্টির শেষ সীমায় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে হ্যালডন হিলের মাথার ওপরকার টাওয়ার।

থির্লস্টোন থেকে বাদার দিকে নামতে শুরু করলেই কিন্তু দিগন্তব্যাপী শূন্যতা চেপে বসে মনের মধ্যে। বড়ো একলা মনে হয় নিজেকে। যেদিকে দু-চোখ যায়, প্রাণের অস্তিত্ব কোথাও নেই–একা আমি চলেছি জনহীন জলার বুকে অজানার উদ্দেশে। পেছনে খাড়া পাহাড় কাজেই বাদার ওদিকে কী আছে আর দেখা যায় না। দুষ্কর হয়ে ওঠে নির্বিঘ্নে হাঁটা। এক ঘাসের চাপড়া থেকে আরেক ঘাসের চাপড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়–একটু পা ফসকালেই পচা আগাছা আর কাদায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনে দুরদুর করতে থাকে বুকের ভেতরটা।

আকাশ এতক্ষণ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। থির্লস্টোন হিল আর হ্যাংগিঙস্টোন হিলের মাঝের উপত্যকা পেরোনোর সময়ে কোত্থেকে ছুটে এল রাশি রাশি মেঘ। ট হীড বাদা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতলবে আমি হ্যাংগিঙস্টোন হিলের দিকেই এগোচ্ছি। পশ্চিমের দামাল হাওয়ায় ভর দিয়ে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোটা আছড়ে পড়ল মুখে। তারপরেই কুয়াশায় বেশিদূর আর দেখতে পেলাম না। শুধু কুয়াশা নয়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে এল নীচু মেঘ আর বৃষ্টির ধারা–সব কিছু ঢেকে গেল সেই যবনিকার। তা সত্ত্বেও আমি এগিয়ে চললাম ক্র্যানসিয়ার আর ওয়েস্ট ওকমন্ট নদীর দিকে নদী বরাবর এগোতে পারলে পৌছে যাব বাদার উত্তর প্রান্তে সৈন্য চলাচলের রাস্তায়।

ঠিক জানি না কখন টের পেলাম কী যেন পেছন পেছন আসছে আমার। আমি তখন কম্পাসের কাঁটা দেখে সোজা পথ চলতে ব্যস্ত। লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হচ্ছে এক ঘাসের চাপড়া থেকে আরেক ঘাসের চাপড়ায়–তটস্থ হয়ে রয়েছি। পাছে দুর্গন্ধময় কাদায় পা বসে যায়। দিভ্রম যাতে না হয়, অন্যদিকে যেন না-চলে যাই–তাই ঘন ঘন দেখছি কম্পাসের দিকনির্দেশ। ঠিক তখনই কেন জানি মনে হল এই বিজন প্রান্তরে আমি আর একা নই–আমার পেছন পেছন কারা যেন নিঃশব্দ চরণে ছুটে আসছে। প্রথমটা অকারণ গা ছমছমানিকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু একটু একটু করে গা শিরশির করতে লাগল, নার্ভাস হয়ে পড়লাম। পেছন ফিরে দেখলাম সত্যিই কেউ পেছন নিয়েছে কিনা। প্রথমে বাদা আর প্রান্তর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না তাও অস্পষ্টভাবে, বৃষ্টি আর কুয়াশায় সব ঝাঁপসা হয়ে গিয়েছে। তারপরেই একটা পাথরের মতো কী যেন দেখলাম–অথচ সেখানে পাথর থাকার কথা নয়। ভাবলাম কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ভুল দেখছি। তাই সাহসে বুক বেঁধে ফের এগিয়ে চললাম সামনে। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু ফের বুকের মধ্যে গুর গুর

করতে লাগল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং ফের পেছন ফিরে তাকালাম। এবার স্পষ্ট দেখলাম তিনটে গাঢ় রঙের বস্তু পেছন পেছন আসছে এবং অনেকটা কাছে এসে গিয়েছে।

এবার আর সন্দেহ রইল না। সত্যিই আমার পেছন পেছন আসছে কালো বস্তু তিনটে। বিচারবুদ্ধি লোপ পেল নিমেষের মধ্যে। প্রাণের ভয়ে বিষম আতঙ্কে দৌড়োতে লাগলাম আমি। পেছনের শত্রুও তো তাই চায়। তাতে ওদেরই তো সুবিধে। দৌড়ে ওদের ছাড়িয়ে যেতে আমি কখনোই পারব না–বরং ওরাই যেকোনো মুহূর্তে নাগাল ধরে ফেলবে আমার পচা কাদার ওপর দিয়ে বাতাসে ভর করেই প্রায় ছুটে আসবে অকল্পনীয় বেগে অথচ কালো কাদায় পায়ের ছাপ একদম পড়বে না। কিন্তু ওরা তো আমাকে ধরতে চায় না, আমার ক্ষতিও করতে চায় না। ওরা চায় আমি যেন ভয় পেয়ে এইভাবেই দৌড়োই, দৌড়োতে দৌড়োতে দিশেহারা হয়ে পা ফসকে বাদায় গিয়ে পড়ি, সবুজ পাঁকের গর্তে পড়ে তলিয়ে যাই–একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই। জলাভূমিতে এই ধরনের সবুজ নরম পচা পাঁকে ভরতি গর্তকে বলা হয় ফেদার-বেড। পাখির পালকের মতোই নরম মোলায়েম ডুবলে আর ওঠা যায় না কোনো চিহ্নও থাকে না।

তাই ওরা যা চায়, আমিও প্রথমে তাই করে বসলাম। ওরা যেন আমাকে নিয়ে দেখতে লাগল। আতঙ্কে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল উধ্বর্শ্বাসে দৌড়োতে লাগলাম। বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কালো বস্তুগুলো নিঃশব্দে সামনে তাড়া করে এল পেছন পেছন। কম্পাস এখন কোনো কাজে লাগছে না। বৃষ্টির ঝাঁপসা আর কুয়াশার পর্দায় চোখ চলছে না–ক্ল্যান মিয়ারের আশেপাশে খাড়া উঁচু উঁচু টর-গুলোও দেখা যাচ্ছে না। কম্পাস দেখবার জন্য

মাঝে মাঝে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু সে-প্রশ্নই আর ওঠে না–ঝড়ের মতো ছুটছি... ছুটছি.. ছুটছি! অন্ধের মতো ধেয়ে চলেছি হাওয়ার বিপরীত দিকে। দামাল হাওয়া আছড়ে পড়ছে মুখে, ছুঁচের মতো বৃষ্টির ফলা বিধছে মুখে। হাউন্ডগুলো সমান বেগে নিঃশব্দে তাড়া করে আসছে পেছন পেছন। এখন ওরা সংখ্যায় বেড়েছে প্রায় দশ বারোটা কালো বস্তু নরকের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো অবিকল সংকল্পে আসছে তো আসছেই!

ছুটতে ছুটতে কিন্তু ভাবছিলাম কী করা যায়। একটু একটু করে সহজ বুদ্ধি ফিরে এল মাথায়! দেখলাম পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে ডাইনে মোড়ে নিয়ে উত্তর দিকে মিলিটারি রাস্তার দিকে ছুটে যাওয়া। একবার রাস্তায় পা দিতে পারলে নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারব লোকালয়ে পেছনে মূর্তিমান পিশাচরা আমাকে বাদায় ডুবিয়ে মারতে পারবে না।

সঙ্গেসঙ্গে ফিরলাম ডান দিকে। কিন্তু পেছনের কালান্তক হাউন্ডরা আমার মতলব বুঝেই চক্ষের নিমেষে হাজির হল একই পথে দৌড়ে চলল সামনে সামনে। আমি যেদিকে ছুটছি, পথ আটকে ওরা ছুটছে সেইদিকে। পালাবার পথ বন্ধ দেখে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম। আগে যেদিকে ছুটেছিলাম আবার ছুটতে লাগলাম সেদিকে। ক্ল্যানমিয়ারে যাওয়ার ইচ্ছে বিসর্জন দিলাম। উদ্দেশ্য এখন একটাই : যেভাবেই হোক ক্রুর কুটিল মহাভয়ংকর হাউন্ডদের খপ্পর থেকে সরে যেতে হবে আমাকে–তা সে যেদিকেই হোক না কেন?

ক্ল্যানমিয়ার আমার লক্ষ্য ছিল না ঠিকই কিন্তু আমি ছিটকে গেলাম সেইদিকে। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লাম একটা ঢালু গভীর গর্তের মধ্যে পুকুর নয় মাটি দেবে গিয়ে গর্তের মতো হয়ে গিয়েছে মাঝে একটা পোস্টবক্স আর তেকোনা এবড়োখেবড়ো পাথরের খাঁজে ভিজিটর্স বুক। আমার কিন্তু সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর একদম সময় নেই তখন। দম নেওয়ার জন্য দাঁড়াতে বাধ্য হলাম, হাউন্ডগুলোও দাঁড়িয়ে গেল গর্তের কিনারায় মাথা তুলে রইল বাতাসের দিকে যেন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য নাক তুলে গন্ধ শোকবার চেষ্টা করছে।

হাওয়া পালটে গেল ঠিক এই সময়ে। আচমকা মোড় ঘুরে গেল হাওয়ার হু-হু করে বইতে লাগল পশ্চিম থেকে উত্তরে–সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল বাদলাকে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্যদেব এবং রোদুর ঝিকমিকিয়ে উঠল বৃষ্টি-ধোওয়া পাথর আর পাহাড়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে গেল হাউন্ডগুলো পাহাড়ের ঢালে লেগে মেঘমালা যেভাবে গোলে মিলিয়ে যায়–অবিকল সেইভাবে।

বিজন প্রান্তরে আবার আমি একা। আগের মতোই আবার হাঁটতে পারি যেদিকে খুশি। পায়ের কাছে বইছে শিশু স্রোতস্বিনী ওয়েস্ট ওকমেন্ট। পাড় বরাবর কিছুদূর যাওয়ার পর তা ঢলঢলে নদীর চেহারা নিল স্রোতের টান কী! এবার কম্পাসের সাহায্যে পৌছে গেলাম মিলিটারি রোডে ওকস্পটনে

পৌছোবো এই সড়ক ধরে গেলে।

দ্রুত সূর্য ডুবছে ইয়েস টর-এর পেছনে। ওত পেতে রয়েছে ঢেলা ঢেলা ছায়ার দল যেন যেকোনো মুহূর্তে চঞ্চল হবে, লাফিয়ে তেড়ে আসবে পেছন পেছন। সত্যিই ভয় হল আমার। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম পেছনে। কিন্তু আমার কপাল ভালো ছায়ারা আর তেড়ে আসেনি। নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম ওকহাম্পটনে। তারপর প্রতিজ্ঞা করেছি ঝকঝকে রোদ্দুরেও ডার্টমুর আর মাড়াব না।

-ক্যাথলিন হন্ট